৭ম কল্প] Reg. No. C. 691. [১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২৩]

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত বি, এল্‌,-সম্পাদিত।

কার্য্যালয়—৭৩ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

সূচী।

—:*:—

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
নব বর্ষ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, ও নিমচাঁদ	...	১
বৃত্রসংহার	শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত ...	...	৪
রেণুর বর	জনৈক মহিলা ...	...	১০
আশা	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	১৭
রবীন্দ্রনাথ	শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম্ এ, বি, এল্,	...	১৮
ঋণ-পরিশোধ	শ্রীবাসুচরণ দে ...	...	৩১

অর্ঘ্যের নিয়মাবলী।

১। অর্ঘ্যের মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। নমুনার আবশ্যক হইলে ৵০ ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। প্রতিমাসের মধ্যভাগে অর্ঘ্য বাহির হয়। কোন মাসের অর্ঘ্য না ... পরের মাসে ৭ তারিখের ভিতর জানাইতে হইবে। তার পর আ... আর দায়ী হইব না।

৩। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদকের ম... পাঠাইবেন। আমরা ভাল প্রবন্ধাদি পাইলে বাহির করি।

৪। চিঠি পত্রাদি ও টাকা পয়সা সব "কার্য্যাধ্যক্ষ" অর্ঘ্য, ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। নূতন গ্রাহক 'নূতন' কথাটা লিখিবেন।

৫। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাইলে বা প্রবন্ধাদি ফেরৎ হইলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের নিয়ম এক মাসের জন্য সাধারণ একপৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা, ও সিকি পৃষ্ঠা দুই টাকা। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। মলাটের বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিলে জানিতে পারিবেন। বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—অর্ঘ্য।

৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দীর্ঘজীবন।

লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের আমাদের "কামশাস্ত্র" একবার পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ করিবার ও শরীর সুস্থ রাখিবার স্বাভাবিক নিয়মগুলি বিষদরূপে বর্ণিত আছে। ইহাতে গার্হস্থ্য চিকিৎসাপ্রণালীতেও সম্বলিত ঘরে থাকিলেও চিকিৎসকের কার্য্য থাকিবে। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনা প্রেরিত হয়।

বটিকা	"আতঙ্কনিগ্রহ"
বটিকা	দুর্ব্বলের জন্য
বটিকা	শরীরের শক্তি এবং তেজ প্রদান করে।
বটিকা	শরীরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে।
বটিকা	পাবতপদার্থ বিরহিত।
বটিকা	৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটা ১, টাকা মাত্র।

বটিকার প্রাপ্তিস্থানঃ—**কবিরাজ শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,**

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল প্রণীত

নূতন নাটক

রুমেলা

তিন অঙ্কে সমাপ্ত।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য আট আনা।

সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

দরিয়া

নাটিকা। মিনার্ভায় অভিনীত।

মূল্য আট আনা।

গ্রহের ফের

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুরে অভিনীত।

মূল্য চারি আনা।

দশচক্র

কৌতুক-নাট্য। ষ্টারে অভিনীত।

মূল্য ছয় আনা।

যৎকিঞ্চিৎ

ব্যঙ্গ-নাট্য। ষ্টারে অভিনীত।

মূল্য আট আনা।

নূতন গল্পের বই

পুষ্পক

পনেরোটি উৎকৃষ্ট গল্প। মূল্য এক টাকা।

বন্দী

মনোরম উপন্যাস। মূল্য আট আনা।

নির্ঝর

বারোটি ছোট গল্প। মূল্য আট আনা।

পরদেশী

এগারটি ছোট গল্প। সচিত্র। আট আনা।

শেফালি

দশটি ছোট গল্প। দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য বার আনা।

সাঁঝের বাতি

ছেলেমেয়েদের জন্য ছবি ও গল্পের বই।

চোখ-জুড়ানো ছবি। মন-মাতানো গল্প।

মূল্য আট আনা

সকল গ্রন্থই

কলিকাতা, গুরুদাস বাবুর দোকান; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস; এবং গ্রন্থকারের নিকট, ১৫ নং হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর,—এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

অর্ঘ্য।

৭ম কল্প	বৈশাখ, ১৩২৩	১ম খণ্ড

নব-বর্ষ।

(লেখক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বি, এ)

সুখে দুঃখে পুরাতন পরিচিত ছিল,
আজিকে নূতন তুমি এসেছ ধরায় ;
তোমাকে বরিয়া লব যোগ্য অর্ঘ্য দিয়া
তা' বলে অতীত কি ভুলে যাওয়া যায় ?
নূতন, দাও গো তুমি হৃদয়েতে মোর
নব আশা, নব ভাষা দাও গো আমায় ;
থাকিয়া থাকিয়া যদি কভু মাঝে মাঝে
পুরাতন স্মৃতি আসে, কিবা ক্ষতি তায় ?

নব-বর্ষ

(লেখক—নিমচাঁদ)
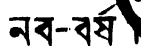
পুরাতন বৎসরের এবার যে ভাবে tragic death হয়েছে, তা দেখে নূতন বর্ষের মুখে যে কোনরূপ শোকের বা সহানুভূতির চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। সঙ্ সেজে, মুখে-কালি ঝুল মেখে, দুপুর রদ্দুরে ভাজা ভাজা হয়ে পুরাতন বৎসরটা কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় জীবনের শেষ দিনেও ঘুরে বেড়িয়েছে।

দু'কাণ কাটা vagabond এর funeral দেখবার জন্যে কিন্তু খুব ভিড় হয়েছিল।

শুভ ১লা বৈশাখ। কালি আলকাতরা, ভুষো—সব রাত্রের মধ্যে whitewashed হয়ে গেছে। অতীতের কলঙ্কের উপর এত ক্ষিপ্রতার সহিত যবনিকা টানিয়া দেওয়া যে অত্যন্ত প্রশংসার্হ তাহার সন্দেহ নাই। আজ কেবল সিন্দুরের উৎসব। চুণকাম-করা দেওয়ালে, নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠায়, লোহার আলমারির গায়ে নববর্ষের রক্তবর্ণ ছাপ পড়ে গেল।

সকাল থেকে ছেলেরা পড়বার ঘরে ভারি গোলমাল আরম্ভ করে দিয়েছে। নূতন খাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কে কোথায় যাবে, এই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কের সূত্রপাত হয়ে শেষকালে হাতাহাতি হবার যোগাড় হয়ে উঠল।

আমার পাওনাদারের সংখ্যা নেহাত কম নয়? নিজের কোন রকম ব্যবসা না থাকলেও ব্যবসাদারদের সঙ্গে আমার রীতিমত business connections আছে। প্রত্যেক দোকানে নগত সোলআনা প্রণামী দিয়ে আজ কত মেঠাই সংগ্রহ হতে পারে, মনে মনে আমি তার একটা হিসেব করেছিলুম। ছেলেদের ঝগড়া থামাবার জন্য আমাকে mental তেরিজ কসা বন্ধ করতে হ'ল।

নব-বর্ষের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে civil war বাধান ঠিক নয়—এই কথা শুনে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে peace করে ফেল্লে। এমন মধুর ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্তে আমার মনটার মধ্যে Europe এর blood stained battle field গুলোর ব্যাপার একবারে যেন হঠাৎ জেগে উঠল। The Great War—মনে হ'ল যেন এই কথা কয়টার উপর দিয়ে কে একজন thick white paint এক পোঁচ টানিয়া দিল। The great peace—যেন কোন অপাঠিত ইতিসাসের মলাটে এই রকম গোটাকতক সোণার জলে লেখা কথা ছেপে উঠেছে! ঠিক সেই সময়ে একটি ছোট ভাইপো আমার কোলের কাছে এসে বল্লে,—"জ্যাতাবাবু, আমায় একতা তাল পাতার ভেঁপু কিনে দিবে? আমি ভঁ ভঁ বাদাব।" "রথ আসুক—সেই সময় কিনে দেব।" তার বড় ভাই জিজ্ঞাসা করিল,—"জ্যাটাবাবু, রথ কবে?" "গুপ্তপ্রেস পাঁজিখানা নিয়ে আয় দেখি এ বছর রথ কবে। দু' তিন জন দৌড়ে গেল। একজন পাঁজি এনে আমার হাতে দিল।

"পর্ব্বদিন ও তদুপলক্ষে আফিস বন্ধ।" হরি! হরি!!—এ কি? এবার যে Good Friday র কোন উল্লেখ নাই! ছেলেদের মহাভাবনা উপস্থিত হইল। "এবার Good Friday র ছুটি নাই?" "বোধ হয় গেলবছরের পাঁজিতে আছে।"

"বোধ হয় Prnter's Devil ছাপতে ভুল করেছে।" একটি বুদ্ধিমান Matriculation classএর ছেলে বলিল,—"বোধ হয় Summer Vacationএর সঙ্গে Good Fridayর ছুটির amalgamation হবে তাই ছাপেনি।"

ছাত্র জীবনে ছুটি যে একটা কি জিনিষ তা' High Courtএর জজ্ ব্যতীত অপর কাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

"পাশ-ফেল-সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয়,
সর্ব্বথা বিহিত লওয়া তাহার আশ্রয়।
যদ্যপি কখন পাশ না হয় দৈবাৎ
ছুটি তার লভিবারে কে করে ব্যাঘাত?"

আজ বৎসরের প্রথম দিন—Luckyday—সাহেবেরা সাইত মানে। আমার আজ কিছু লাভ করা চাই—এই ভেবে একটা মতলব ঠাওরালেম। ব্যবসা নাই যে পাওনা টাকা আদায় হবে। চাকরি নাই যে উপরি কিছু পকেটে আসবে। তবে, ঘরে অনেকগুলো মেকি টাকা পড়েছিল। সেই সব টাকাগুলি নিয়ে সন্ধ্যার পর নূতনখাতার নিমন্ত্রণ রাখতে বেরুলাম। বড়বাজারে কাপড়ের দোকানে গিয়া দেখি একখানা বড় জারমান সিলভারের প্লেটে একরাশ্ নোট আর টাকা। সরকার খাতা নিয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে আমার বেশ দহরম মহরম ছিল। চুপি চুপি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেম—"ব্যাপার কি হে? যুদ্ধের দুর্ব্বৎসরে টাকার আমদানি ত কম নয়?" সরকার মহাশয় একটু মুচকি হেসে আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লেন,—"আপনিও যেমন! প্লেটের তিনভাগ নোট, আর টাকা বাবুর ঘরের পুঁজি—এ রকম না করলে কি, ভড়ং বজায় থাকে?" আমিও একটু মুচকি হেসে পাঁচটা মেকি টাকা সরকারের হাতে দিয়ে বল্লুম,—"জমা করে নিন্।" সরকার ঝনাৎ করে টাকা কয়টা গাদায় ফেলে দিয়ে আমার নামে নূতন খাতায় জমা করিয়া লইল। তারপর চাঁদনিতে জামার দোকানে, বহুবাজারে সন্দেশের দোকানে, মৃজাপুরে কাঠের দোকানে, জগন্নাথঘাটে চুণ-সুরকির আড়তে, dispensary, plumberএর আপিসে, এমন কি গোয়ালার ঘরে ও মুদির দোকানে—যেখানে যত নিমন্ত্রণ ছিল বেমালুম মেকিগুলি চালিয়ে দিয়ে প্রায় দশ সের আন্দাজ মিষ্টান্নের বোঝা ছেলেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।

নব-বর্ষের সম্বাদ—"সাধু, সাবধান!"—(নিমচাঁদ)

বৃত্রসংহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(লেখক—শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত, এম্, এ।)

পঞ্চদশ সর্গ।

পঞ্চদশসর্গে দেবদৈত্যে পুনরায় মহাযুদ্ধের বর্ণনা। মহাসুর অমরার পূর্ব্বদ্বারে জয়ন্ত ও অগ্নিদেব প্রমুখ দেবসৈন্যের গতিরোধার্থ স্বপুত্র রুদ্রপীড়কে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া উত্তর তোরণে কার্ত্তিকেয়, বরুণ, মার্ত্তণ্ড প্রভৃতি দেবমহারথী গণকে স্বয়ং দমন করিতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকালব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর পূর্ব্বদ্বারে দৈত্যসেনা জয়ন্ত ও অগ্নিদেবের প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তখন—

* * অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ মণ্ডিত কলেবর
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড় সেনা সে বেগ ধরিতে,
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে, ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে, সর্ব্ব অঙ্গে শোণিতের ধারা!

রুদ্রপীড় অসীম পরাক্রম দেখাইয়াও কোনও উপায়ে স্বদলকে ফিরাইতে পারিলেন না।

ওদিকে উত্তর তোরণে দেবমহারথিগণ ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমর সিন্ধু-উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।

জটাসুর, দন্তবক্র, সিংতুণ্ড প্রভৃতি মহাবল দৈত্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

তখন আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য মহাদানব ভীম বিক্রমে দেব সেনা বেগে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব সৈন্য পলায়নপর হইল।

উড়িল অমর তনু আচ্ছাদি অম্বর,
যথা সে কার্পাস রাশি উড়ায় ধূনারি
টঙ্কারি ধূনন যন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর শোণিত ;
দেব অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর-সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।

সুরবৃন্দ দৈত্যপ্রহারে আকুল হইয়া স্বর্গতল ছাড়িয়া বিমানে উঠিলেন—

আভাময়-দেব অঙ্গ শোভা অঙ্গে ধরি।
অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ লহরী
নিনাদি মধুর নাদে ; ছুটিল চকিতে
শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল ;
অপূর্ব্ব নিনাদে, পাশী বরুণ স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল ;
মনোরথ গতি বায়ু রথ দ্রুত বেগে
আকুল করিল ব্যোমদেশ।

অন্তরীক্ষ হইতে দেব সেনানীগণ দৈত্যমণ্ডলী উপরে শাণিত অস্ত্র রাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; দৈত্যগণ নিরুপায়, পলকে পলকে অসংখ্য হত হইতে লাগিল।

* * * নিরখিলা বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল ঘন বহ্নি-চক্র প্রায়
উজলি বিশাল ভাল, দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপুঃ করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা, কিম্বা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।

দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।

ত্রাসিত দেব সেনাপতিগণ তখন অন্তরীক্ষের আরও দূরতর প্রদেশে উঠিয়া অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

* * * * ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ অস্ত্র মহা প্রহরণ ;—
ত্রিভুবন স্তম্ভিত কম্পিত চরাচর ;
প্রলয় প্লাবন রঙ্গে টলিল ভূধর ;
ভাসিল দনুজদল উত্তাপ হিল্লোলে ,

* * * *

দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর করকালানল যেন—
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে যুঝিছে কৌশলী
সমর পণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত।
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্য শরীর
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার ,—
শূন্য ব্যাপি একেবাকে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গম মালা , মালার আকারে
ঘেরিছে অসুর অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। *

বৃত্র অস্ত্রদাহে আকুল হইয়া তখন সংহারীর শেষ শূল শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন। গগনে অতুল দৃশ্য প্রকাশ পাইল।

---

* বরুণের অস্ত্রে প্রলয় প্লাবন ছুটিল, ভাস্করের প্রখর কর কালানল অসুর গণকে দগ্ধ করিতে লাগিল, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের বানে ভুজঙ্গম মালা রচিত হইতে লাগিল।

চলিল সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে ;
ব্রহ্মাণ্ড পুরিল শূল গর্জ্জনে ভৈরব ।
ঘোর রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র-গ্রহপিণ্ড যেন
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির ভাব,
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদ্‌ভুত !

সেনাপতি কুমারের আদেশে সূর্য্য আদি দেবগণ অমনি গভীর তিমিরে অদৃশ্য হইলেন :—

ডুবিল, মরি রে, যেন আঁধারি গগণ
কোটি তারকার বৃন্দ !

অন্তরীক্ষময় ভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য না পাইয়া অভিমানে নতভাবে মহাশূল দৈত্যকরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। অস্ত্র আলোকে মহাসুর রণাঙ্গন ভীম শবস্থান সদৃশ নিরীক্ষণ করিলেন। তিনিই একা সেই মহা প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। দূরে দৈত্য বিজয়কেতু ধূলি লুণ্ঠিত দেখিয়া দুঃখে স্বহস্তে পতাকা উত্তোলন করিয়া চিন্তাকুল ভাবে ধীরগতি আলয়ে ফিরিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

তিমিরাবৃত শবদেহময় ভয়ঙ্কর রণাঙ্গন চিত্রের পর নন্দনের ললিত অনুপম শোভার বর্ণনা। দৃশ্য পরিবর্ত্তন কি চমকপ্রদ! কি মনমুগ্ধকর! ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ভাষা ও ছন্দের বিচিত্র পরিবর্ত্তন।

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর ; থর থর থর
　　　　মঞ্জরী দোলে।
সুগন্ধ-মোদিন নিকুঞ্জ কাননে
সুমন্দ মরুৎ আনন্দিত মনে
ঢালিয়া ঢালিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে-পড়িছে সঘনে
　　　　কুসুম কোলে ॥

হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর ;
সুললিত শোভা রসে ভর ভর
শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
রয়ে থরে থরে-হাসি মনোহর
মুকুল-মুখে।
ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা নিশি গন্ধা'পরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে ॥
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখীকুল ,
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে।
ভ্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর, সুমোহন তনু,
অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জনু
সুহাসি বিজুলী ; নেত্র কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে ॥

দানবী আদেশে রতিপতি নিকুঞ্জ সাজাইলেন। গন্ধর্ব্বদুহিতা সেইস্থলে রণ-ক্লান্ত অসুরকে সুখদান করিবার মানসে অপেক্ষা করিতেছেন, হেনকালে চিন্তা অবনতা মদনমোহিনী ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। সাগ্রহে দৈত্যেন্দ্রানী রতিকে শচীবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কারামুক্তির সুসংবাদ জানাইয়া ইন্দ্রজায়ার নিকট রতি কি শিরোপা পাইলেন ব্যঙ্গভরে সে প্রশ্নও করিলেন। রতি দুঃখিতান্তঃকরণে শচীর গর্ব্বিত উত্তর শুনাইলেন। শুনিয়া ঐন্দ্রিলা হৃষ্টা হইলেন। অসুরকে মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আদেশে মদনজায়া তাঁহাকে সুচারুভাবে সাজাইয়া দিলেন। অনঙ্গকে দৈত্যাগমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য প্রেরণ করিয়া দানবী নিকুঞ্জ মধ্যে ভ্রমন করিতে লাগিলেন। ঐন্দ্রিলার মনে অতুলসুখ যে তাঁহার বাসনাপূরণের উপায় হইয়াছে, দেবেন্দ্রানীকে চরণে ধরাইবেন।

হেনকালে কাম কহিলা সংবাদ
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য, পুরাইয়া সাধ
কুটীরে যায়॥

দৈত্যপতির মনে কিন্তু দারুণ চিন্তা; তিনিই যেন অক্ষয় শরীর কিন্তু দিনে দিনে দৈত্যবল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, অমরগণ অবিরত যুদ্ধ করিলে ক'জন দৈত্য আর থাকিবে? তবে কাকে লইয়া দৈত্যেন্দ্র বিজয়সুখ ভোগ করিবেন?–

হেনকালে সুসজ্জিতা গন্ধর্ব্বকুমারী হাস্যমুখে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। দানবীর রূপপ্রভা, স্মিতাধর, প্রফুল্লানন দেখিয়া অসুর নিমিষে সকল ভাবনা, সকল বেদনা ভুলিয়া গেল। তদুপরি নিকুঞ্জের মোহন শোভা, ঐন্দ্রিলার প্রেমাদর দানবকে অচেতন প্রায় করিল। সুযোগ বুঝিয়া কুচক্রী দৈত্যমহিষী অসুরের ক্রোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা ছলে, নানা অমৃত বাক্যে সাজাইয়া শচীর উত্তর শুনাইয়া দিলেন। অমনি বিষম আসুরিক ক্রোধের সঞ্চার হইল;—

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার, নিশ্বাস-শরীর
বহিল সবেগে-কহিল-গম্ভীর
"রতি কোথায়?"

রতি কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া শচীবাক্য সভয়ে নিবেদন করিলেন। মহাসুরের রোস-বৃদ্ধি পাইল।

রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
কুঞ্চিল অধর ভীষণ বদনে;
কড় কড়ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট কহিলা গর্জ্জনে
ভীম অসুর—
'আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণী?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী?
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি;—

চতুরা দৈত্যরমণী অমনি মন্মথের চাপে স্বয়ং ফুলশর বসাইয়া দৈত্যগাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। মদনশর অব্যর্থ সন্ধান, নিমিষে দনুজের প্রাণ আকুল হইল। রূপমুগ্ধ অসুরের নিকট তখন দৈত্যবামা আপনার বাসনা-পূরণ প্রার্থনা করিলেন।

কহে দৈত্যপতি 'তোমায়, সুন্দরী,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী ;
যে বাসনা তব, তার দর্প হরি,
পূরাও মহিষি ;—ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী।'

হর্ষোন্মত্তা ঐন্দ্রিলা সুখে দৈত্যেন্দ্রকে আলিঙ্গন দিয়া তৎক্ষণাৎ চেড়ীদল সঙ্গে গজেন্দ্র-গমনে শচীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার 'কটাক্ষে হানিলা ঘোর দামিনী'।

(ক্রমশঃ)

রেণুর বর।

(লেখক—জনৈক মহিলা।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(১৭)

রেনুর বিবাহ আজ এক বৎসরের অধিক হইয়াছে, রেণু এখন একটু বড় হইয়াছে, তাহার এখন একটু একটু লজ্জা এবং বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে।

মানদাময়ী রেণুকে ছোট মেয়েটীর মতন পালন করেন। পূর্ব্বে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধু আনিয়া আদরের সহিত পালন করিয়া ছিলেন আর এখন তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া একটী শিশু আনিয়া আপত্য স্নেহে পালন করিতেছেন। তিনি সময় সময় ভাবেন, একি হইল, এখন কোথায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব, তীর্থ দর্শন করিব, তাহা না করিয়া মায়ায় জড়াইয়া

পড়িতেছি। তিনি রেণুকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিতেন, এবং তাহার ঘুমন্ত, সরল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ভাবিতেন, কেন একে এত ভালবাসি, ইহাকেই বলে সুক্ষণে দেখা, তাহা না হইলে কি এমন হয়। বোধ হয় নিজের সন্তান অপেক্ষা পরের সন্তানের জন্য বেশী প্রাণ কাঁদে।

ইহার কিছু দিন পরে মানদাময়ীর কতকগুলি আত্মীয় বদ্রিকা আশ্রম তীর্থে যাইতেছেন শুনিয়া মানদাময়ী ভাবিলেন, এরূপ কঠিন তীর্থে সহজে যাওয়া যায় না। এখন এতগুলি আত্মীয় এক সঙ্গে যাইতেছেন এমন সুযোগে যদি আমার যাওয়া না হয় তবে আর বুঝি এজীবনে হইবে না। এই সব ভাবিয়া তিনি পুত্রের নিকট মন ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

রমেশ বলিলেন,—না, মা, তুমি অমন ঠাণ্ডা জায়গায় যাইলে মরিয়া যাইবে; তোমার ওরকম তীর্থে যাইয়া, কাজ নাই, অন্য কোন তীর্থে যাইতে চাও বল, আমি তোমাকে দেখাইয়ে আনি।

পুত্রের কথা শুনিয়া মানদাময়ী হাসিয়া বলিলেন,—পাগল ছেলে, সেখানে গেলেই কি মরিয়া যায়, আর আমি, এমন কি কপাল করেছি, যে ভগবান বদ্রিকানাথ আমায় চরণে স্থান দিবেন।

মাতা পুত্রে অনেক তর্ক বিতর্কের পর মাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, মানদাময়ী বদ্রিকা আশ্রম যাইতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। মানদাময়ীর প্রকৃতির এইটী প্রধান লক্ষণ, তিনি যাহা মনে করিতেন তাহা নিশ্চয় সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার তীর্থ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। রেণুকে তাহার মাতার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। যাত্রা কালে, কন্যাদের সহিত তাঁহার দেখা হইল না, কারণ জ্যেষ্ঠ কন্যা পঙ্কজিনীর একটী পুত্র হইয়াছিল, তিনি তখনও সুতিকাগারে, আর কনিষ্ঠ কন্যা মৃণালিনী স্বামীর কর্ম্ম স্থলে তাহার কাছে ছিলেন। মানদাময়ীর পুরাতন কর্ম্মচারি রতন সরকারের হাতে সংসারের ভার দিয়া রমেশকে বিশেষ সাবধান করিয়া বুঝাইয়া, তিনি শুভদিন আত্মীয় গণের সহিত তীর্থ যাত্রা করিলেন। মাতাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়া রমেশ বলিলেন—মা, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তখন জননী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ছি, বাবা, তোমার কি তীর্থ করিবার সময় হয়েছে আর সে দুর্জ্জয় পথে কি যাইতে পার।

রমেশ বলিলেন,—মা, তুমি সে পথে কেমন করে যাবে। মানদাময়ী বলিলেন,—আমার কথা ছেড়ে দাও আমাদের শরীরে সব সয়া যাক্ বাবা, আমার মাথার দিব্য

কোন রকম মন খারাপ করিওনা, মাঝে মাঝে পঙ্কজিনীর সংবাদ নিও, আর যদি তার শাশুড়ী পাঠায় তবে আঁতুড় গেলে নিয়ে এস। আর মাঝে মাঝে রেণুদের বাড়ী গিয়ে তাহাদের খবর নিও। আমাকে সময় মত চিঠি দিও, আর যখন টাকা চাহিব তখন পাঠাইও। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, মাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সন্তানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন, রমেশ, শূন্য প্রাণে ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন। আজ তাহার প্রাণে বড়ই শূন্যতা বোধ হইতে লাগিল।

(১৮)

রমেশের মাতা আজ প্রায় পনের দিন তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন। গৃহ শূন্য, বাটী খানি সর্ব্বদাই যেন নীরব। মাতা নাই, রেণু নাই, রমেশের কথা কহিবার একটী লোক ও যেন সে বাটীতে নাই। সর্ব্বদাই নীরব। রমেশের নীরব জীবন যেন আরও নীরব হইয়া পড়িল। রমেশের পক্ষে যেন সে বাটী আজ নির্জ্জন কারাবাস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মন প্রফুল্ল করিবার জন্য আজ রমেশ বহুদিন পরে আলমারী খুলিয়া কয়েকখানি নভেল বাহির করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন স্থির হইল না। প্রাণ যেন কি চায়। রমেশ পরদিন পঙ্কজিনীর বাটী চলিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলেন পঙ্কজিনী অসুস্থ। রমেশ তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, পঙ্কজিনীর শাশুড়ি বলিলেন—'এ অবস্থায় এখন তোমার কাছে গেলে কে দেখিবে বাছা, তোমার মা আসুন তারপরে যাইবে।' রমেশ ক্ষুণ্ণমনে বাটী ফিরিয়া আসিলেন পঙ্কজিনী আসিতে পারিলেন না, তবে আর কে আসিবে। আর কে আছে। আর একজন,. সে বালিকা। তাহাকে আনা অসম্ভব সে কাহার কাছে আসিবে। কে তাহাকে যত্ন করিবে। রমেশ নিরাশ হইয়া নীরবে দিন কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দিন যে কাটে না। রমেশ অধীর হইয়া উঠিলেন। রাত্রে ঘুম আসে না; দিনরাত একভাবে থাকিয়া রমেশ মনে মনে ভাবিতেন আমি কি পাগল হইয়া যাইব। তিনি চিরকাল লাজুক, শান্ত ছিলেন, কখনও কাহার সহিত ভাব করেন নাই। সেজন্য তাঁহার একটীও বন্ধু নাই। এখন রমেশের সকল অভাব যেন এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সে কেবল একা স্নেহময়ী জননীর অভাবে। রমেশ নির্জ্জনে আকুল হইয়া 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতেন। আজ সুবাসের অভাবের চাইতেও যেন মায়ের অভাব রমেশের বেশী বোধ হইতে লাগিল।

প্রাণের কথা বুঝিবার, প্রাণের কথা বলিবার লোক কে আছে। তিনি একদিন সরকার রতন দত্তকে বলিলেন,—'বড়ই একা বোধ হয়, কি করি বল দেখি?' তিনি বলিলেন,—এই কটা দিন একা লাগিবেইত দাদা, মা আসুক তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে।' রমেশ রতনের কাছে কোন প্রতিকার পাইলেন্ না; বরং সে একটু পরিহাস করিলে তখন রমেশের মনে হইতে লাগিল, তবে কি রেণুকেই লইয়া আসিব। তবুও কথা বলিবার লোক হইবে সে পুতুল খেলিবে আমি দেখিব। আর একেবারে নির্জ্জনে থাকা যায় না। এর পর কি আমি পাগল হইয়া যাইব। রমেশ তাহার শ্যালক মণিলালের নামে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন এবং ভাবিলেন যদি রেণু আসিয়া কাঁদে তবে আবার পাঠাইয়া দিব। দেখা যাক্ সে আসে কিনা।

(১৯)

যথা সময়ে দ্বারবান রমেশের পত্র লইয়া রেণুদের বাটী উপস্থিত হইল। মণিলাল তখন স্কুলে গিয়াছে। কাজেই সাবিত্রী সেই পত্র লইয়া পড়িয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ওগো শুন তোমার জামাই পত্র লিখেছে।' বলরাম বাবু বলিলেন,—'কি লিখিয়াছে পড়।' সাবিত্রী স্বামীর নিকট যাইয়া পত্র পড়িলেন, 'মণিলাল! তোমরা কেমন আছ। অনেকদিন তোমাদের সংবাদ পাই নাই। তুমি আর আমাদের বাড়ী এস না কেন? মাতা ঠাকুরাণী বদ্রিকা আশ্রম যাওয়া পর্য্যন্ত আমি বড়ই একা হইয়া পড়িয়াছি; কিছুই ভাল লাগে না। যদি তোমার মামা মহাশয় ও তোমার মামিমাতার মত হয়, তবে তোমার ভগ্নী রেণুকে লইয়া তুমি যদি এবাটীতে আইস তবে বড় সুখী হইব। যদি তোমাদের আসার মত হয়, তবে লিখিয়া দিও। কাল গাড়ী পাঠাইয়া দিব।' ইতি—শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ।

পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া সাবিত্রী বলিলেন, 'শুনিলেনত! এখন কি করিবে বল?'—বলরাম বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন 'তাইত কি করা যায়। বাড়ীতে কেহই নাই। কার কাছে পাঠাই। আবার রমেশ বাবাজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত নয়। কারণ একেই ত শুনিতেছি। একরূপ রমেশের মাতার ইচ্ছাতেই সে বিবাহ করিয়াছে; বাবাজীর বয়স ও হইয়াছে। যদি এখন তার ইচ্ছানুসারে না চলা যায়, তবে ভাল কাজ হবেনা।' সাবিত্রী বলিলেন,—'তুমিত বিচার কচ্ছ, এখন কি জবাব দিবে বলে দাও, দ্বারবান দাঁড়াইয়ে আছে।' বলরাম বাবু বলিলেন,—'দাও লিখে কাল যেন নিয়ে যায়,

আবার পরশু চলিয়া আসিবে। সাবিত্রী পত্রে ওই কথা লিখিয়া দ্বারবানকে দিয়া বিদায় করিলেন। ভবানী কাপড় তুলিয়া ছাদ হইতে নামিতে নামিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'মামিমা রেণুর শ্বশুর বাড়ী হইতে বুঝি দরোয়ান আসিয়াছিল?' সাবিত্রী বলিলেন, 'হ্যাঁ কাল রেণুকে নিয়ে যাবে।' ভবানী বলিল, 'রেণুর শাশুড়ী ত বাড়ী নাই কে নিয়ে যাবে।' সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিল, 'রমেশ নিজে পাঠিয়েছিল তার একলা ভাল লাগিতেছেনা।' ভবানী হাসিয়া বলিল, 'ওমা গেছি। তোমার জামাইয়ের কত ঢংই আছে এই বৌ পসন্দ হয় নাই। আবার দুদিন একলা থাকিতে পারিতেছে না।' রেণু ছাতে ছিল। ভবানী তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—'ও রেণু শীঘ্র নেমে আয়, তোকে এখনি শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে।' রেণু নামিয়া আসিয়া কাঁদিতে বসিল। সাবিত্রী বলিলেন, 'দুর পাগ্‌লি মিছে কথা। কাল একবার মণি আর তুই যাস্। আবার চলে আসিস।' রেণু বলিল, 'সে বাড়ীর মা নাই; আমি সেখানে একলা যাইবনা।' সাবিত্রী বলিলেন 'একলা কেনরে, মণি যে তোর সঙ্গে যাইবে।' রেণু বলিল, 'মণিদাদা বেটা ছেলে, আমি ওর সঙ্গে যাবনা। তুমি যাওত, আমি যাইব; নয়ত আমি কখনও যাবনা।' সাবিত্রী বলিলেন, 'আমি কি তোর সঙ্গে তোর শ্বশুর ঘর করিতে যাব। সে যা হয় কাল হবে এখন চুল বাঁধিগে।'
রেণুর মা চুল বাঁধিতে বসিলেন। সেই সময় মণিলাল স্কুল হইতে আসিল। ভবানী তাহাকে বলিল, 'ও মণি কাল তোকে নিয়ে রেণু শশুর বাড়ী যাইবে। তোকে সেখানে থাকিতে হইবে।' মণি বলিল, 'আমি যাইবনা। রেণুর বাড়ী রেণু থাক্‌বে আমি থাক্‌বো কেন?'

(২০)

আজ রেণু সকাল হইতে কাঁদিতেছে। সে কখনও একলা শ্বশুর বাড়ী যাইবেনা। রেণুর বিবাহ হইয়া অধিকাংশ সময়ই শ্বশুর বাড়ী ছিল। সে কখনও কাঁদে নাই, আজ বড় কাঁদিতেছে। বলরামবাবু মণিলালকে বলিলেন, 'আজ আর তুমি স্কুলে যাইও না, রেণুকে লইয়া রমেশের বাটী যাও। আবার কাল সকালে চলিয়া আসিও।' কিন্তু মণিলাল তাহাতে কিছুতেই রাজি হইল না, সে তাহার মামিমার নিকট নিজ আপত্তি জানাইতে লাগিল, আবার রেণু তখন মণিলালের সহিত যাইবনা বলিয়া মহা জেদ করিতে লাগিল, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলরামবাবু বলিলেন, তবে কি করা যাইবে, গাড়ি আসিলে ফিরাইয়া দিও।' সাবিত্রী বলিলেন, 'তাই

কি হয়; একেই জামাই কেমনতর; যদি বা এখন দেখিতেছি, একটু মতি ফিরিয়াছে, তার পর যদি গাড়ী ফিরাইয়া দি, তাহা হইলে কি আর মেয়ের দিকে ফিরিয়া দেখিবে, সে হবেনা ওকে পাঠাইতেই হবে।' বলরাম বলিলেন, 'তবে তুমি যাও।' সে কথা শুনিয়া সাবিত্রী মহাবিস্ময়ে বলিলেন, 'ওমা সে কি কথা, আমি মেয়ের সঙ্গে জামাই বাড়ী যাইব, লোকে বলিবে কি, টাকায় নয় গরীব হয়েছি, তাই বলে কি মান ইজ্জত কিছুই নাই, সব গিয়েছে।' বলরামবাবু বলিলেন,—'এখন ত মান নিয়ে কথা হচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে কি করা যায় ভাবিয়া দেখনা, মণি যদি না যায়, তুমি ছাড়া আর কে যাইবে বল, হয় তুমি যাও না হয় গাড়ী ফিরাইয়া দাও।' সাবিত্রী বলিলেন,—'গাড়ীও ফিরান হবেনা, কেন ভবানী যাক্‌না।' এবার বলরামবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—'একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি তুমি ভবানীর অবস্থা ভেবে দেখে বলেছ কি, ভবানী রেণুর সঙ্গে যাক্? তুমি কি ভবানীকে রেণুর মত ছোট মনে কর' না তোমার মত প্রবীন মনে কর বল দেখি।" স্বামীর কথা শুনিয়া সাবিত্রী বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—'জানি না বাবু কি হবে, অত ভাবিতে পারি না, নয় একলাই যাবে; ধরে বেঁধে গাড়ীতে তুলে দেব সেখানে গিয়ে যাহা হয় করুগ।' রোষ ভরে সাবিত্রী গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। যথা সময়ে রেণুকে লইতে গাড়ী আসিল। মণিলাল স্কুলে চলিয়া গিয়াছে। রেণু যখন দেখিল সত্যই তাহাকে যাইতে হইবে, তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সাবিত্রী তখন কন্যাকে সান্ত্বনা না করিয়া, আরও তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং রোষ ভরে তাহার যাইবার উদ্যাগ করিতে লাগিলেন। ঘরে বসিয়া বলরাম বাবু সকল শুনিয়া বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া ভবানীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'ভবানী মেয়েটা যে কেঁদে কেঁদে মরে গেল,' ভবানী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলরাম বাবু বলিলেন,—'তুমি ওর সঙ্গে যাও আর কি বলিব মা! দেখো নিজের অবস্থার কথা ভুলিও না। একদিন পরে চলিয়া আসিও। যাও ঠিক হইয়া লও।' ভবানী সাবিত্রীর কাছে যাইয়া বলিলেন, মামি মা! মামা বাবু আমাকে রেণুর সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন।' এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন রেণুকে শান্ত করিয়া সাজাইয়া, ভবানীকে যথোচিত উপদেশ দিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। গাড়ী চলিয়া যাইলে, সাবিত্রী স্বামীর নিকট আসিয়া বসিয়া বলিলেন, 'উহারা চলিয়া গেল।' বলরাম বাবু বলিলেন, 'হুঁ কাজটা ভাল

হইল না।' তখন সাবিত্রী বলিলেন,—তবে ভবানীকে যাইতে বলিলে কেন? এখন আবার হুঁ করিতেছ কেন?'

(২১)

রমেশ উদ্বিগ্ন চিত্তে কান স্থির করিয়া রেনুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিল। অল্পক্ষণ পরেই যখন গাড়ী আসিয়া দরজায় থামিল, রমেশ উঠিয়া বারণ্ডায় দাঁড়াইলেন, দেখিলেন রেনু গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার পশ্চাতে শুভ্র থান পরিহিতা একজন রমনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন রমেশ ভাবিলেন এই রমণী কে? বোধ হয় সেই বিধবা মেয়েটী যাহার নাম ভবানী। যদিও ভবানীর সহিত রমেশের আলাপ পরিচয় করেন নাই, তথাপি অনুমানে ইহা বুঝিয়া লইলেন। উহাদের উপরে উঠিতে দেখিয়া রমেশ আবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। রেণু কথা কহিতে কহিতে উপরে আসিল। এবং ভবানীকে সকল ঘরের জিনিষের পরিচয় দিতে লাগিল। ঝিয়ের সহিত কথা কহিতে লাগিল। মাতার পালিত চন্দনা পাখীর খোঁজ লইল। রমেশ ঘরে বসিয়া সব শুনিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন রেনু কি একবারও আমার খোঁজ লইতে এ ঘরে আসিবে না। রেনুর পায়ের মল যতবার বাজিয়া ওঠে, রমেশ ততবার মনে করেন, ওই বুঝি রেনু আসিতেছে; কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিল, চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল। তখনও রেনু আসিল না। তখন রমেশের প্রাণে একটা নিরাশার ভাব হইতে লাগিল। তিনি ক্ষুন্ন মনে শয্যায় শুইয়া সংবাদ পত্র পাঠে মনোযোগ দিলেন, কিন্তু পাঠে মন লাগিতেছে না; তিনি মাঝে মাঝে কান স্থির করিয়া রেনুর সংবাদ লইতেছেন। আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। তখন ভাবিলেন এবার বোধ হয় রেনু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তিনি শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মনে কত রকম চিন্তা আসিতে লাগিল। তিনি ভাবিতেছেন, আজ রেনুর জন্য আমার মন এত চঞ্চল হইতেছে কেন, তবে কি আমি রেনুকে ভালবাসি? হাঁ, তাহা অস্বীকার করিব কি করিয়া, সত্যই তাহাকে ভালবাসি কিন্তু সে ভালবাসা কি সে আমার স্ত্রী বলিয়া? না না তাহা কখনও নয়, স্ত্রী বলিতে যে সুবাসের মুখ খানি চোকের উপর যেন দেখিতে পাই, সুবাস যে আমার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া আছে সেখানে যে আর স্থান নাই। তখন রমেশ চন্দ্র মনে মনে সুবাসের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, সুবাস তোমার স্বামী অকৃতজ্ঞ নহে, যে হৃদয় তোমার ছিল, আজও সে হৃদয়

তোমারি স্মৃতিতে পূর্ণ আছে, সেখানে আর কাহার স্থান নাই কখন হইবেও না।' রমেশের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। রমেশ তন্ময় হইয়া অতীতের কত সুখ স্মৃতির কথা ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে যেন কাহার কণ্ঠ স্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে শুভ্র-বসনা স্থিরা এক পবিত্র মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ত্রস্তে উঠিয়া বসিলেন। রমনী বলিলেন, 'আপনার খাবার দেওয়া হইয়াছে উঠিয়া আসুন।' রমেশ তখন আপনাকে সংযত করিয়া বলিলেন, 'হাঁ যাই।' রমনী চলিয়া গেলেন। রমেশ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া আহারে বসিলেন। রমনী আবার আসিয়া সেই স্থানে বসিয়া একটী একটী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রমেশ নত মুখে আহার করিতে তাহার যথা সম্ভব উত্তর দিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

আশা।

(শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল্।)

ওগো, কেন শোক? কেন বিষণ্ণ, মুখ ম্লান?
আশা নাই! শুধু নিরাশারি অনুশোচনা!
আসে, ওই ঊষা,—তিমির-নিশার অবসান!
(কর) কমলমাধুরী শিরীষ-সুষমা রচনা!

আছে দুঃখ! কেন তারি লাগি খেদ, অভিমান?
সময় না রয়, স্তব্ধ দাঁড়ায়ে চিরদিন।
আজি যাহা হের দীর্ঘ তপ্ত, অকুরাণ,—
(দেখো) কালিকে হবে তা সুদূর অতীতে চির-লীন!

নয়নের জল মোছ গো বন্ধু—অকারণ!
নব নব সুখ, অনতীত, চির-স্বপনের
ওই আসে,—প্রাণে চির-উজ্জ্বল আবরণ,
আশা, উল্লাস—অবাধ, মধুর বাঁধনের!

রবীন্দ্রনাথ

(৮)

উষালোকের কবি

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্ এ, বি এল,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রতিভার ক্রমবিকাশ—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন উষার কিরণ স্পর্শে প্রবুদ্ধ হইল বাঙ্গালি সমাজ তখন কর্ম্মময় জগত হইতে অবসর লইয়াছে। প্রভাতের কলরোল, উষার ম্লান জ্যোতিঃ, শেফলিকার হাসি চারিদিক হইতে কবির কল্পনাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়েই যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উপবনের মধুরতার মধ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। তাঁহার কাব্যে সেইজন্য এত কোমলতা, ভাবে ও ভাষায় এত মধুরতা, ছন্দে এত সঙ্গীতের ঝঙ্কার।

"কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু সুর
ফুটে অবিরল তরল মধুর"— (বিশ্বনৃত্য)

উষালোকে স্বভাবের সৌন্দর্য্য পান করিতে করিতে, পাখীর গান শুনিতে শুনিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা লোকালয়ে আসিয়া পঁহুছিল। সেখানে নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন সঙ্গীত, নূতন আনন্দ। এই নূতন জগতের চতুষ্পার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার প্রতিভা উষালোকে একদিন সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

আমাদের জাতীয় ভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের সহিত কবির প্রতিদ্বন্দীতা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আপনাকে বাঙ্গালি জগতের

উপযোগী করিয়া লইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়-স্পন্দন সেইজন্য তাঁহার কাব্যে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। প্রতীচ্যভাবে দীক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাধীন চিন্তা যে তাহাকে কল্পনার রাজ্যে কতদূর লইয়া যাইতে পারে তাহার আভাস আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

জাতীয়ভাবের পরিবর্ত্তন—লর্ড রিপনের শাসনকালে বাঙ্গালি যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠে। সিবিল সার্ভিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালি মনে করিল এবার বুঝি সে মানব সমাজে স্বাধীন জাতিগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত হইয়াছে। উচ্চবেতন প্রাপ্ত রাজ-কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হইয়া বাস্তবিক শিক্ষিত বাঙ্গালির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কাগজ, কলম, পুস্তক, বক্তৃতার সাহায্যে যে মানুষের মত মানুষ গঠিত হইতে পারে না, একথা আমরা তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝিতেছি না। তথা কথিত স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রাপ্ত শিক্ষিত বাঙ্গালি সেইজন্য আজও কর্ম্ম-কুশলতা শিক্ষা করিতে পারে নাই।

"হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—এই হ'ল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া, কাঁদে সে দু'হাত তুলি॥"

(আকাশের চাঁদ)

বাঙ্গালির বাগাড়ম্বরে মনে হয় যেন সে একজন গ্লাড্ষ্টোন্ কিম্বা লয়েড্ জর্জ্জ। আমরা রাজনৈতিক উন্নতির পথে যেমন কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও তেমনি আমাদের লক্ষ্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জগতকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানব সমাজের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালির শুষ্ক জ্ঞানবাপীর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপাততঃ আশ্রয় লইয়াছে। বেদ, বাইবেল কোরান, গীতা, দর্শন প্রভৃতিতে যত কিছু তত্ত্ব আছে শিক্ষিত বাঙ্গালির ধর্ম্মজীবন তাহার সংক্ষিপ্তসার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালির মত বিশ্ব-প্রেমিকও পৃথিবীতে কেহ কখন দেখে নাই। বাঙ্গালি নিজের দেশে, নিজের সমাজে উপেক্ষিত হইলেও বাঙ্গালাদেশের বাহিরে তাহাকে অনেকেই সম্মান করিয়া থাকে। আদান-প্রদানের নিয়মে বাঙ্গালি সেইজন্য এক পক্ষে যেমন স্বজাতির নিকট সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া থাকে, অপর পক্ষে তেমনি বিদেশীর নিকট নিজেকে উদারতার অবতার প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হয়। বাঙ্গালির জাতীয় চরিত্রে এই যে অসঙ্গতি দোষ দেখা যায় তাহার মূল কারণ আমাদের ভিত্তিহীন শিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর

প্রতীচ্য ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে জাতীয় ভাবগুলিকে অকালপক্ক করিয়াছে। আমরা জাতীয় জীবনের শৈশবেই প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

উষালোকে জাগিলাম বটে কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিলাম না। ঘরের দরজায় পরদা টানিয়া দিয়া আমরা পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলাম।

"বসি শুধু গৃহ কোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহল বশে"— (মানস-ভ্রমণ)

পরের নিকট আমরা ধার করিয়া ঘর সাজাইলাম, হারমোনিয়মের সুরে থিয়েটারের গান অভ্যাস করিলাম। তাহার পর—চাকরি না হয় বক্তৃতা। হাকিমি, ওকালতি, কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, ধর্ম্মপ্রচার, নেতৃত্ব করিয়া যতটুকু সময় পাওয়া যায়—রেলে ভ্রমণ না হয় জলযাত্রা। ঘরের বাহিরে আসিলাম বটে কিন্তু স্বদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম না। বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে না গেলে আমাদের মন স্থির হয় না। বঙ্গদেশে শিক্ষিত বাঙ্গালি যথার্থই প্রবাসী। বাঙ্গালির অসাম্প্রদায়িকতা, সার্ব্বজনীনতা, বিশ্বপ্রেমিকতা প্রভৃতি উদার ভাবের আতিশয্য বাঙ্গালি কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই জন্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

প্রকৃত সমালোচনা—পাঠকের অন্তররাজ্য প্রকৃত সমলোচনার স্থান। ভাষার বাহনে যে সমালোচনা বাহিরে আসে তাহা অনেক সময়ে শব্দ-পরিচ্ছদে অপরূপ-দর্শন হইয়া থাকে। অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অধিকাংশ সমালোচনা অতিরঞ্জিত। এরূপ সমালোচনায় কোন কবি যে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন তাহা ত বোধ হয় না। অন্ধ ভক্তের পূজায় কবির যশঃ বৃদ্ধি হয় না। স্বাধীন সমালোচনায় কবি যতটুকু প্রশংসালাভ করেন তাহাই চিরকাল তাঁহার নামের সহিত থাকিয়া যায়। শত্রুর মুখে কণামাত্র প্রশংসার মূল্য আরও অধিক।

কাব্যের প্রকৃত সমালোচনা কবির মৃত্যুর পর আরম্ভ হয়। সেক্ষপীয়রের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁহার নাট্য-কাব্যের যে সমালোচনা সুরু হয় তাহা এখনও শেষ হয় নাই। কালিদাস সেক্ষপীয়রের আটশত বৎসর পূর্ব্বেকার কবি। তাঁহার কাব্যের সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। মানুষের জ্ঞান ও শিক্ষা যত বিস্তৃতি লাভ করে, প্রকৃত সমালোচনার মূল্য তত বাড়ে। কবির জীবনকালে দুই চারিজনের প্রশংসা বা নিন্দায় তাঁহার কাব্যের গুণ বা দোষ সাব্যস্ত হয় না। ভবিষ্যত রবীন্দ্র

নাথকে মনের মন্দিরে বসাইয়া সেবা করিবে কি না আমরা জানি না। বর্ত্তমানে তাঁহার কাব্য ভাবের রাজ্যের সহিত কতটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছে তাহারই আলোচনা করা উচিত।

উষা-স্মৃতি—উষার সৌন্দর্য্য, উষার প্রেম, উষার আনন্দ ভুলিবার নহে। জীবনের প্রভাত সময়ে যে আশা ও উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালি কর্ম্মময় জগতে প্রবেশ করে, সে আশা, সে উৎসাহ যখন জীবন-সংগ্রামের মধ্যে "হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে" হারাইয়া যায়, তখন তাহার ব্যথিত মনে উষার স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

> "কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
> জীবনের তরুণ বেলায়
> খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
> দুলিত রে অরুণ-দোলায়?
> সচেতন অরুণ-কিরণ
> কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?
> সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
> সে আমার সুকুমার আমি!" (পথ ভ্রষ্ট)

শিক্ষিত বাঙ্গালির জীবন-সঙ্গীতে ভাবের কি গভীরতা! "আমি"-র প্রত্নতত্ত্ব—পূর্ব্বজন্মের "আমি" নহে, ইহজন্মের "আমি"।

> "চারি দিকে মলিন আঁধার,
> কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
> কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
> কোথা গো প্রভাত রবিকর?" (পথ ভ্রষ্ট)

ভগ্ন-হৃদয়ের ভাষা—ইচ্ছা হয় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠি। মরণের পরেও বুঝি উষার কথা কেহ ভুলে না!

> "একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
> পড়িবে নয়ন'পরে অন্তিম নিমেষ।
> পরদিনে এই মত পোহাইবে রাত,
> জাগ্রত জগত'পরে জাগিবে প্রভাত।" (দুর্লভ জন্ম)

এমন কি, যে ভাগ্যবান বন্দী "কুসুমের কারাগারে" প্রেমের শাস্তি ভোগ করিতেছে তাহারও প্রাণ উষালোকের জন্য কাঁদিয়া উঠে।

"কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ!
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক্ অবসান!" (বন্দী)

উষার আনন্দ—প্রভাত সঙ্গীতেই উষার আনন্দ; রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আমরাও কবির সহিত,—

নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পূরব আকাশ পানে
রয়েছি চাহিয়া,
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
উঠিবে গাহিয়া! (নিশীথ-জগৎ)

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যখন উষার রহস্য ব্যক্ত হয় তখন এই আনন্দ-সঙ্গীতে তাঁহার কবি-হৃদয় অধীর হইয়াছিল।

"ওরে চারিদিকে মোর,
একি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্, কারা, আঘাতে আঘাত কর!
(ওরে আজ) কি গান গায়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর।" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

উষার আনন্দ-সঙ্গীত "দেবতার সামগীতি।" বিশ্বচরাচর এই "ভাষাশূন্য অর্থহারা" গান গাহিতেছে।

• "প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্ম্মদ্বার মুহূর্ত্তেকে করি উদ্ঘাটন
নির্ব্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার" (ভাষা ও ছন্দ)

রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদিগকে উষা-কিরণের আশীর্ব্বাদ মাগিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আনন্দেতে জাগো আজি,
আনন্দেতে জাগো!
ভোরের পাখী ডাকে যে ঐ
আর নিদ্রা না গো।
প্রথম আলোক পড়ুক মাথে,
নিদ্রাহীন আঁখির পাতে,
প্রথম উষা-কিরণের
আশীর্ব্বাদ মাগো!

ভোরের পাখী-সাথে আজি
　　আনন্দেতে জাগো ”　(ভোরের পাখী)

চিত্রাধারে উষালোকের ছবি—কবিরা অনেকের মতে—পাগল। কোন কবি 'চাঁদ' 'চাঁদ' করিয়া পাগল, কেহ বা সঙ্গীতের জন্য পাগল, আবার কেহ প্রেমের জন্য পাগল। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন কবি বোধ হয় 'উষা' 'উষা' করিয়া এত পাগল হন নাই। রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠীর ফল কেহ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন কি না আমরা জানি না কিন্তু তাঁহার নামের সঙ্গে উষার যে একটা প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে তাহার সন্দেহ নাই। "উষালোকের কবি" আর "উষালোকের রবি"র মধ্যে প্রভেদ কিছুই নাই—যা আছে তা' নামমাত্র। উষার কথা, উষার উপমা, উষার প্রসঙ্গ কত মতে কত বিভিন্নভাবে যে কবি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। "শিশির নির্ম্মলা উষা," "অরুণময়ী তরুণী উষা" "নির্ম্মল তরুণ উষা"—আদরের নামের শেষ নাই।

উষার অলসতা—　"সকাল বেলা অরুণ আলো
　　পড়ে জলের পরে,
　নৌকা চলে দু'একখানি
　　অলস বায়ুভরে।"　　　কূলে)

উষার নগ্ন সৌন্দর্য্য—　"আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
　　লাজহীনা পবিত্রতা শুভ্র বিবসনে।"　(বিবসনা)

হাসিতে উষার আভাস—
　দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
　হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
　হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
　আঁখি—তারকার দেশে করিবারে বাস।　(হৃদয় আকাশ)

উষা স্নানে ব্যাঘাত—　"ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে!
　দুয়ার রয়েছে খোলা,　　স্নান জল নাই তোলা,
　　মূর্খাধম আসে নাই রাতে।"　　(কর্ম্ম)

উষার আধ' আলো—　"তখন উষার আধ' আলো
　　পড়েছিল মুখে দুজনার,
　তখন কে জানে কারে,　　কে জানিত আপনারে,
　　কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!"　(পুরুষের উক্তি)

উষার চাঁদ— "দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
উষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।" (শেষ চুম্বন)

উষালোকে ফোটো-ফোটো ফুল—
"এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোট, উষালোকে ফোটো ফোটা,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে!" (দুর্বোধ)

উষার দান— "একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
অন্ধ বালিকা
পত্র পুটে আনিয়া দিল
পুষ্প মালিকা।" (নারীর দান)

উষা প্রসঙ্গ—লজ্জিতার উক্তি—
"এমন সকাল বেলা পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্ত-কুসুম মেলা দু'ধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে, সকলি তোমার হবে,
কেবল সরম থাক্ আমারি।" (লজ্জিতা)

উষা প্রসঙ্গ—পতিতার উক্তি—
"মোরা গাঁথা মালা প্রমোদরাতের,
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে
লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে।" (পতিতা)

উষায় ব্রজের রাখাল বালক—
"ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই—
ডাকে পরস্পরে!
ওরে ঐ যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠ্ল ঘরে ঘরে!" (জন্মান্তর)

উষার বাতাস— নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।

রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।" (লজ্জিতা)

উষার অশ্রু— "কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে ?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা
তাই কি শিশির ঝরে ?"
(নব-বঙ্গ দম্পতীর প্রেমালাপ)

অতিবাদে উষা— "ত্রিভুবনে সবার বাড়া,
একলা তুমি সুধার ধারা,
উষার ভালে একটি তারা
এ জীবনে একটী আলো !"— (অতিবাদ)

ঝড়ের পরে উষা— "এত দিন পরে প্রভাত এসেছে
কি জানি কি ভাবি মনে !
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।" (দুর্দ্দিন)

উষার পূজা— "তখন অরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা সোণার থালে।
সীমাহীন নীলজল করিতেছে থল থল,
রাঙা রেখা জ্বল জ্বল কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগণ ভালে।" (অনাদৃত)

উষার রাখী— কোমল তব পাখা' পরে
সোণার রেখা থরে থরে,
বাঁধা আছে ডানায় তব
উষার রাঙা রাখী !
ওগো তুমি ভোরের পাখী
ভোরের ছোট পাখী !" (ভোরের পাখী)

উষায় পত্র প্রাপ্তি— "না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ !
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি !
পেয়েছি এই সুখে আজি,

পেয়েছি এই সুখ !
কারেও আমি দেখাব নাক সেটি !" (চিঠি)

উষায় শিশুর জাগরণ— "নূতন জাগিয়া শিশু
নূতন উষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ্ ! (বন্দীবীর)

উষার লগ্ন— "আজি এ উষার পুণ্য লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।" (জাগরণ)

উষা ও সন্ধ্যা—উষার ও সন্ধ্যার বর্ণে অনেকটা মিল আছে। ম্লান আলোয় উভয়েরই ঐক্য দেখা যায়। উষা নিদ্রালস, সন্ধ্যা নিদ্রাকাতর। অন্ধকারের একপ্রান্তে উষা আর একপ্রান্তে সন্ধ্যা। রবীন্দ্রনাথ উষালোকের কবি ; তাই তাঁহার সন্ধ্যা বর্ণনায় উষার আলোকের আভাস পাওয়া যায়। উষাকে ও সন্ধ্যাকে অনেক সময়ে তিনি পাশা-পাশি বসাইয়াছেন। উষার মত সন্ধ্যারও এলোমেলো কেশপাশ, সিন্দুরের ফোঁটা, রাঙা অধরে হাসির কথা কবি মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন।

"অয়ি সন্ধ্যা,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া,
নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ
জগতেরে কোলেতে লইয়া,
মৃদু মৃদু ওকি কথা কহিস্ আপন মনে
মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে
জগতের মুখপানে চেয়ে !" (সন্ধ্যা)

সন্ধ্যার গানে গাম্ভীর্য্য আছে, বাতাসে দুঃখের নিশ্বাস বহে।

"ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
দেখে আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দু' নয়নে,
ফেলিতেছি দুঃখের নিশ্বাস !" (আবার)

উষার ও সন্ধ্যার যে টুকু আঁধার তাতেই যত নিরানন্দ, যত ত্রাস, যত ভাবনা ও সংশয়। তবে, উষার আঁধারের শেষে-"অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা"

কিন্তু,— "সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপণ
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে—" (হৃদয়ের ভাষা)

জগতে এমন অসঙ্গত বন্দোবস্ত দেখিলে কাহার হৃদয় বিদ্রোহী না হয়? রবীন্দ্রনাথের মত আমাদেরও ইচ্ছা হয় স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করি, সন্ধ্যা ও উষাকে তাহার অধিকার হইতে কাড়িয়া লই।

"ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারান সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালণ।" (সংগ্রাম-সঙ্গীত)

প্রলাপ! প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! যে বাঙ্গালির অন্তরের মাঝে "নিঃশব্দ-গম্ভীর-মন্ত্রে" চিরকাল প্রেম-ভক্তি, রাজ-ভক্তি, প্রভু-ভক্তির আরতি ধ্বনিত হইতেছে তাহার মুখে বিদ্রোহের কথা শুনিলে কৌতুক বোধ হয়।

—"ধীরে নামাইয়া আন
বিদ্রোহের উচ্চ-কণ্ঠ পূরবীর ম্লান
মন্দস্বরে! রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ!
আজি এই শুভক্ষণে
শান্তমনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে!" (সন্ধ্যা)

প্রকৃতির সহিত মানুষ বিরোধ করিলে অন্তর্জগতে যে অশান্তি দেখা দেয় তাহার ফলে অনুতপ্ত হৃদয় সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। উষা ও সন্ধ্যার সহিত প্রকৃতির যে ভালবাসাবাসি তাহাতে বাদ সাধিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। দুই জনকেই তিনি সমান আদর করেন। উষার যেমন বেশ-ভূষা, সন্ধ্যারও তেমনি, যে গান ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি গাহিয়া ছিলেন,

"সে শুধু শুনেছে নির্ম্মল উষা
নির্ম্মল গিরিশিখর পরে!

সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা

নীল নির্ব্বাক্ সিন্ধু তলে— (পতিতা)

প্রকৃতি দেবী তুমি ধন্য!

"প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,

পূজার সাজি ভরি ;

সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির

বরণ ডালা ধরি।" (কল্যাণী)

"সন্ধ্যার কনকবর্ণ," "উষার গলিত স্বর্ণ" ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে উষা আর সন্ধ্যার মধ্যে অনৈক্য খুব কম। সন্ধ্যা উষার ভগ্নি কি স্বপত্নী তাহা আমরা জানি না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট উষার সম্বাদ খুব বেশী পাওয়া যায়। কবির কল্পনার উপর উষার আধিপত্য ষোল আনা। বাঙ্গালি এখনও উষার সঙ্গী।

উষার মিলন দৃশ্য—অতীত ও বর্ত্তমানের, পুরাতন ও নূতনের, নিদ্রা ও জাগরণের যেখানে মিলন উষার উন্মেষ সেইখানে। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সেই জন্য যুগল কবিতায় উষার আঁধার আলোক ফেলিয়া প্রকৃতির যুগ্ম-ভাবের বিচিত্র বিকাশ দেখাইয়াছেন।

"উঠিছে প্রভাত রবি, আঁকিছে সোণার ছবি,

তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!

বারেক যে চলে যায়, তারেত কেহ না চায়,

তবু তার কেন এত মায়া!" (পুরাতন)

"ঘোর ঝটিকার রাতে, দারুণ অশণি পাতে

বিদারিল যে গিরি-শিখর—

বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,

প্রকাশিলে যে ঘোর গহ্বর—

প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!" (নূতন)

উষা ও মৃত্যু—রবীন্দ্রনাথ উষার কথা ভাবিতে ভাবিতে জীবনের পর পারের কল্পনা করিয়াছেন।

"কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের

গীতিময়ী ভাষা,—

ওরে মৃত্যু জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস্ বাসা !

* * * *

চারিদিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায় ;
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায় ;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি,— (প্রতীক্ষা)

মরণের প্রতীক্ষায় হৃদয়ে যে অবসাদ আসে ঊষালোকে তাহা অসহ্য বোধ হয়।

"আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল কর'।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হতে হর' !
প্রভাত-জগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি'
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি,"— (অবসাদ)

মৃত্যুদুত যাহার জন্য আসিয়াছে "রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত।"

"আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি,"— (মৃত্যুদুত)

মৃত্যুরও ঊষাকাল আছে।

"—মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মত !"

(প্রবাসের প্রেম)

মৃতের কণ্ঠস্বর যদিও শুনা যায় না কিন্তু—

"বৃষ্টি ধৌত প্রভাতের আলোক হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।

* * * *

আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি
"আজি প্রাতে সব পাখী উঠিয়াছে গাহি—

শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাত বায়ে
অনন্ত জগৎ মাঝে গিয়াছে হারায়ে।" (বিদায়)

সাধন চিত্র—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার রাণী প্রকৃতিদেবীর মালঞ্চের মালাকর। তিনি যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মত—

—"চিরদিন
স্বেচ্ছাবী দাস, খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন !" (আবেদন)

রাণী স্বয়ং তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

"রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর !" (আবেদন)

রাজসভায় শিক্ষিত বাঙ্গালিরও ত ঠিক এই অবস্থা ! কবি নিজে যখন এই অভিলষিত পদের জন্য আবেদন করেন তখন রাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"ওরে তুই কর্ম্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কি কাজে লাগিবি ?"—

তাহার উত্তরে ঊষালোকের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে—শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ু স্রোতে
করি দিয়া বিসর্জ্জন—সে বন-বীথিকা
রাখিব নবীন করি ; পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ ঊষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশ-তৃষায়
পুলকিত তৃণ পুঞ্জতলে।"— (আবেদন)

বাঙ্গালির জাতীয় জীবনের কি সুন্দর সমালোচনা ! ঊষালোকের কবি বাঙ্গালি জীবনের সাধন-চিত্রে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ঋণ-পরিশোধ।

(১)

(লেখক—শ্রীবাসুচরণ দে বি, এল্।)

দিল্লী সহরে রতনচাঁদের দোকান জিজ্ঞাসা করিলে পাঁচ বৎসরের বালকও দেখাইয়া দিতে পারিত। রতনচাঁদ স্বয়ং বাদসার প্রাসাদে খোস্‌বো যোগায়, কাজেই তাহার প্রভূত প্রসার ও প্রতিপত্তি, এবং তাহার দোকানের মত বৃহৎ জাক-জমকশালী খোস্‌বোর দোকান দিল্লিতে আর ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রতন বলিত তাহার বাড়ী জয়পুর এবং সে জাতিতে ক্ষত্রিয় কিন্তু লোকে তাহাকে রতনচাঁদ বেনিয়া বলিয়া অভিহিত করিত।

রতনের বয়স ত্রিশের মধ্যে, বর্ণ ফিট্ গৌর, এবং গঠন ক্ষত্রিয়োচিত। এত অল্পবয়সে রতনের এরূপ উন্নতি দেখিয়া কেহ যে ইন্দ্রিয়-বিশেষে বেদনা অনুভব করে নাই, একথা মিথ্যা। যাহা হউক তাহাতে রতনের কিছুমাত্র আসে যায় নাই। যেহেতু উপরোক্ত ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যেই কেহ কেহ বলিত "শুনেছ হে, রতন নাকি আগরায় আর একখানা দোকান খুল্‌ছে।" কথাটা মিথ্যা নয়, যথার্থই রতনচাঁদ আগরায় আর একখানা দোকান খুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহার স্ত্রী মোতিয়া ব্যতীত রতনচাঁদের সংসারে আর কেহ ছিল না। মোতিয়া রতনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী হইলেও সে তাহাকে যে রকম ভালবাসিত লোকে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে সেরকম ভালবাসে কিনা তাহা কেবল যাহাদের সে সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারাই বলিতে পারে। মোতিয়াও স্বামীর আদরের যথোচিত প্রতিদান দিতে চেষ্টার ক্রটী করিত না। সে রতনের চেয়ে বছর সাত আটের ছোট ছিল এবং সে সুন্দরী ছিল কিনা তাহা যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে তাহারাই বলিতে পারিত, তবে, আমরা শুনিয়াছি মোতিয়াকে দেখিলে দুদণ্ড চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিত। সে যে কেবল রতনের সংসারের গৃহিনী ছিল তাহা নহে, সে রতনের ব্যবসায়ের সাহায্যকারিণীও ছিল, এবং রতন যখন না থাকিত, তখন পরিচারিকার সাহায্যে সেই দোকান চালাইত।

গ্রীষ্মকাল। বৈশাখমাস। বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। ভীষণ গরম পড়িয়াছে। দিল্লীর পথে মানুষের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না কেবল উত্তপ্ত পবন উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে পথি-মধ্যে এক একটা গজ শুণ্ডাকার ধুলি-স্তম্ভের সৃজন করিতেছে। মোতিয়া দোকানে বসিয়া আছে। দাসী অদূরে পান সাজিতেছে। রতন এখানে নাই। আজ চারিদিন হইল সে আগ্রা গিয়াছে, খবর পাঠাইয়াছে আসিতে এখনও সপ্তাহ খানেক] বিলম্ব হইবে। একখানি রজত পাত্রে পান গুছাইয়া রাখিয়া পরিচারিকা ভিতরে গমন করিল। মোতিয়া একাকানি বসিয়া রহিল। রতন এখানে নাই, তাহার অনুপাস্থিতে মোতিয়ার সব শুণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে আশ্রয়হীনা, অনাথিনী ছিল, রতনের কৃপায় আজ সে এসমস্ত সুখের অধিকারিণী। স্বামীর সোহাগে সে রাজরাণীকেও তাহার অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিত না। রতনের অদর্শন আজ সে একান্তই অনুভব করিতে লাগিল। এই সময়ে বাহিরের পর্দ্দা ঠেলিয়া এক ব্যক্তি দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার পরিধানে সৈনিকের পরিচ্ছদ। মোতিয়ার চমক ভাঙ্গিল। খরিদ্দারের আগমনে সে ত্রস্ত হইয়া বসিল। আগন্তুক অগ্রসর হইলে তাহাকে দেখিয়া মোতিয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল সে পলাইয়া যায়, কিন্তু ক্ষমতায় কুলাইল না, সে নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ বসিয়া রহিল। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখরালোক হইতে দোকানের মধ্যে আসিয়া আগন্তুক প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। পরে চক্ষের অন্ধকার দুর হইলে মোতিয়ার বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "লক্ষ্মী না? লক্ষ্মীইত! আরে বাঃ! লক্ষী বাই যে? এখানে?" মোতিয়ার বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল—আগুন্তকের বদন কুটীলহাস্য-রেখায় ঈষৎ রঞ্জিত হইল। ভয়সঙ্কুলচিত্তে মোতিয়া দোকানের ভিতর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল. "চুপ কর, একটু পরে সব বল্‌ছি।" "আঃ। সে জন্যে আমি সমস্ত দিন অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি।" এই বলিয়া সে নিকটস্থিত একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িল।

পরিচারিকা এক পেয়ালা সরবৎ আনিয়া মোতিয়ার সম্মুখে রাখিল। সে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া বলিল, "যমুনা, তুমি এখনই একবার মিয়াজান দর্জ্জির কাছে যেতে পার? তাকে বলে এস যে আমার নূতন পেশোয়াজটা আজই চাই।" রতনের দোকান হইতে মিয়াজানের দোকান আধক্রোশের উপর

হইবে। এই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে এতটা যাইয়া, ফিরিয়া আসিতে হইবে শুনিয়া যমুনার অঙ্গ শীতল হইয়া গেল। মনে যাহাই হউক সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না, নিঃশব্দে প্রভুপত্নীর আদেশ পালনার্থ গমন করিল।

"কিষণলাল, এখন তুমি কি কর্ত্তে চাও? তুমি কি আমার কথা প্রকাশ কর্ত্তে চাও?" মেতিয়া কম্পিতস্বরে এই কথা বলিয়া উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে সৈনিকে মুখের দিকে চাহিল। কিষণলালের মুখে তখনও পৈশাচিক হাসি। সে পাগ্‌রি নামাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "হুঁ; কি চাই? আগে ঐ পেয়ালাটা চাই।" এই বলিয়া সে হস্ত প্রসারণ করিল। মোতিয়া কম্পিতহস্তে পেয়ালা সরাইয়া দিল। "ক'দিন আজ সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল এদেশ ওদেশ করে ঘুরে বেড়ান। এই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সামনে সরবতের পেয়ালা আর বলে কিনা 'কি চাই?' হুঁ!" এই বলিয়া সে আনন্দের সহিত সরবৎ পান করিতে লাগিল, আর মেতিয়া মানসিক উদ্বেগে আপনার অঙ্গুলি মোচ্‌ড়াইতে লাগিল।

এক নিঃশ্বাসে সরবৎ পান করিয়া কিষণলাল পেয়ালা নামাইলে মোতিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কি কর্ত্তে চাও?" আমার কি করা উচিৎ তা'ত তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ!" কিষণলাল নিরসস্বরে বলিল, "আমার উচিৎ কোতোয়ালীতে খবর দেওয়া যে খুনী আসামী লক্ষ্মীবাঈ এখনে রয়েছে। তারপর তোমাকে যোধপুরে চালান দেওয়া।"—

"কিষণলাল, আমি নির্দ্দোষী। ভগবান্ জানেন, আমি নির্দ্দোষী, আমি খুন করি নাই। তুমিও ত তা'জান।"

"তুমি খুন করেছ কি না সে বিচার কাজির কাছে হবে। কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া যত পার ভগবান্‌কে ডাকিও।"

কারাগারের নাম শুনিয়া মোতিয়া আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "ভগবানের দোহাই, কিষণলাল, আমার সর্ব্বনাশ করিও না। আমার অর্থের অভাব নাই, আমার স্বামীর বুকপোরা ভালবাসা, অটুট বিশ্বাস এসমস্ত সুখ হ'তে আমায় বঞ্চিত ক'র না। আমি তাঁহার কাছেও একথা প্রকাশ করি নাই, একথা শুনিলে তাঁর বুক ভেঙ্গে যাবে—তিনি অতি সৎলোক—আমি তাঁর বিশ্বাস হারা'ব —পাগল হ'য়ে যা'ব।" মোতিয়া এইখানে থামিয়া, আবার বলিতে লাগিল, "তোমার বাবা, আমায় কত ভাল বাসিতেন, তুমি আমায় কত স্নেহ করিতে —বাল্যের সেই সব কথা স্মরণ ক'রে আমায় রক্ষা কর—আমার সর্ব্বনাশ

ক'র না।” সে চুপ করিল, দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণের পূর্ব্বে অপরাধীর ন্যায় কাতর নয়নে কিষণলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের তরঙ্গের আঘাতে হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

কিষণলাল জিজ্ঞাসা করিল, “এদোকান তোমাদের?” মোতিয়া বলিল, “হাঁ, আমার স্বামীর।”

“তোমার স্বামী কোথায়?”

“তিনি আগ্রায়। সেথানে আমাদের একথানা নতুন দোকান খোলা হ'চ্ছে, তিনি তারই ব্যবস্থা করতে গিয়াছেন।”

“হুঁ! তাহ'লে বেশ পয়সা করেছ দেখছি। যাক, এখন কাজের কথা কও।”

“কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।”

“বলছি এখন মুখ বন্ধ করতে কত আসরফি দিতে রাজি আছ, এখনই।”

মোতিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল' তাহার হৃদয়ের একটা বিষম ভার নামিয়া গেল। সে বলিল, “আমার যা আছে সবই দোব।”

“এইত হ'ল কথার মত কথা। এখন দেখছি তোমার বুদ্ধি আছে।” এই বলিয়া সে সম্মুখস্থ মেজের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করি। “কত আছে?”

“তিনশত আসরফি। আমি ক্রমে ক্রমে সেগুলি জমিয়েছি।”

সে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কাছে আছে?” অর্থলিপ্সায় তাহার নাসিকাগ্র স্ফুরিত হইল।

“আমি এখনই আনিয়া দিতেছি।” মোতিয়া চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ একটা ক্ষুদ্র থলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। কিষণলাল আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইল। মোতিয়া তাহার হস্তে থলিটী প্রদান করিয়া বলিল, “এই লও, আমি এগুলি অনেক যত্নে সঞ্চয় করিয়াছিলাম লও, কিন্তু আর এপথে আসিও না।”

কিষণলাল কোনও কথা কহিল না, সে ধীরে ধীরে আসরফিগুলি গণিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে পকেটের মধ্যে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “ইহাতেই হইবে।” পরে দ্বারের নিকট গিয়া বলিল, “এখন এই পর্য্যন্ত।”

“কিন্তু আমার আর নাই,” মোতিয়া ভগ্নস্বরে বলিল। পর্দ্দা সরাইতে সরাইতে সে পুনরায় বলিল, “এখন এই পর্য্যন্ত।”

হৃদয়ের আবেগে মোতিয়া দ্বারের নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, “কিষণলাল —।” উত্তরে পর্দ্দার ওপাশ হইতে একটা উচ্চহাস্য তাহার কর্ণে আসিল,

এবং তার পর সে দেখিল কিষণলাল একটা কুৎসিত গান গাহিতে গাহিতে পথে চলিয়া যাইতেছে।

(২)

কিষণলালের সহিত মোতিয়ার দেখা হইবার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু মোতিয়া এখনও সুস্থ হইতে পারে নাই, আজও তার ভয় ঘুচে নাই। এই কয় দিন কিষণলালেল নির্ম্মম কঠোর মূর্ত্তি ক্ষণেক্ষণে তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে ক্লেশ দিয়াছে। প্রত্যেক পদশব্দে তাহার মনে হইয়াছে "ঐ বুঝি কিষণলাল আসিল।" রাত্রে ঘড়ী বাজিবার পর কেল্লার ফটক বন্ধ হইলে সে কতকটা আরাম পাইয়াছে, কিন্তু প্রাতেই হয়ত আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে এই চিন্তায় সে এই কয়রাত্রও নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে নাই।

একজন খরিদ্দারের নিকট দাম লইয়া তাহাকে সহাস্যে বিদায় দিতে গিয়া মোতিয়া দেখিল কিষণলাল তাহার দোকানের দিকে আসিতেছে। তাহার হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে অধরে মিলাইয়া গেল। খরিদ্দার তাহা দেখিতে পাইল না, সে আপন মনে যাহা কিনিয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। কিষণলাল দোকানে প্রবেশ করিল, তাহার মুখে সেই কঠোর নীরস হাস্য। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল সে নেশা করিয়াছে। সে কেন আসিয়াছে মোতিয়া বেশ জানিত, তথাপি সাহসে ভর করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল. "কিষণলাল যে, খবর কি ?" কিষণলাল জড়িতস্বরে উত্তর করিল, "খবর আর কি ? টাকা।" মোতিয়া বলিল, "আমিত তোমায় বলেছি, আমার আর নেই, যা' ছিল সব তেমায় দিয়েছি।"

"আমায় কি কচি ছেলে পেয়েছ ? দোকান ভরপুর, আর বলে কি না টাকা নেই! এসব কি ? সবইত টাকা।"

"কিন্তু এসব ত আমার নয়, এ আমার স্বামীর।"

"তোমার স্বামীর ও যা তোমারও তা। আমায় কি বোকা বোঝাতে চাও নাকি ?"

ভীতিবিজড়িতস্বরে মোতিয়া বলিল, "কিষণলাল তুমি বীরপুরুষ, একজন অসহায়া স্ত্রীলোকের উপর এরূপ অত্যাচার করিও না। আমার যা ছিল, দিয়েছি, আনন্দের সহিত দিয়েছি—তত টাকা তুমি বোধ হয় জীবনে দেখ নাই। তিনদিন বাদে তুমি আবার আমায় ভয় দেখাতে এসেছ, আমায় চুরি কর্ত্তে বলছ! আমি তা কখনই কর্ব্ব না।" কিষণলালের নয়নদ্বয় ক্রোধে প্রদীপ্ত

হইয়া উঠিল। ভ্রূভঙ্গীর সহিত সে বলিল, "কর্ব্বে, একটু যদি ভেবে দেখ তা' হ'লে কোর্ব্বে।" মোতিয়ার মনে হইল তাহার দুর্দ্দিনেও এরূপ নির্ম্মম উত্তর সে কাহারও নিকট পায় নাই; এরূপ কঠোর মূর্ত্তি সে বুঝি কখনও দেখে নাই। সে, ধীরে ধীরে বলিল, "তা' না হ'লে, তুমি কি আমার কথা প্রকাশ কোর্ব্বে বল্‌তে চাও? তুমি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ত্তে চাও!"

কিষণলাল হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে হাস্যের প্রত্যেক কম্পনে যেন একটা তড়িতের তরঙ্গ খেলিয়া মোতিয়ার হৃদয়ে আঘাত করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড যেন নিশ্চল হইয়া গেল। কিষণলাল বলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও তোমার এসমস্ত সুখের মূল্য তিনশত আশ্‌রফি। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি, তা'ই একথা বল্‌ছ।"

মোতিয়া কথা কহিতে পারিল না, ভয়ে তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। কিষণলালের তীব্রদৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহার নয়ন ফিরাইয়া বলিল, "যদি আমি তোমাকে এখন আরও দিই, তাহ'লে কি শোধ হবে?' না আবার তুমি এসে আমার উপর অত্যাচার কর্ত্তে চাও, আমায় হত্যা কর্ত্তে চাও?"

"আমি যখন বুঝ্‌ব যে আমার যা পাওয়া উচিৎ, তা' আমি পেয়েছি, তখন আমি চলে' যা'ব।" সম্মুখের দিকে ঈষৎ নত হইয়া সে ধীরে ধীরে স্পষ্টস্বরে এই কথা কয়টী বলিল। "রতন চাঁদের বণিতা মোতিয়া আর খুনী আসামী লক্ষ্মীবাঈ যে একই লোক, এখরচের দাম তোমার কত বলে' মনে হয়।" লক্ষ্মীবাঈ সেই পুরাতন নাম শুনিয়া মোতিয়া ভয়ে জ্ঞান হারাইল। তাহার পার্শ্বে একগোছা চাবি পড়িয়াছিল, সে তাহা লইয়া ত্বরিতগতিতে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক অঞ্জলি আশ্‌রফী আনিয়া কিষণলালের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই নাও, আর এস না, আর আমায় উত্যক্ত ক'র না।" সে ধীর ভাবে আশ্‌রফীগুলি পকেটের মধ্যে রাখিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ? আর আস্‌বনা? আস্‌তে হবে বইকি। কিন্তু দেখিও, আমি যখনই আস্‌বো তখনই যেন এই রকম পাই। একেবারে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা বুদ্ধির কাজ নয়।" এই বলিয়া সে উৎপীড়িতা বালিকার মুখের দিকে চাহিল। বোধ হয় ক্ষণেকের তরে তাহার পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হইল, সে বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে', আমিও তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর্ব্বো।"

কিষণলাল চলিয়া গেলে মোতিয়া একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাল্যের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। কিষণলালের পিতার কথা

তাহার মনে পড়িল। সে একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিল। প্রাতঃকালে তাহার নাম কেহ মুখে আনিত না। সুদ গণিয়া লইবার সময় বৃদ্ধের বচনে যে ভাব প্রকটিত হইত, টাকা লইবার সময় কিষণলালের মুখে সেই ছবি দেখিয়াছে বলিয়া মোতিয়ার বোধ হইল। অর্থলিপ্সা কিষণলালের মজ্জাগত, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা অতি অল্প, ততক্ষণ তাহার এক কপর্দ্দক থাকিবে, ততক্ষণ সে তাহাকে ছাড়িবে না। রতনচাঁদ আসিলে সে তাহাকে কি বলিবে? এসকলের পরিণাম কি? এই ভাবিতে ভাবিতে মোতিয়া সংজ্ঞা হারাইল, দাসী আসিয়া তাহাকে আহার করিবার জন্য ডাকিয়া উত্তর পাইল না।

(৩)

আজ রতনচাঁদের আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার কথা আছে। পূর্ব্বে হইলে মোতিয়া সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হাসিমুখে, সোৎসুক হৃদয়ে, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিত, কিন্তু আজ তার হৃদয়ে সে আনন্দ নাই, আননে সে হাসি নাই। বেশভূষারও কোনও পারিপাট্য নাই। যে সুঠাম গঠন, যে তপ্তকাঞ্চন বর্ণ তাহাকে রমণীসমাজে সৌন্দর্য্যের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিয়াছিল, আজ একসপ্তাহ হইল সে সুকুমার কান্তি, সে নয়ন বিমোহন লাবণ্য তিরোহিত হইয়াছে। তাহার আগুল্ফ-লম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম আজ অযত্নবিন্যাসে শ্রীহীন। তাহার শুভ্রসুচিক্কণ ললাটদেশ আজ চিন্তারেখা রঞ্জিত। তাহার অধরের রক্ত-গোলাপ আজ হৃদয়ের তাপে বিশুষ্ক। অতীত গৌরবের মধুর স্মৃতির ন্যায় তাহার বিগত সুষমার ছায়াটুকু মাত্র তাহাকে এখন আশ্রয় করিয়া আছে। রতন চাঁদের সাধের সমৃদ্ধিশালী বিপনি আজ তাহারই জন্য শূন্য প্রায়। কিষণলালের অর্থ যোগাইতে সে কখনও অর্দ্ধমূল্যে, কখনও সিকি মূল্যে দোকানের প্রায় সমস্তদ্রব্যই বিক্রয় করিয়াছে। রতন ফিরিলে সে তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইবে! প্রাণ থাকিতে সে মিথ্যা বলিয়া স্বামীকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। অভাগিনী ভাবিয়া আকুল হইল। সে একবার আত্ম-হত্যার সঙ্কল্প করিল, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইল।

সন্ধ্যা হয় হয় এইরকম সময়ে রতনচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে একজন কুলী, মাথায় জিনিসপত্র বোঝাই। মোট নামাইবার পর রতন তাহাকে দাম দিলে কুলী চলিয়া গেল, রতন ও নিঃশব্দে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। মোতিয়া লক্ষ্য করিল তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ। এত দিনের পর স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের সহিত সহিত সাক্ষাৎ হইল কিন্তু কেহই কোনও কথা কহিল না। রতনের মুখ

বিবর্ণ দেখিয়া মোতিয়া ভাবিল তাহার অসুখ করিয়াছে বা সে পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না।

* * * *

আহারান্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ-নিরত রতনচাঁদ নিবিষ্টমনে ধূমপান করিতেছে। বাদসাহী আমলের সুগন্ধি তাম্রকূটের সুবাসিত ধূমগন্ধে গৃহ পরিপূরিত। উল্লাসিত মার্জ্জারের ঘর্ঘর শব্দোপম আলবোলার আনন্দ-সূচকধ্বনি গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। নিকটে পালঙ্কোপরি মোতিয়া উপবিষ্টা। মোতিয়া দেখিল তাহার স্বামীর মুখ তখন বিবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভয় বা বিরাগের চিহ্নমাত্র নাই। হঠাৎ রতনচাঁদ আলবোলার নল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে ধীরে ধীরে মোতিয়ার নিকট আসিয়া তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তাহার ভীতিপাণ্ডুর বদনে চুম্বন করিল। মোতিয়ার মনে হইল এই বুঝি তাহার স্বামীর শেষ চুম্বন। প্রাণের আবেগে সে পতিকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। রতন তাহাকে পুনরায় চুম্বন করিল। প্রেম-বিহ্বল নেত্রে সে স্বামীর প্রতি চাহিল, হৃদয়ের আবেগ আর চাপিতে পারিল না, অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিল, "তোমায় বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি!" স্নেহার্দ্র-স্বরে রতন বলিল, "আমার জন্য তোমার বড় ভয় হয়েছিল, না মতি?" মোতিয়ার মনে হইল তাহার পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে, রতনকে সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। তাহার স্বামী তাহা হইলে জানিতে পারিয়াছে—তাহার হৃদয়ের একটা গুরুভার নামিয়া গেল।

"তুমি শুনেছ?" মোতিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। রতন বলিল, "শুনেছি? তোমার ভয় কিসের মতি?" "শুনেছ, ভালই হ'য়েছে। কিন্তু আমার দোষ নাই, আমায় ঘৃণা ক'রো না।"

"তুমি আমার স্ত্রী, তোমায় ঘৃণা ক'র্ব্বো?" রতনের বিস্ফারিত নয়নদ্বয় গর্ব্বে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মোতিয়া তাহার জীবনের করুণ কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল।—"শৈশবে জননীর মৃত্যু হইলে পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। বিবাহের পর বিমাতা যখন আমাদের বাড়ী আসেন তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে। কেন জানি না, প্রথমাবধি তিনি আমার উপর বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। একটা সূত্র পাইলেই আমাকে ভৎ'সনা করিতেন, এমন কি পরে তিরস্কার প্রহারে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াছিল। এরূপ অকারণ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করিতাম। কি করিব, উপায় নাই। পিতাকে বলিতে সাহস করিতাম না পাছে তিনি কোনও প্রতিবিধান

না করেন। মনে মনে ভাবিতাম সব লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু সে অপমান কোন ক্রমেই সহ্য হইবে না। ক্রমে পিতাও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন, তাহাও সহ্য করিতে হইল।" মোতিয়ার কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহার অশ্রুসিক্ত কপোলে রতন স্নেহ ভরে চুম্বন করিল। "একদিন আমরা, আমি ও আমার বিমাতা, পাহাড়ে বেড়াইতেছি, কি কারণে আমার স্মরণ নাই, কিন্তু বেশ মনে আছে, আমি কোনও দোষ করি নাই, হঠাৎ বিমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার গলা টিপিয়া ধরেন, এত জোড়ে ধরেন যে, আমার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, আমি প্রাণপণে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাই, তাহার ফলে তিনি হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। আমি ভয়ে আর গৃহে ফিরিলাম না। দেশ-ত্যাগ করিয়া পলাইলাম। তাহার পর আমি কি কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা তুমি জান।"

"কিষণলাল কি ক'রে এসব জানলে?"

"ও সে সময় নিকটে আর একটা পাহাড়ে বেড়াইতেছিল।"

"আর কেহ দেখিয়াছে?"

"না।"

"তা' হ'লে এক কিষণলালকেই তোমার ভয়, না মতি?" মোতিয়া কোনও উত্তর করিতে পারিল না, কেবল মাত্র ভীতিবিহ্বল নেত্রে স্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিল। ঠিক সেই সময়ে বর্হিদ্বারে আঘাতের শব্দ শ্রুত হইল।

রতন বলিল, "কিষণলাল এসেছে।" "কেন?" "টাকা নিতে। রাস্তায় আমার কাছে যা' ছিল নিয়েছে, কিন্তু তা'তে সে সন্তুষ্ট নয়। তুমি এস, দরজার পাশে থেক, ওর সাম্‌নে বেরিও না।"

রতন দ্বার খুলিয়া দিলে, কিষণলাল টলিতে টলিতে ভিতরে প্রবেশ করিল। রতন পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার নিকটে আসিল। মোতিয়া দেখিল তাহার স্বামী টাকা গণিয়া দিলে কিষণলাল সেগুলি পকেটে পুরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। রতন দ্বার খুলিল। সে দেখিল কিষণলাল পশ্চিমদিকে নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিল, উত্তরে তাহার স্বামী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল। দ্বারের নিকট তাহাদের আর কি কথাবার্ত্তা হইল মোতিয়া তাহা সব শুনিতে পাইল না; কেবল "শেঠেদের বাগান" আর "কাল সন্ধ্যার সময়" একথা কয়টী তাহার কানে পঁহুছিল।

রতন ফিরিলে সে তাহাকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল সন্ধ্যার সময় শেঠেদের বাগানে কি হবে ?"

রতন বলিল "কা'ল সন্ধ্যার সময় শেঠেদের বাগানে কিষণলালকে আমায় হাজার আশ্‌রফী দিতে হবে।"

(৪)

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অস্তগামী তপনের শেষ রশ্মিগুলি শেঠেদের ভাঙ্গা বাড়ীতে সে দিনকার মত একবার খেলা করিয়া লইতেছে। দিল্লী সহরের প্রান্তভাগে শেঠেদের উদ্যান অবস্থিত। পূর্ব্বে এই উদ্যানের সৌন্দর্য্য বিখ্যাত ছিল, এমন কি সময়ে ইহা বাদসাহের প্রমোদকাননে পরিণত হইত। এখন শেঠেদের আর সে প্রতিপত্তি নাই, বাগানেরও সে শোভা নাই। বন কেটে বাগান তৈরি হ'য়েছিল, এখন সেই বাগান আবার বনে পরিণত হ'য়েছে—প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে। স্থানটা নির্জ্জন, নিকটে লোকালয় নাই। রতনচাঁদ অধীর ভাবে এই উদ্যানে পদচারণ করিতেছে, আর পথের দিকে চাহিতেছে। এই সময় কিষণলাল টলিতে টলিতে রাসিয়া উপস্থিত হইল।" "এই যে রতনচাঁদ, আমার আগেই যে এসে হাজির। এই রকম চাড়ইত চাই—ভাল ছেলের লক্ষণই এই। কই, আমার টাকা দাও, আর দেরী কর্ব্বার দরকার নাই বাবা—তোমার দেখ্‌ছি বেড়িয়ে বেড়িয়ে পা ধরে' গেছে দেখ্‌ছি।" রতন বলিল, "আমি যখন দেবো ব'লেছি, তখন দিচ্ছি।" "তবে আর গৌরচন্দ্রিকা কেন বাবা ?" 'টাকা নেবার আগে তোমায় একটা কাজ ক'র্ত্তে হ'বে।" "আবার গৌরচন্দ্রিকা ? কাজটাই বলে' ফেলনা বাবা, আমি করে ফেলি।"

"একখানা কাগজে—"

কিষণলাল বাধা দিয়া বলিল, "লিখে দিতে হ'বে যে তোমাদের উপর আমার দাবী দাওয়া আর কিছু রহিল না। এই ত বস্।"

(ক্রমশঃ)

PRINTED BY S. C. PALIT, AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS, 67-9 BALARAM DE STREET, & PUBLISHED BY S. C. PALIT FROM 73 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

৭ম কুম্ভ] Reg. No. C. 691.

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩] [June 1916.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত বি, এল্‌,-সম্পাদিত।

কার্য্যালয়—৭৩ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

সূচী।

—:*:—

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
প্রেম-দর্শন	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন	...	৪১
কাব্যির উপদ্রব	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	...	৪২
আলো ও ছায়া	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক বিএ, বি এল্,	...	৪৫
ফাল্গুনী-দর্শনে	শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়	...	৪৭
ঋণ-পরিশোধ	শ্রীবাসুচরণ দে	...	৪৯
বাঙ্গালার কবি	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	...	৫১
পুস্তক-পরিচয়	... ...	...	৫৩
রবীন্দ্রনাথ	শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম্ এ, বি, এল্,	...	৫৭
রেণুর বর	জনৈক মহিলা	...	৭১
সাময়িক সাহিত্য	... ...	...	৭২
গান	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	...	৮০

অর্ঘ্যের নিয়মাবলী।

১। অর্ঘ্যের মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹ আনা। নমুনার আবশ্যক হইলে ৵৹ ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। প্রতিমাসের মধ্যভাগে অর্ঘ্য বাহির হয়। কোন মাসের অর্ঘ্য না পাইলে পরের মাসে ৭ তারিখের ভিতর জানাইতে হইবে। তার পর আমা আর দায়ী হইব না।

৩। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। আমরা ভাল প্রবন্ধাদি পাইলে বাহির করি।

৪। চিঠি পত্রাদি ও টাকা পয়সা সব "কার্য্যাধ্যক্ষ" অর্ঘ্য, ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। নূতন গ্রাহক 'নূতন' কথাটা লিখিবেন।

৫। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাইলে বা প্রবন্ধাদি ফেরৎ হইলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের নিয়ম এক মাসের জন্ত সাধারণ একপৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা, ও সিকি পৃষ্ঠা দুই টাকা। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। মলাটের বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিলে জানিতে পারিবেন। বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—অর্ঘ্য।

৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ঘ্য

৭ম বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।	২য় সংখ্যা

প্রেম-দর্শন।

(সেলীর "Love's Philosophy" অবলম্বনে লিখিত।)

(শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র সেন।)

উথলিয়া প্রস্রবণ
মিশিছে তটিনী সনে,
সাগর সঙ্গমে নদী
বহে কল, কল তানে।
আশার মধুর আশে,
স্বরগ মারুত কিবা,
সতত অনিল সনে
মিশিছে আপনা সবা।
একাকী সামগ্রী কিছু
নাহিক ব্রহ্মাণ্ডে কোথা,
একটী অপর সনে,
এইরে স্বরগ প্রথা।
তবু কেন নাহি, হায়; তোমারি সনে ?
চুমিছে হিমাদ্রি হের
সমুন্নত নীলাকাশ,
ধাইছে তরঙ্গমালা
একটী অপর পাশ।

সহোদরা কুলবালা
হবে না মার্জ্জনা সেথা,
ঘৃণিলে কভুরে তার
সোদর কুসুম ভ্রাতা।
অরুণ মরীচিমালা
আলিঙ্গিছে বসুন্ধরা,
সাগরে চুমিছে আর
বিধুর শুধাংশু ধারা,
কিবা অর্থ হয় বল এ সব চুম্বনে ?
তুমি যদি নাহি চুম আমারে এক্ষণে।

'কাব্যি'র উপদ্রব।

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

লোকে জানিত, চেষ্টা করিয়া কবি হওয়া যায় না ;—কবি জন্মায়। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে এ মত এখন চলে না। আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রায় পনেরো আনা কবি চেষ্টা করিয়া 'কবি' হইয়াছেন। গেটে বলিতেন,—"modern poets put a great deal of water in their ink"—এ উক্তি এদেশের কবিদের পক্ষে এখন বিশেষ রকম খাটে বাঙ্গালার ছোক্‌রা কবিবরেরা কালিতে কেবল জল মিশাইয়াই ক্ষান্ত নহেন।—তাঁহাদের আরও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। স্রেফ্ জলকেই কালি বলিয়া চালাইবার তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন।

এখনকার কবিতা শুধু কবিত্বহীন কবিতা নহে,—অর্থহীন কবিতা। 'এ উচ্ছ্বাস—না কাব্য—না কবিতা। কেবল কাব্যি। না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।'

এ কাব্যির উৎপাত দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। মাসিক পত্র খুলিলেই ইহার অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। সত্য বলিতে গেলে বলা উচিত যে, তিনটী কারণে এই অন্যায় ব্যাপার বাড়িয়া চলিতেছে। প্রথম কারণ,—'কাব্যি' লিখিতে হইলে মাথার বা হৃদয়ের সাহায্য দরকার করে না।

দরকার করে শুধু—কালি, কলম ও কাগজের সাহায্য। কাজেই যাহাদের কিছুমাত্র সম্বল নাই, তাহারা এই পথে ছুটিয়া আসিতেছে। ছাপার অক্ষরে নাম বাহির করিবার এমন রাজ-রাস্তা দ্বিতীয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—সম্পাদকেদের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেও মাসিকের স্থান পূরণের জন্য এ আবর্জ্জনাকে তাঁহাদের কাগজে সাদরে স্থান দিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রশ্রয় না পাইলে অনেক কবিবরই কবি-জীবন শেষ করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বাঙ্গালার একমাত্র সম্পাদক সমাজপতি ছাড়া এ কাজে আর কাহারও সাহস দেখিতে পাই না। তৃতীয় কারণ—পাঠক। বাঙ্গালার পাঠকের মত নিরীহ জাতি বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। সকল রকম বেয়াদবীই ইঁহারা নির্বিঘ্নে সহ্য করিয়া থাকেন। মাসিকের মারফতে যদি কেহ ফ্রেঞ্চ কার্ডের আমদানী করেন, তথাপি ইঁহারা 'না' বলিতে জানেন না। আসল কথা, দায়িত্বজ্ঞান জিনিষটা আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। যিনি লেখেন, তাঁহার ত একেবারেই নাই। আর যিনি ছাপেন, যিনি পড়েন, তাঁহাদেরও নাই। ফলে সাহিত্য-সেবা সাধনার বস্তু—আরাধনার বস্তু না হইয়া দোকানদারীর জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কবিবরেরা যা' খুসী তাই লেখেন, অথচ তাহাতে গভীর ভাবের দাবী করিতে ছাড়েন না। নিজের অক্ষমতাকে ঢাকিবার জন্য ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের কথাটাকে কুড়াইয়া লইয়া বলিয়া থাকেন,—"ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।"

গন্ধই বটে! 'স্মেলিংসল্টের' গন্ধ ইহার গন্ধের নিকট হারি মানে! 'স্মেলিংসল্ট' মাথা ধরা ছাড়ায়, আর কাব্যি'র গন্ধ মাথা ধরা জোর করিয়া আনায়!

আর এক বিড়ম্বনার কথা বলি! এই 'কাব্যির' লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ আবার নিজেকে 'সেলী' বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'সেলী' ত চেষ্টা করিয়া 'সেলী' হন নাই। তাঁহার হৃদয় কুজ্ঝটিকাময় ছিল। তাই তাঁহার কাব্যেও সেই কুজ্ঝটিকা দেখিতে পাই। আর তোমরা সেই কুজ্ঝটিকার মর্ম্ম না বুঝিয়া অনুচিকীর্ষাবশে কেবল ভাবহীন ঝঙ্কার করিতেছ। সে আসল, তোমারা নকল। সে সোনা, তোমরা রাং মাত্র।

এই 'কাব্যি'র জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমাদের কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। সে সময়ে অবশ্য এখনকার অনেক 'কবিবর'ই নেহাৎ নাবালক ছিলেন,—অনেকেই হয়ত তখনও ধরাপৃষ্ঠে দেখা দেন নাই। সুতরাং সে উপদেশ বাসি হইলেও এখন অনেকের

নিকট নূতন বলিয়া মনে হইবে—মিষ্ট লাগিবে। আমরা সে উপদেশের সারাংশটুকু পাঠকবর্গকে এখানে উপহার দিতেছি।

"নদীর ধারে কাসাড় বনে তোমাদের জ্যোৎস্না গা ঢালিয়া দিয়া ঘুমায়, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘোলা ঘোলা কবিত্বও ঘুমাইতে থাকে। এ পোড়া ঘুম কি আর ভাঙ্গিবে না? দেখিয়াছি, চাঁদনি চক্ চক্ করিতে থাকে, নদী ঝক্ মক্ করিতে থাকে—জ্যোৎস্না জাগিয়া উঠে। কিন্তু তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে না কেন? ঘুম ভাঙ্গিলেও অহিফেন-সেবীর মত ওরূপ অনন্ত ঝিমুনিতে ঝিমাইতে থাক কেন?—একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাও, ছায়ার মায়া কাটাইয়া উঠ—দেখ, চারিদিকেই আশা, চারিদিকেই ভরসা; সৌন্দর্য্য ফুটিতেছে, উৎসাহ ছুটিতেছে, রূপরাশি ফুটিয়া পড়িতেছে; আনন্দের উৎস উঠিতেছে। উঠ; চক্ষু মেল; দেখ—আর তোমাদের সামর্থ্য আছে, দশজনকে এই সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র দেখাইয়া জীবন সার্থক কর।"

"কবিতা আশাময়ী, কবিতা কায়াময়ী; কবিতা আলোকময়ী, কবিতা প্রভাময়ী; কবিতা উচ্ছ্বাসময়ী; কবিতা আনন্দময়ী; কবিতা করুণাময়ী। কবিতা চিত্রময়ী; কবিতা বৈচিত্রময়ী; কবিতা সৌন্দর্য্যময়ী। কবিতায় আকৃতির বৈচিত্র, প্রকৃতির বৈচিত্র; বর্ণের বৈচিত্র; স্বরের বৈচিত্র; তানের বৈচিত্র; নানারূপ বৈচিত্র আছে।"

"কেবল সে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন কোথা-যেন যেন-যেন করিলে কবিতা হয় না।

সে-যেন কোথায় হায়! কি-যেন বলেছে,—
যেন-যেন তার স্মৃতি, অন্তরে আমার
জ্বলেও না, নিভেও না; শুধুই সে-যেন,
নিরাশ হতাশ করে, উদাসিয়া মন
—বিহ্বল, বিভোর।—যেন তামসে আবৃত।

এমন করিয়া কেবলই যেন যেন করিলে, ছায়া ছায়া আঁকিলে, আর হতাশ, হুতাশ, উদাস, আকাশ—বলিলেই কেবল কবিতা হয়;—আর কিছুতে হয় না, এমন নহে। কবিতার অস্থি আছে, মজ্জা আছে, রক্ত আছে; মাংস আছে; কবিতা কেবলই ছায়াময়ী কায়ার ব্রাস্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে।'

সেলী, সেলী, সেলী—কেবল সেলীর দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কন, কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিত্যক্ত অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পত্তি

নষ্ট করিবে? বায়রণের ছায়া সেলী। সেলীর ছায়া হইবে? একে ছায়ার ছায়া—তাহাতে বিদেশের ছায়া এদেশে লাগিবে কেন?" কিন্তু ছায়া লইয়াই এদেশে কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যেখানে প্রাণ, সেখানে কাহারও নজর নাই।

সর্ব্বত্র ভাবের ঘরে চুরি। সত্য কথা কে বুঝিবে?

আলো ও ছায়া

(লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক বিএ, বি, এল্)

এই পৃথিবী জুড়ে অনন্ত কাল ধরে এক আলো ছায়ার খেলা চলেছে। যেখানে আলো ছায়া দুই নেই, এমন দেশ জগতে নেই। মেঘে ও রৌদ্রে, দিনে ও রাত্রে, সুখে ও দুঃখে, ভালোতে ও মন্দতে, পাপে ও পুণ্যে, হাসিতে ও অশ্রুতে, কবিতায় ও পদ্যে, পুরুষে ও রমণীতে এই আলো ছায়ারই সমাবেশ।

আলো ও ছায়া পরস্পরের বিপরীত। আলো ছায়াকে স্পর্শ কর্‌তে চায় না, ছায়া আলোর সহ থেকে দূরে থাকতে চায়, অথচ সর্ব্বত্রই দুজনে দুজনার হাত ধরে চলেছে। যাদের প্রাণে এত বিরোধ তাদের বাইরে এত মেশামিশি, এত গলাগলি কেন? দুজনার কেউ ত কারো অভাবে থাক্‌তে পারে না, অথচ দুজনার আংশিক অভাব নিয়েই দুজনের অস্তিত্ব। দুজনের প্রকৃতি এমনি পরস্পর সাপেক্ষ যে এদের একজনকে বুঝ্‌তে হলে আর একজনকেও বোঝা চাই, অথচ এরা দুজনে দুজনাকে বুঝতে চায় না কেন? এরা এক অদ্ভুত দম্পতি। এদের প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, বর্ণও সেইরূপ, সুতরাং মনের মিল হবে কি করে? তবে দুজনার মধ্যে বন্ধনটা ছিন্ন করবার শক্তি কারো নেই।' এমনি শক্ত গেরোতে দুজনের আঁচলে আঁচলে বাঁধা যে আলেক-জাণ্ডারের তরবারিতেও তা ছিন্ন হবে না। অগত্যা ডি, এল রায়ের বুড়ো-বুড়ীর মত দুজনেই একসঙ্গে ঘরকন্না চালাচ্ছে, বিশেষতঃ যখন ধুস্তোর বলে পালাবারও জো নেই। তাই বাইরে থাকে গলাগলি, লোক লজ্জার খাতিরে কিন্তু সুযোগ পেলেই হয় ঠেলাঠেলি, স্বভাবের গুণে।

এদের দুজনই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারো কাছে হার মানে না; দুজনেই মনে করে আমি ওর চেয়ে বড়। একজনের শক্তি যদি প্রবলতর হতো, তা হলে অপরে তার অনুগত হতে পারতো কিন্তু এক্ষেত্রে তা অসম্ভব।

আলো অবশ্যি অনেক সময় আদর করে ছায়ার গায়ে কর বুলিয়ে দেয়, আপনার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আপনার গৌরবে তার বুকের কালিমাটুকু মুছে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু ছায়া উপরে উপরে আলোর ভাণ নিলেও অন্তরের ভিতর আলোকে নিতে পারে না। আলো নরম হলে ছায়া অবশ্য একটু নরম হয় কিন্তু আলো প্রখর হলেই ছায়াও প্রখর হয়ে দাঁড়ায়। যেখানেই আলো ছায়া সেখানেই এই বিশেষত্ব।

বল্‌তে হবে ছায়ারই বেশী দোষ; কিন্তু তার কারণ আছে। তার নিজস্ব বলে কোন অস্তিত্ব নেই; তার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যটুকু নির্ভর করে কেবল অহঙ্কারের উপর। সে নিজে কিছু দিতেও জানে না, নিতেও জানে না। সে মূর্খ অবোধ পশুর মত গর্ব্ব-শিখরের উপর ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মিথ্যে অভিমান করে আলোর সঙ্গে মিলিত হবার সম্ভাবনাটুকুর উপর লাথি ছুড়ছে।

তবে ছায়ার মত অনুগত কথাটি এল কি করে? ছায়া কায়ার অনুগত আলোর নয়। কায়া ঠিক্ আলো ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বলেই ছায়ার এতদূর স্পর্দ্ধা। কিন্তু ছায়া বোঝে না যে কায়া তার কেউ নয়; আলো মরলে তাকেও সহমরণে যেতে হবে। কায়া যে দিকে ছোটে ছায়াও সেই দিকে ছোটে, বাধ্য হয়ে আলোকেও ছায়ার পিছনে পিছনে ছুটতে হয়; সেটা অনুরাগের জন্য নয় কর্ত্তব্যের খাতিরে।

কিন্তু আমরা কায়াকে দেখতে চাই না আমরা দেখতে চাই কেবল আলো ও ছায়াকে। তাদের সম্পর্কটুকু নিয়েই জগতের বৈচিত্র, রোমান্সের সৃষ্টি। আলো ও ছায়া পরস্পরের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে তা দেখলে তাদের মিলন ও বিরোধের অপূর্ব্ব মিলনটি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে। কোথাও তার সংসারের রঙ্গ মঞ্চে দুই নর্ত্তক নর্ত্তকীর মত হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিকসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে; কোথাও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরের মত অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করে চলেছে—প্রতি অস্ত্রাঘাতে হৃদয় শেষ ফলাফলের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌ছে; কোথাও কৃত্রিম প্রণয়ি-

যুগলের মত বিদায়-বেদনার অভিনয় করে চলেছে—প্রতি বিচ্ছেদ সূচনায় হৃদয় কলাবিদ্যায় চমৎকারিত্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ছে।

কতদিন আলো ছায়ার এই অভিনয়ের মিলন এই বাস্তবের সংঘর্ষ থাকবে? জানি না সে কোন্ দিন যে দিন উন্নতির চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৃথিবী আপনার পরিপূর্ণতায় স্থির হবে—আপনার আদর্শের মধ্যে চিরন্তন স্থিতির সন্ধান পাবে—যে দিন আলো ছায়ার মিলন দ্বন্দ্বের অত্যন্ত নিবৃত্তি হবে। হয়ত সে দিন দুয়েরই নির্ব্বাণ হবে, না হয় একজন আপনার অনন্তসত্বাকে প্রতিপন্ন করবে আর অপরটি নিঃসত্ব বলে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হবে। অথবা হয়ত সে দিন দুয়ের সমন্বয়ে এমন এক নূতন সত্বার উদ্ভব হবে যার ভিতর মিলন ও বিরোধের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না।

"ফাল্গুনী"-দর্শনে।

(১)

(লেখক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়)

প্রভু 'কী' দেখালে!
বিশ্ববাণীর 'কী' তানে গো
প্রাণ মনো সব ভুলালে!
আকুল 'হীয়ায়' ব্যাকুল যেমন
বিরহিনীর বুকের বেদন—
অভিসারে দোদুল গমন
মুলাঙ্গীর যেমন ধারা;
পঞ্চ তুচ্ছ পথিক টাকা
জীবন-পথের ধারেই রাখা—
বোবার মতন চেয়ে থাকা—
মোদের বঁধু 'কী' শুনালে!

(২)

বেদের কথা বেদেয় বুঝুক,
ব্যাখ্যা যে তার হয়!

ভগবানের রাজ্যে 'কী' সব
নিয়ম মেনে রয় !
মানুষ 'কী' গো ঘড়ীর কাঁটা
বুদ্ধি 'কী' তার মুড়ো ঝাঁটা,
মানব-জ্ঞান যে লাউ এর ডাঁটা
লক লকিয়ে যায়,
উধাও হয়ে পাখীর 'মতো'
গগণ ঘিরে ধায় !
কোন আকাশের কোন কোনেতে,
কোন পাঁদাড়ের কোন 'বোনেতে,'
আধেক-গোপন 'কী' ভাব থানি
হারা বিশ্বময়,
কবির বেগে 'পোড়লো' ধরা
বঙ্গ রঙ্গময় ।

(৩)

বাউল ওগো বাউল !
কে বলে তোমায় অন্ধ !
এ'কী' চতুরালি, কিম্বা দেয় গালি
পরাণে লেগেছে সন্দ ।
এত আঁখি যার তীক্ষ্ণ প্রখর,
বিধাতা যাহার জুড়ি' অন্তর
ক্ষণে ক্ষণে দেন প্রেরণার ঠেলা
যেন উদ্গার ধ্বনি,
তাহারে আজ কহিলে প্রভু গো
বাধিবে বিষম দ্বন্দ্ব !
আমি যে তোমার জীবনে মরণে
জনমে জনমে ও রাঙ্গা চরণে
অতীব ভক্ত-অন্ধ !!
প্রভো কথায় কর না সন্দ !!

———

ঋণ-পরিশোধ।

(লেখক—শ্রীবাসুচরণ দে বি, এল।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"আরও আছে। তুমি এ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে যা' পেয়েছ সেটাও লেখা চাই। মোটের উপর যা পেয়েছ।—আন্দাজ।"

"বাবা, অত লেখাপড়া যদি জান্‌ব, তা' হ'লে আর এ চাকরি কর্ব্ব কেন?

"বেশ, আমি লিখে এনেছি, তুমি সই করে' দাও।" এই বলিয়া রতনচাঁদ একখানা কাগজ বাহির করিয়া দিল। কিষণলাল তাহা পড়িয়া বলিল, "বাঃ, রতনচাঁদ তুমি যে বেশ লেখাপড়া জান দেখ্‌ছি, সরকারে চাকরী কল্লে তুমি এতদিন একটা বড় নাজির টাজির হ'য়ে যেতে।" "আচ্ছা, আমি যেন এতে সই কর্ল্লুম, কিন্তু তোমার এতে লাভ কি? তুমি ত আর এ কাগজ বা'র কর্ত্তে পার্ব্বে না।" "জানি, এতে বিশেষ কোন কাজ হবে না, তবু আমার খেয়াল।" "বেশ বাবা, তোমার খেয়ালই বজায় থাক। কি দিয়ে সই কর্ব্বো?" "আচ্ছা, আমি দিচ্ছি।" এই বলিয়া রতন একটা বৃক্ষের পার্শ্ব হইতে লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া দিল। কিষণলাল তাড়াতাড়ি কাগজ খানায় সহি করিয়া দিয়া বলিল, "এইবার আমার টাকা আমায় দাও।" রতন টাকার তোড়াটা কিষণলালকে প্রদান করিল, কিষণলাল দেখিয়া লইয়া তাহা পকেটে পুরিল। পকেটে রাখিয়াই সে ক্ষিপ্রহস্তে রতনের হাত হইতে কাগজ খানা কাড়িয়া লইল। রতন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিষণলাল হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কি জানি বাবা, বাঁধা বাঁধির দরকার কি! এখন মাস খানেক তোমার ছুটী।" এই বলিয়া সে রতনের দিকে পিছন ফিরিল। রতন বীরহস্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা তরবারি বাহির করিল। সূর্য্যালোকে অসিফলক ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। রতন গম্ভীর কণ্ঠে বলিল "কিষনলাল, ফেরো।" রতনের আহ্বানে সে ফিরিল। রতন বলিল "আমি তোমাকে পশ্চাৎ হইতেই হত্যা করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি কাপুরুষ নই, আমি ক্ষত্রিয়। যদি ভাল চাও ত এখনই ফিরিয়ে দাও।" কিষণলাল ভ্রূকুটি করিয়া কহিল "আমার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কর্ত্তে চাও নাকি? তোমার সাহসকে

বলিহারি !" রতনচাঁদ বলিল "কিষণলাল আজ তোমার ঋণ পরিশোধ কর্ব্ব প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি। হয় টাকা ফিরিয়ে দিয়ে শপথ কর, যে আর কখনও আমাদের সংস্পর্শে আস্‌বে না, আর তা' না হইলে ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হয়।" কিষণলাল বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিল, "বেণের আবার যুদ্ধ কর্ব্বার সাধ !" তারপর সে মোতিয়ার উদ্দেশে কতকগুলা অশ্রাব্য কটূক্তি করিল। রতনের শিরায় শিরায় রক্ত ফুটিয়া উঠিল। সিংহ-বিক্রমে সে কিষণলালকে আক্রমণ করিল। কিষণলাল একেবারে এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না বলিয়াই হউক, বা নেশার ঝোঁকে ছিল বলিয়াই হউক, এ আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। প্রতিরোধ সত্ত্বেও রতনচাঁদের অসি তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কিষণলালের প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

এই ঘটনার পর তিনদিন অতীত হইয়াছে, রতনও মোতিয়ার নিকট এই এক একটা দিন স্বপনের মতন এক একটা অংশের ন্যায় কাটিয়াছে। রতন সকলের নিকট প্রচার করিয়া দিয়াছে যে আগ্রাসহর দেখিয়া আসা অবধি তাহার আর দিল্লিতে দোকান করিবার ইচ্ছা নাই। সে ভাবিয়া দেখিয়াছে আগ্রায় কারবার করিলে, সে অল্প দিনেই বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবে এবং সেই জন্য সে এখানকার দোকান আগ্রায় উঠাইয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছে।

দিল্লি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহারা দোকানের জিনিস পত্র গুছাইতেছে, এই সময়ে তাহাদের দোকানের সম্মুখে দুইজন সৈনিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন একটা আপেল কাটিতে ছিল। অপর ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঃ, তোমার ছুরিখানি বেশত, এখানা কোথায় পেলে ভাই।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "এখানা কিষণলালের ছুরি। একদিন সে যখন ভয়ানক মাতাল হ'য়ে প'ড়েছিল, আমি তখন তা'র পকেট থেকে বা'র ক'রে নি। সেই থেকে আমার কাছে আছে।"

"তার আর ছুরীর কথা খেয়াল ছিল না। আচ্ছা, আজ কাল সে এত পয়সা পেত কোথায় ?"

"শোন নি, সে যে তা'র মাসীর না কা'র বিষয় পেয়েছিল।" "আচ্ছা পাঠানেরা তার উপর অত হাড়ে হাড়ে চটা ছিল কেন জান ?" "না, তা জানি না ভাই। তবে আমার বোধ হয় পাঠানেরাই তা'কে খুন ক'রেছে।" "সকলেই

সে কথা বলে।" কথা কহিতে কহিতে সৈনিকদ্বয় চলিয়া গেল। রতন ও মোতিয়া পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করিল।

পরদিবস রতনচাঁদ খোসবোওয়ালা বা তাহার স্ত্রী মোতিয়াকে আর কেহ দিল্লীতে দেখিতে পাইল না।

বাঙ্গালার কবি।

(লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।)

আমাদের দেশে আজকাল একটা কথা শুনা যাইতেছে যে এখনকার বাঙ্গালী জীবনের কোমলতা বা পৌরষের অভাবের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অনেকটা দায়ী, অর্থাৎ বঙ্কিম বাবু ও রবি বাবু যদি ইচ্ছা করিতেন বাঙ্গালীকে মানুষ করিতে পারিতেন; তাহারা যদি কেবল রমণীর মাধুর্য্য ও প্রেমের ওড়ন-পাড়ন না করিয়া বীরত্ব ব্যঞ্জক সাহিত্য রচনা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের বীররস-শ্রাবী কাব্য আমাদের জাতীর জীবনকে পরিবর্ত্তন করিয়া হয়ত শিখ বা মহারাঠার মত করিত।

একথাও শুনা যায় যে চৈতন্যদেব যদি ইচ্ছা করিতেন আমাদের দেশে প্রেমের পরিবর্ত্তে বীর্য্যের বন্যা বহাইতে পারিতেন ও আমরা একটি জগৎপূজ্য বীরজাতি হইতে পারিতাম। কথাটী ভাবিয়া দেখা উচিত। সত্যসত্যই কি চৈতন্যদেবের জন্য আমরা এই অবস্থায় পঁহুছিয়াছি? সত্যই কি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের জন্য আমরা রমণীমুখ চন্দ্রমা সার করিয়াছি?

আমাদের দেশে প্রতাপাদিত্য, ধর্ম্মপালও ইত্যাদি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তখনকার দুই চার জন দিগ্বিজয়ী তাহাদের তুল্য শূরবীর ইতিহাসের অজ্ঞাত পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা যে কোন দেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারিতেন। কিন্তু বাঙ্গালায় কি হইল? তাঁহাদের বীরত্ব তাঁহাদের সহিত লোপ পাইল। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় দেশ তাহাতে সাড়া দিল না। এখানে মাইকেল ও হেমবাবু অন্য সুরে গাহিলেন। সে সুর তাহাদের সহিত রুদ্ধ হইল। হেমবাবুর জাতীয় গান যদিও জাতির মর্ম্মে পঁহুছিয়া ছিল কিন্তু বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য তাহার 'হতাশের আক্ষেপ' যেন

দেশের নাড়ীর গান। মেঘনাদ বধের সহিত ব্রজাঙ্গনার করুণ সুর কাণে আসে এ সুর যেন দেশের মর্ম্মের সুর ইহা যাইবার নহে। দেশের ধাতে যেন বীর-রস খাপ খায় না। রণবাদ্য এদেশে মানায় না, সাহানা যেন অস্থি মজ্জ্যাগত।

শ্যাম ও ব্রজাঙ্গণা যেন বাঙ্গালারই দেবতা। বীরবর রামচন্দ্র এখানে আসন পাইলেন না, কৃত্তিবাস তাহাকে যে চিত্রে আঁকিয়াছেন তাহাতে বীররস ফুটিয়া উঠে নাই। রাধিকা বাঙ্গালীর মানস কন্যা।

ইহাদের জন্য দায়ী কে? আমার ত বোধ হয় দেশের জল হাওয়া। পৃথিবীতে বাঙ্গালা দেশের মত আবহাওয়ার যুক্ত কোন দেশই বীরপ্রসূ নহে। বঙ্গ, গুর্জ্জর ও ব্রহ্ম প্রভৃতি ভারতবর্ষে, চীনের দক্ষিণ প্রদেশ, দক্ষিণ পারস্য, মিশর ও আমেরিকার মেক্সিকো দেশ প্রায় বাঙ্গালার মত এক মণ্ডলে অবস্থিত। অবস্থাও প্রায় একই। প্রকৃতি দেবী যেখানে সচ্ছন্দে পর্য্যাপ্তরূপে করুণা বৃষ্টি করেন, যথায় প্রকৃতি-লব্ধ ফল শস্য প্রায় অনায়াসে জন্মে, যথায় দীঘি ভরা মাছ গোলা ভরা ধান, আম কাঁঠাল বাগান, তথায় লোকের 'ভাঙ্গা বাঁশী ও রঙ্গা বউ' সম্বল।

পূর্ব্বে, যখন জীবনের অভাব অল্পছিল, মানব শাক-অন্নেই সন্তুষ্ট থাকিয়া মস্তিষ্ক চালনা করিত। অন্যানা দেশের লোকেরা দেহ রক্ষায় ব্যাস্ত থাকিত বলিয়া মানসিক শক্তি ব্যবহারে সময় পাইত না, এখন এই সব দেশ-প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইয়া ছিল। তখন এই বঙ্গ, ইরান গুজ্জর মিশর সকল বলে বলী ছিল, কারণ তাহার-দেহ ধারণে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য বৃত্তির অনুশীল করিবার সুবিধা পাইয়াছিল।

কিন্তু প্রকৃতির স্নেহে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার যে সব সন্তান সদা মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, কঠিন পাষাণে, নির্ম্মম তুষার, বিদগ্ধ মরু, দুর্গম সাগরকে জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া দিল তাহারা অন্তরে এক শক্তিলাভ করিয়াছিল; যাহা পরবর্ত্তী যুগে জীবন যুদ্ধে তাহাদের বিজয়ী করিয়াছে। যেমন আদুরে ছেলে বাপমার জীবন দশায় সুখে সচ্ছন্দে কাটাইলেও, যে পুত্র প্রথম হইতে আত্মনির্ভর করিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার কাছে হটিতে হয়, হইলেই বা ত্যজ্য পুত্র। আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সেই আদুরে ছেলের অবস্থা হইয়াছে, প্রকৃতির কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমি পৃথিবীর অন মণ্ডলি সহিত জীবন যুদ্ধে হারিতে হইতেছে। বাঙ্গালী জীবন, বাঙ্গলার ফলের মত মধুর অথচ ক্ষণস্থায়ী, বাঙ্গালাবায়ুর মত মৃদু অথচ অবসাদ বাহী বাঙ্গালা, জলের মত স্নিগ্ধ অথচ পঙ্কিলর; বাঙ্গালার মাটির মত কোমল অথচ স্বাস্থ্যহীন। সুতরাং বাঙ্গলার গান যে কেবল মধুর কান্ত পদাবলী হইবে

হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বাঙ্গলার বঙ্কিম বাবু বা রবি বাবু যদি কেবল বীররস লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিভা বলে কিছুদিন বাঙ্গালীকে জাগাইতেন বটে, কিন্তু আবার বাঙ্গালী নয়ন মুদ্রিত করিত। হেম বাবুর অমৃতনিস্যন্দীভেরী বাঙ্গালী শুনিল কি ? প্রাচীর প্রবুদ্ধ জাপানকে দেখিয়া বাঙ্গালী আধজাগরুক নয়নে স্বদেশী প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু কয়দিন ?

বাঙ্গালীর দেবতা, রাধাকৃষ্ণ। বাঙ্গালীর সাধক প্রেমঅবতার চৈতন্যদেব, বাঙ্গালীর কবি বৈষ্ণবকবি, বাঙ্গালার ফল রসাল, সুতরাং বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবু বাঙ্গালার যথার্থ কবি।

পুস্তক-পরিচয়।

শ্রীযুক্তবাবু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিত "দরিদ্রের ক্রন্দন" পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। এই "দারিদ্র্য পীড়িত" দেশে এই প্রকার পুস্তকের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এদেশের লোক জন্মান্ধ। চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইয়া দিলে তাহারা কোন বিষয়ে দেখিতে চায় না। আর এক কথা পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ইহারা 'দরিদ্রতাকে' ঘৃণ্য বলিয়া মনে করে না বরং অনেক সময় 'দরিদ্রতাকে' বরণ করিয়া লয়। ব্যক্তি হিসাবে অনিষ্ঠ না হইতে পারে কিন্তু ইহাতে সামাজিক কল্যাণ নাই। শিক্ষা বল, ধর্ম্ম বল, নৈতিক বল, জীবন বল, সব অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। 'অর্থম অনর্থম ভাবয়নিত্যম' দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সত্য হইলে সত্য হইতে পারিত কিন্তু আজ বিপুল জীবন সংগ্রষে অর্থই বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই 'দরিদ্রের ক্রন্দন' যদি ধনীদিগের কর্ণে পৌঁছায় তাহা হইলে লেখকের শ্রম সার্থক হইবে। এই দরিদ্রের ক্রন্দন পাঠ করিয়া যদি একজনও দেশবাসীর প্রাণ দারিদ্র্যনিপীড়িত একজন ভ্রাতার জন্য কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে লেখকের সব পরিশ্রম সার্থক হইবে। এই দরিদ্রের ক্রন্দন যদি একজন দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের দারিদ্র্য-মোচনের ব্যাপার নিযুক্ত করাইতে পারে তাহা হইলে একদিন না একদিন রাধাকমল বাবুর শ্রম ভাগীরথীর ন্যায় শত-ধারায় প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে দারিদ্র্যরাক্ষসীকে তাড়াইয়া দিয়া

হাস্য কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিবে। আজ আমাদের দেশে 'দারিদ্র্যের' চেয়ে বাস্তব আর কি আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চোপাধিরী হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত এক ভাবনা। অন্য কিছুর ভাবনা নয় একমুষ্টি অন্নের ভাবনা। আজ অন্নপূর্ণার দেশে অন্নের অভাব। কাহার দোষ? তোমরা বলিবে 'কপালের' আমি বলিব'—তোমাদের' অথবা আরও ভাল 'আমাদের'। রাধাকমল বাবু ঠিক বলিয়াছেন যদি আমরা মোটা কাপড় দিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে অক্ষম হই তখন আমরা সাহিত্য ও দর্শন লইয়া কি করিব।

'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থান' সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন সে কথাগুলির মূল্য অত্যন্ত অধিক। সকল দেশে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' সমাজের কেন্দ্রস্থান। 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর উন্নতির সহিত সমাজের উন্নতি। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লোকসংখ্যার সর্ব্বাধিক। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গালার ধনিসম্প্রদায় বলিয়া কোন বিশেষ সম্প্রদায় নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হইতে ধনি-সম্প্রদায় গঠিত হয়। "মধ্যবিত্তদিগের ধনবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। ধনীদের বিলাসিতা আছে কিন্তু মধ্যবিত্তদিগের স্বোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হয় না। উপরন্তু মধ্যবিত্তদিগের ভাবুকতা আছে, তাহারা সমগ্র সমাজের অভাব বুঝিতে অধিক সক্ষম, সুতরাং আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য তাহারা অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে পারে।"

"কলিকাতায় ব্যবসায় জগতে মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে যাহারা স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র কারখানা গুলি পরিচালনা করিতেছে, তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ—৬১ কলু—২০
কায়স্থ—৬৫ বৈদ্য—১০
তিলী—২৮ চাষীকৈবর্ত্ত—১২
সদ্গোপ—২৮ সুবর্ণবণিক—১০

মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে ৯টী এবং সেখদিগের মধ্যে ১১টী কারখানার সত্ত্বাধিকারী বর্ত্তমান। কলিকাতায় যে ভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণী কারখানার প্রভৃতি সত্ত্বাধিকারী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, যেরূপ দেশের সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়।"

রাধাকমলবাবু মধ্যবিত্তদিগের দ্বারায় যাহাতে কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র কারখানা চালিত হয় সেই বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যে যেমন সমবায় পদ্ধতি প্রচলন করা হইয়াছে, রাধাকমলবাবু বলেন শিল্প বিষয়ে সেই প্রকার সমবায় পদ্ধতি প্রচলন করা আবশ্যক। তাহার মতে "মধ্যবিত্তদিগকে এ প্রকার কার্য্য

করিতে হইবে। উপরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের সহায় হইবে সন্দেহ নাই।”

“গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যেখানে শিল্পীরা তাহাদের বিরল কুটীরে বসিয়া সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, সেখানে যাইয়া তাহাদিগের নিকট আশার কথা প্রচারিত করিতে হইবে।” এই নিরাশার ভিতরে থাকিয়া দেশের লোক আশার বাণী শুনিতে চায়। যদি দেশের লোক এই আশার বাণী শুনে তাহা হইলে “দেশে এমন একটা চিন্তার আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহা আমরা এখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না”। মধ্যবিত্তেরাই চিরকাল সমাজের নেতা। জীবিকার্জ্জনে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে, সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তির পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।”

পল্লীসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও পল্লীসভ্যতার পুনরুত্থান বিষয়ে রাধাকমল বাবু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী তিনি নহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে আমরা যে পাশ্চাত্য আদর্শ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি সে আদর্শ বিংশশতাব্দীর নয়। তাহা অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর। ইউরোপ এতদিন ভুল বুঝিয়াছে সেই জন্য ইউরোপে পল্লীসভ্যতার পুনরুত্থানের চেষ্টা চলিতেছে। “নূতন শিল্প সভ্যতার লক্ষণ—বিরোধ নিবারণ, সামঞ্জস্য স্থাপন। নূতন সভ্যতার ভাব ও আদর্শ synthetic” রাধাকমল বাবুর মতে “প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণ হেতু ভারতীয় সমাজে বিরোধ ও অশান্তি। আজকাল প্রাচীন আদর্শ ইউরোপে স্থানচ্যুত হইয়াছে। পল্লীর সভ্যতার পুনরুত্থানে সকলে ব্যস্ত।” ‘ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রবে’। লোকের কর্ণে দরিদ্রের ক্রন্দন’ কি পোঁছাইবে না। আমরা মনে করি ক্রন্দন পোঁছাইবে ও যে সুফল শীঘ্র ফলিবে।

প্রণয় প্রলাপ—লেখক শ্রীবিজ্ঞান চন্দ্র ঘোষ—ইংরাজী হইতে অনুদিত (একজন যে বেহালাদারের প্রণয় লিপিকা) মূল্য ১৷০ বাঁধান ১৷৷০ টাকা, গৃহস্থ পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। সুন্দর মলাট ও কাগজে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন যে “এই পুস্তকের কবিতাগুলি ইংরাজী কবি ম্যাকে লিখিত ‘Love letters of a violonist’ হইতে অনুদিত। বিদেশী ভাব স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ করা, বিশেষতঃ একভাষার পদ্য ঠিক ভাব ও সুর বজায় রাখিয়া, অন্যভাষার পদ্যে অবিকল অনুবাদ করা বড়ই কঠিন।” আমরা পদ্যগুলি যতবার পড়িলাম ততবার গ্রন্থকারের মন্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম। বিদেশী

ভাব স্বদেশী ভাষায় যতদুর ব্যক্ত করা যায় কবি তাহা করিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সব পদ্যগুলির ভাব বুঝা সুকঠিন যথা—

সাহসে সাধিব কাজ, আমার অঙ্গুলি
তোমার অলকে, ত্বরা ধাইবার আগে—
আভূমি প্রণত রমে করিতে তোমায়,
বুঝিতে পারিবে, ভয় হর্ষ ভাব, তব
প্রকুল প্রসারে; তব মৌন অনুনয়ে,
পরে ব্যথা পেয়ে, দিব উচিৎ উত্তর
তোমার প্রশ্নের, ত্রস্তে, পুরুষের মত।

কবি ও উক্ত পদ্যের ভাবটি বুঝাইবার জন্য গদ্যে একটি টীকা দিয়াছেন। তাই বলিতেছি বিজ্ঞান বাবু একটী কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি কঠিন কার্য্য হইতে যতদুর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন তাহাতে তাহার বিশিষ্ট কৃতিত্ব আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। আমরা তাহার কাছ হইতে আরও আশা করি।

কপিলের তেজ—লেখক শ্রীমান শৈলেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

যে তেজে সগরবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল নাটকে সেই কপিলের তেজের কোন লক্ষণ পাইলাম না। নাটক লেখা বড় সহজ নয়। লেখক যে এই দুরুহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন তাহাই প্রশংসার্হ। ভবিষ্যতে তাহার চেষ্টা সার্থক হইবে আমরা আশা করি।

সংগ্রামসিংহ—ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। লেখক শ্রীকিশোরীলাল বন্দোপাধ্যায়। মূল্য ।৷০ আনা। লেখক পরিশেষে লিখিয়াছেন—'যদি এই পুস্তকখানি রচনায় কোন স্থানে কোন দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমার বয়স, অল্পশিক্ষা ও প্রথম উদ্যম বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।" ইহার উপর আর কথা চলে না। এতদুর বিনয়ী গ্রন্থকারকে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে পরিণত বয়স না হইলে নাটক লেথা রূপ দুরুহ কার্য্যে তিনি যেন আর হস্তক্ষেপ না করেন। মিলটন পরিণত বয়সে লিখিতে আরম্ভ করেন। মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতা বালকে সম্ভব নয়।

মহাভারত—শ্রীহরিপদ ঘোষ—মহাভারত অমৃতভাণ্ডার। কালিসিংহ অনুদিত মহাভারত হইতে গ্রন্থকার বালকদের পাঠোপযোগী অংশগুলি বাছিয়া

এই গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। উদ্ধৃত অংশগুলি সুন্দর হইয়াছে। আজ কাল যে সব পুস্তক শিক্ষা বিভাগ হইতে মনোনীত হইতেছে অধিকাংশ পুস্তকগুলি অসার প্রবন্ধ ও নানা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। সেই সব পুস্তক-গুলির পরিবর্ত্তে এই প্রকার পুস্তক বহুল পরিমাণে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশিত হইলে হিন্দু বালকবালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে কাহার কিছু বলিবার থাকে না। ভাষার সহিত নৈতিক ও স্বদেশী আচার ব্যবহার বাল্যকালে হৃদয়ে মুদ্রিত হইলে ভবিষ্যত যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলতা হৃদয়ে স্থান পায় না।

রবীন্দ্রনাথ

(৩)

সৌন্দর্য্যের কবি

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্ এ, বি এল,)

কবির-কাজ—রবীন্দ্রনাথের মতে কবির কাজ, "আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। সৌন্দর্য্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছুই নয়—হৃদয়ের অসাড়তা, অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতা ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। অতএব কবিদিগের আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।"

ভাবুক রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-প্রেমের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব, আপাততঃ কবি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্য বিকাশে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখা যাউক। তিনি অবসাদময় ঊষার আলোকে জগতের সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা দেখিয়া লইয়াছেন। ঊষালোকে বহির্জগতের সবটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুবিধা বোধ হয় অপর কোন বাঙ্গালি কবির ভাগ্যে ঘটে নাই।

বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে যদি মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যালোক আসিয়া পড়িত তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে গীতি-কবিতার একটানা স্রোতে এতদিন বাধা পড়িত। উষালোকের কবির আসন তাহা হইলে কোন মানুষতার কবি দখল করিয়া লইত বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে তাহা হইলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরিবর্ত্তে চরিত্র সৃষ্টির উদ্যম দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠে কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ না জন্মিলেও জগতের অন্তরে ও বাহিরে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা পাঠকের হৃদয়ের সকল স্থানে জাঁকিয়া বসে। বিলাস-প্রিয় বাঙ্গালি-জগতের যেখানে যে সৌন্দর্য্য ছিল কবির প্রতিভা সে সমুদয় সংগ্রহ করিয়া আমাদের চোখে ফেলিয়াছে। উষার আলোক-আঁধার সেই সৌন্দর্য্যের চিত্রে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের হৃদয়ের যত মেঘ, যত ছায়া কবির তুলিকার সাহায্যে অসংখ্য ভাবময় খণ্ড চিত্রে নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

কবির সহযাত্রী—কবি সকল সময়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন না, জগতে যেখানে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহাই দেখান মাত্র। কবিতার ভাষায় সৌন্দর্য্যের বর্ণন করেন বলিয়া তিনি কবি। মানবেতিহাসের অন্ধতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সৌন্দর্য্যেকে ফুটাইবার জন্য কবিরা চেষ্টা করিতেছেন। মানব সমাজে জ্ঞানের আলোক এক একবার জ্বলিয়া উঠে আবার নিভিয়া যায়। যখনই জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয় আমরা তাহার সাহায্যে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করি। কবিরা আমাদের সহযাত্রী। কবিদের ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ভাসিয়া উঠে না, উঠিলেও যাহা আমরা অনুভব করি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। যাহাদের কবিত্ব আছে তাহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যাহা দেখে তাহা ছন্দোময় বাক্যে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের সময়ে বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়াছে। বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সেই কারণে তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। যে কবি নয় সে-ও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটো-ছুটি করিতেছে, যেখানে যা সুন্দর দেখিতেছে তাহার ফটো লইতেছে, ছবি আঁকিতেছে, গদ্যের ভাষায় সৌন্দর্য্য লিপিবদ্ধ করিতেছে। যে বৈজ্ঞানিক, তাহার সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, সে যন্ত্রের সাহার্য্যে জড়ের চেতনা শক্তি উপলব্ধি করিতেছে, উদ্ভিদের হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক এখনকার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের যুগে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সহযাত্রী। উদ্দেশ্য সকলেরই এক—জগতের অন্তর-বাহিরে যে চেতনা, যে অনুভূতি-শক্তি, যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া, বিশ্লেষণ

করিয়া নিজে দেখা ও অপরকে দেখান। কবি ও বৈজ্ঞানিকের যুগপৎ আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নহে। সাধনার প্রসর ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা একটী মাত্র ফল প্রসব করে নাই। সৌরজগতে একা রবির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। নবরত্নের সম্মিলনে বিক্রমাদিত্যের সভা গঠিত হইয়াছিল।

সৌন্দর্য্যের কবি—উপভোগ করিবার পিপাসা সকলেরই আছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সৌন্দর্য্য পিপাসা দূর করিয়াছেন। কাব্য পাঠ করিয়া যদি কাহার সৌন্দর্য্য স্পৃহা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করিয়া সে স্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিবেন। সৌন্দর্য্য বর্ণনায় অনন্ত বৈচিত্র্য অপর কোন বাঙ্গালি কবির কাব্যে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কত দিক হইতে কত বিভিন্নভাবে সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়াছেন! দূরে থাকিয়া সৌন্দর্য্যের লীলা-বৈচিত্র্য দেখিতে হইবে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের বিশ্লিষ্ট টুক্‌রা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, অবসর মত দেখিবার সুবিধা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যতটা আছে সেরূপ অপর কোন বাঙ্গালি কবির কাব্যে নাই। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই খণ্ড সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত আবার তেমনি ছোট ছোট কথায় কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের উপযোগী ভাষা অত্যন্ত বিস্ময়কর! ঊষালোকে দূরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায় না কিন্তু নিকটে যাহা আছে তাহা কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়াছে। ইন্দ্রের সভা, নন্দন-কানন, পারিজাত পুষ্প রবীন্দ্রনাথের তুলিকা স্বপ্নালোকে অঙ্কিত করে নাই সত্য কিন্তু মর্ত্ত্যের বর্ণনীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয় শিল্প কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ঘরের কোণে, অপরিচিত পথের ধারে, অনালোকিত গিরি-গুহায় যে এত সৌন্দর্য্য ছড়ান ছিল তাহা আমরা জানিতাম না। আলোক ও ছায়া লইয়া সৌন্দর্য্য যে অনন্ত কাল ধরিয়া খেলা করিতেছে, বর্ণের ভিতর যে ভাবরাশি সঞ্চিত আছে, সে কথা এতদিন কোন বাঙ্গালি কবি বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশালায় ভাবের চিত্র এত অধিক যে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালির, বিশেষতঃ শিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীর হৃদয়ের ভাব কবির চিত্রে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালির হৃদয়ের আলোক ও আঁধার, বিষাদ, অশান্তি, আশা, নৈরাশ্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

যাহা সত্য, যাহা বাস্তব, তাহার উপর কল্পনাকে স্থাপিত করিয়া চিত্র

অঙ্কিত করিলে সেই চিত্র সুন্দর হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালি জগতে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার সাহায্যে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। যদি তিনি বাঙ্গালির হৃদয়ের ভাব নিজে অনুভব না করিয়া ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিতেন তাহা হইলে তিনি সৌন্দর্য্যের কবি হইতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে আমরা বাঙ্গালি-হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া, ভোগীকে যোগী করিয়া যে কবি দেখায় সে সৌন্দর্য্যের কবি নহে। সৌন্দর্য্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কল্পনার উপর নহে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে কল্পিত সৌন্দর্য্যের অভাব বলিয়া তিনি যথার্থ সৌন্দর্য্যের কবি।

চিত্রময় গীতি-কাব্য—রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা পাঠ করিতে করিতে চক্ষুর সম্মুখে যে কত শত সুন্দর ছবি ভাসিয়া উঠে তাহার সংখ্যা হয় না। সারি সারি সজীব চিত্র যেন মন্ত্রবলে কোথা হইতে আসিয়া পড়ে। স্বভাবের বিচিত্র শোভা পাঠককে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে যে লইয়া যায় তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। কবির প্রতিভা আমাদিগকে কখন পৌরাণিক জগতে, কখন বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে, কখন বৌদ্ধমঠে, কখন জনতাপূর্ণ রাজধানীতে, কখন বা নদী সৈকতে অপূর্ব্ব, অদ্ভুত দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি, দেখাইতে দেখাইতে আমাদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেখানে এক নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে হৃদয়ের মধ্যে এক হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। বর্ণ, আলো, গন্ধ, গীতি, ছায়া, মেঘ, বর্ষা ক্ষণেকের তরে অপার্থিব হর্ষ-বিষাদের তরঙ্গে সুপ্ত হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। কবির হৃদয় কবিতাকারে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার কক্ষে আলো ও সঙ্গীত বর্ষণ করিতে থাকে। ছন্দের সুমিষ্ট ঝঙ্কার ভাষা ও ভাবের সরলতার সহিত মিশিয়া হৃদয়ের বহু পুরাতন তারগুলিকে মুখরিত করিতে চেষ্টা করে। আমাদের বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অপর কোন বাঙ্গালি কবি সংখ্যাতীত চিত্রময় গীতি-কবিতা রচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দে সুরের উত্থান পতন কাণের ভিতর যে সঙ্গীত ধারা বর্ষণ করে তাহা এক অনির্ব্বচনীয় শিল্প কৌশলে পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়ে সৌন্দর্য্যময় চিত্রাবলীর প্রতিবিম্ব ফেলিতে থাকে। সঙ্গীতের সাহায্যে ভাবপ্রকাশক সৌন্দর্য্য বর্ণন যে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই—মনে হয় যেন সঙ্গীতের ধ্বনি কোন এক অদৃশ্য চিত্রপট স্পর্শ করিবামাত্র হঠাৎ জমাট বাঁধিয়া গেল। চিত্র ও সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে স্বতন্ত্রভাবে নাই। কবি আমাদিগকে

একের সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করিবার অবসর দেন নাই। চিত্রলোভী যেমন সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া যায়, সঙ্গীতামোদী তেমনি বর্ণ ও আলোকে মোহিত হইয়া পড়ে। দর্শন ও শ্রবণ সুখ আমরা যুগপৎ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।

গীতি-সৌন্দর্য্য—ভাষার সাহায্যে সৌন্দর্য্য বিকাশ করা সাধারণ কবির কাজ। গদ্য রচনায় অনেক সময়ে সুন্দর চিত্র সুন্দর ভাষায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি বর্ণনায় ও ভাবহীন সজীবতার চিত্রাঙ্কণে অনেক লেখক ও কবি পরিপাটি ভাষা প্রয়োগ করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাকে যখন ভাবের অনুসরণ করিতে হয় তখন কিন্তু সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে গদ্যই হউক আর পদ্যই হউক রচনা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। বঙ্কিম-চন্দ্র সেইজন্য বৈচিত্রময় মানব হৃদয়ের ভাব সকল বৈচিত্রময় ভাষায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা হইতে যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে তখনই তাহা বাছিয়া লইয়াছেন। তাঁহার রচনা নৈপুণ্যে হৃদয়ের ভাব জীবন্ত চিত্রে পরিণত হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধে গদ্যের যাহা উদ্দেশ্য পদ্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্য ভাবের শব্দময় চিত্র। পদ্যের ভাষাকে ভাবের উপযোগী করিতে না পারিলে ভাষার বাহনে কবির হৃদয়ের ভাব পাঠকের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করে না।

গীতি-কবিতা রচনায় কেবল ভাবের উপযোগী ভাষা খুঁজিয়া বাহির করিলে কবির কার্য্য শেষ হইল না। কেবল শব্দের লালিত্য উচ্চশ্রেণীর গীতি-কাব্যের প্রধান অঙ্গ নহে। ভাষার মধুরতার সহিত ছন্দের ঝঙ্কার মিশিয়া যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি হয় গীতি-কবিতায় তাহাই উপভোগ্য। গীতি-সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অনেক কবিতার ছন্দে ছন্দে যে সঙ্গীত-সুধা ক্ষরণ করে তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে গীতি কবিতার জন্মদাতা না হইলেও, আধুনিক কাব্যকলার যুগে তিনি যে কাব্যে অভিনব উপায়ে গীতি-সৌন্দর্য্যের প্রবর্ত্তক তাহার সন্দেহ নাই। সহজ ভাষায়, সরল ছন্দে ভাবের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে পরিস্ফুট করা অসাধারণ প্রতিভার কার্য্য। গানের মত করিয়া কবিতা রচনা যে-সে কবির সাধ্যায়ত্ত নহে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে সঙ্গীত আছে,—

"সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব, কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া

দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ ?"— (সুখ)

এই ভাবনা তাঁহার মনে যেন সদাই জাগিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের নূতনত্ব তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক না হইতে পারে কিন্তু তাঁহার ছন্দের মধ্যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার, সুরের উত্থান-পতন, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে বিকশিত করিয়া তুলে। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমরা বুঝিতে পারি যে ছন্দের সঙ্গীত, ভাবের আভাস আমাদের ভিতরে পঁহুছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে যে মৌলিকতা দৃষ্ট হয় তাহার কারণ তিনি মিল, মাত্রা, পদ বিভাগ, ও যতি সংস্থাপন সম্বন্ধে অনেক সময়ে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বৈচিত্রময় মানব হৃদয়ের ভাবগুলিকে বৈচিত্রময় ছন্দের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে যে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। নূতন ছন্দে নূতন সঙ্গীত শ্রুত হইয়া থাকে। নূতন সঙ্গীতে নূতন ভাব মর্ম্ম স্পর্শ করে। নূতন ভাবে নূতন সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। নূতন সৌন্দর্য্যে নূতন আনন্দ লাভ করা যায়। যে অদ্ভুত শিল্পকৌশলে এতগুলি ব্যাপার গ্রথিত তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে ডুবিয়া যাইতে হয়। ছন্দের সঙ্গীতে যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য লুকাইয়া আছে মধুসূদন দত্ত ব্যতীত তাহা পূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালি কবি জানিতেন না। প্রাচীন কবিগণ প্রায়ই একটি বিশেষ রসের সৃষ্টি করিতে তদুপযোগী প্রচলিত ছন্দ স্থির করিয়া লইতেন এবং তাহাতে যেরূপ সুর যোজনা করিলে ভাব প্রকাশ পায় তাহাই করিতেন। মধুসূদনের সময় হইতে বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে ছন্দসৌন্দর্য্যের নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি নিজে নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়া নূতন সঙ্গীতের, নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ছন্দের পরিবর্ত্তনের সহিত গীতিসৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে সজীবতা সঞ্চার করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালি কবিদিগের কয়েক প্রকার প্রচলিত ছন্দ তখনকার দিনে বাঙ্গালির হৃদয়ের বৈচিত্রবিহীন ভাব প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। মাঝে মাঝে সাধক কবির হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির ভাব নূতন ছন্দে ধ্বনিত হইত। এদেশে প্রতীচ্য সভ্যতার শুভাগমনের পর নূতন নূতন ভাব বাঙ্গালি জগতে দেখা দিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য রচনায় সেই

সকল নূতন ভাবের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। মধুসূদন পদ্য রচনায় নূতন ভাবের উপযোগী নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মধুসূদনের পর ভাব-রাজ্যে যুগান্তর হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে অসংখ্য টুক্‌রা ভাব অসংখ্য নূতন ছন্দের সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পাঠ্য কাব্যের ন্যায় দৃশ্য কাব্যেও সেইজন্য এত ছন্দ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। রঙ্গমঞ্চে যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে তাহার সুর-ও সেইজন্য বৈচিত্র্যময় নূতন ভাবের উপযোগী। লঘুভাবের উপযোগী মিশ্রসুরে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে না, কারণ এরূপ রাগিণীর পক্ষে গাম্ভীর্য্য একেবারেই অস্বাভাবিক। সেইজন্য রঙ্গমঞ্চের ঔপন্যাসিক প্রেম-ভালবাসার ভাব হাল্‌কা রাগিণীতে ব্যক্ত করা হয়। এই সকল নূতন মিশ্র-সুরে গাম্ভীর্য্যের অভাব বাঙ্গালির জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ হউক আর না হউক, টুক্‌রা ভাবের যে সম্পূর্ণ উপযোগী তাহার সন্দেহ নাই। বৈচিত্র্য টুক্‌রা ভাবেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ক্ষণস্থায়ী উষালোকে অব্যবস্থিত চিত্ত একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

"কি গান গাইবে? কি গান গাইব!
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
উদয়ের গান,—হৃদয়ের গান"— (পথিক)

তাহা হইলেও, গানের সুরে এই যে ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তন ইহা গীতিসৌন্দর্য্যের নূতন অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছে। দৃশ্য কাব্যের ন্যায় পাঠ্য কাব্যেও অভিব্যক্তির এই নূতন উত্তেজনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব ও ছন্দের, ছন্দ ও সঙ্গীতের এই যে পারস্পারিকতা ইহা রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার একটী বিশেষ গুণ।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"

ছন্দসৌন্দর্য্যের ক্রমবিকাশ বাস্তবিক আমাদের জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তনশীল গতি অনুসরণ করিয়া কাব্য-সাহিত্যকে জীবন্ত রাখিয়াছে। সৌন্দর্য্যের কবি

রবীন্দ্রনাথ ছন্দের গীতি-সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মিত্র ও অমিত্র ছন্দের মিশ্রণ, চতুর্দ্দশপদী কবিতার আকুঞ্চন ও সম্প্রাসন, মাত্রা ও মিলনের বৈচিত্র্য, নূতন পদ বিভাগ ও যতি সংস্থাপন ইত্যাদি নানা উপায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে অতুলনীয় গীতিসৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন।

সৌন্দর্য্যের কবি স্বাভাবিক প্রতিভার বলে যে নূতন ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার যে কোন কাব্য পাঠ করিলে বুঝা যায়। অনুশীলন ও কষ্টকর সাধনার ফলে যে সকল কবিতার সৃষ্টি হয় তাহাতে ছন্দের দোষ না থাকিলেও সজীবতার অভাব দৃষ্ট হয়। নূতন ভাবে, নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালির কবি-হৃদয় পুরাতন ছন্দের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যে জাতীয় বৈচিত্র্য-প্রিয়তার অনুসরণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।"

মানব চিরকাল প্রাচীন শিল্পকলার পক্ষপাতী, আমরা সেইজন্য অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের নূতন ছন্দের গুণ গ্রহণ করিতে পারি না। কবি বোধ হয় আমাদের পুরাতন আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে চায়
সৃষ্টি আপনার।
মেলেনা তাই চরিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।" (বিচ্ছেদ)

চতুর্দ্দশপদী কবিতা—"নৈবেদ্য"—চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি বাস্তবিক এক একটী গান। এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সঙ্গীতের বিবিধ ঝঙ্কার ঐক্যতান বাদ্যের ন্যায় পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটী মাত্র সজীব ভাবের সৃষ্টি করে। একটী ক্ষুদ্র কবিতায় একটী ভাবের পূর্ণ বিকাশ, ইহাই চতুর্দ্দশপদী কবিতার উদ্দেশ্য। এইরূপ কবিতায় গীতিসৌন্দর্য্য যেরূপ স্পষ্ট

প্রতিভাত হয় দীর্ঘ কবিতায় সেরূপ হয় না। মধুসূদন দত্তের অনুকরণে অনেকে চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দশপদী অনেক কবিতা নূতন ছাঁদে রচনা করিয়া ভাবের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্যে" যতগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে সকল গুলিই যদিও প্রথাসঙ্গত চতুর্দ্দশ সংখ্যক পদবিশিষ্ট নহে কিন্তু তাহা হইলেও কোনটীতে যে গীতিসৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ছন্দসৌন্দর্য্যের এরূপ বিরাট মেলা আর কোথাও দেখা যায় না। ভাবের এরূপ বৈচিত্রময় সমাবেশ আর কাহার কাব্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ একশত খানি সুবর্ণ পাত্রে "নৈবেদ্য" সাজাইয়া তাঁহার পিতৃদেবকে অর্পণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এক একখানি পাত্র এক একটি নূতন উপচারে পূর্ণ। ভাবের চিত্রাবলী বলিয়া যদি কোন জিনিষ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" সেই জিনিষ। কবিতাগুলির একটী বিশেষ গুণ—অস্পষ্টতার অভাব। "নৈবেদ্যের" কবিতাগুলি ঠিক যেন এক একটি বিভিন্ন রঙের বিদ্যুতালোক। একশত ডালযুক্ত বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড় যদি কেহ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি "নৈবেদ্যের" সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এমন আলোর মালা কেহ কখন রচনা করেন নাই। এরূপ স্বর্গীয় সঙ্গীতের অফুরন্ত গাথা কেহ কখন শুনে নাই।

"নির্ঝর ঝরে উচ্ছাসভরে
বন্ধুর শিলা-সরণে।
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ-হৃদয়-হরণে!"　　　　(বিশ্বনৃত্য)

শিল্পনৈপুণ্য—ছন্দের সৌন্দর্য্য সকল সময়ে কথায় বুঝান না গেলেও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়। কবিতার সঙ্গীত প্রাণের সুরের সঙ্গে যখন মিশিয়া যায় তখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যে কবি হৃদয়ের শূন্যতা সঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিতে পারেন তাঁহার শিল্পচাতুর্য্য যে প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই। "নৈবেদ্যের" কয়েকটী বিখ্যাত কবিতা পাঠে হৃদয়ে যে কেবল ভাষাহীন আনন্দের উৎপত্তি হয় তাহা নহে। ছন্দে সঙ্গীতের সাড়াপাইবা মাত্র গুণ গুণ স্বরে গান

গাহিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয়। যে কবিতাটি পাঠকের হৃদয়কে সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়া ফেলে, যাহা এক্ষণে সুরসম্বলিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত না করিলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পনৈপুণ্যের সমালোচনা অসম্পূর্ণ হইবে।

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!"

পাঠকের অন্তরে ছন্দ-সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা অননুকরণীয়। "বিরহানন্দ" কবিতাটির সুমিষ্ট ঝঙ্কার যথার্থই উপভোগ করিবার জিনিষ। মাত্রা ও মিলনে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য কবিতাটির প্রতি শ্লোকে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া রাখিয়াছে। কবিতাটি একখানি কলের গান। মানব-হৃদয়ের অতৃপ্তির মধ্যেও যদি কিছু আনন্দ থাকে তাহা হইলে সে আনন্দ কবিতার গীতিসৌন্দর্য্যে কবি অদ্ভুত শিল্পকৌশলে ধরিয়া রাখিয়াছেন। কবির হৃদয়ের ভাব পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ছন্দের সঙ্গীত আমাদিগকে জাগাইয়া দেয়। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে যখন আমরা কবিতা পাঠ শেষ করি তখন বেশ বুঝিতে পারি যে বিরহানন্দের তুলনায় মিলনানন্দ কিছুই নয়। "বিরহানন্দের" ছন্দে বোধ হয় সেইজন্য সাধারণ প্রথাসঙ্গত মিলন নাই। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোন কবি হয়ত কবিতাটি এইভাবে রচনা করিতেন—

"ছিলাম নিশিদিন
প্রবাসী আশাহীন,
বিরহ-তপোবনে
উদাসী আনমনে।
আঁধারে আলো মিশে
খেলিত দিশে দিশে;
অটবী বায়ুবশে
উছাসি' উঠিত সে।
কখনো ফুল দু'ট
মেলিত আঁখিপুট,

কথনো পাতা ঝরে,'
নিশাসি' পড়িত রে।"

মিলনের সৌন্দর্য্য এরূপ রচনায় বিকশিত হইলেও বিরহের আনন্দ রবীন্দ্রনাথ পাঠকের হৃদয়ে যে উপায়ে উদ্রেক করিয়াছেন তাহা কবিতাটির ভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রচলিত প্রথাসঙ্গত মিল না থাকিলেও কবিতার গীতিসৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়া দূরের কথা. অধিকন্তর সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিরহের আনন্দ-সঙ্গীত শুনাইবার জন্যই কবি যেন ছন্দে মিলনের বিচিত্র ছটা বিকীর্ণ করিয়াছেন। ছন্দে বিরহ সঙ্গীতের উপযোগী যেরূপ মিল দরকার কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।

"ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত;
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি'।
কথনো ফুল দু'টি আঁখিপুট মেলিত,
কথনো পাতা ঝরে' পড়িত রে নিশাসি'।"

কবিতাটিতে আগা-গোড়া মিলনের এইরূপ কারিগরি। "ক্ষণিক মিলন" কবিতায় ঠিক এই রকম শিল্পচাতুর্য্য দেখা যায়।

"একদা এলোচুলে কোন ভুলে ভুলিয়া,
আসিল সে আমার ভাঙ্গা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিনবায়ুভরে থর থরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।"

আলোক ও ছায়া—প্রতীচ্য চিত্র শিল্পে বর্ণ বৈচিত্র্য অপেক্ষা আলো ও ছায়ার প্রতি চিত্রকরের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। আধুনিক চিত্রাঙ্কন শিল্পের আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অধিকাংশ চিত্র রচনা করিয়াছেন কি না আমরা জানি না কিন্তু তাঁহার কবিতা পাঠে ছায়া-আলোকের বর্ণনায় আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের বিকাশ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ উষালোকের কবি আর সেই জন্যই তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনায় সূক্ষ্ম, অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট বিচিত্ররেখা আলো ও ছায়ার ভাবগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতে

পারিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালি কবির ছবিতে আলোক ও ছায়ার অনেকটা অভাব লক্ষিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চিত্রশিল্পের অনুশীলন আদৌ হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যদিও প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে সৌন্দর্য্য বর্ণনার অভাব নাই কিন্তু পুরাতন কবির চিত্রে পটুয়ার তুলিকার পরিচয় যতটা পাওয়া যায় শিক্ষিত শিল্পনৈপুণ্যের আভাস ততটা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ আলোক ও ছায়া লইয়া যে সকল অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার তুলনা বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে কোথাও মিলে না। কবি অনেক স্থানে একটীমাত্র রেখাপাত করিয়া, সামান্য একটু রঙ্ তুলিকার সাহায্যে চিত্রের স্থান বিশেষে প্রয়োগ করিয়া আলোক আঁধারের এমন মনোহারী সন্নিবেশ করিয়াছেন যে চিত্রপট অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কাব্য-মন্দিরে যে সকল পুরাতন চিত্র আছে তাহাতে বর্ণের সামঞ্জস্য অপেক্ষা বর্ণ-বিভ্রাটেরই পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃশ্য পটে বর্ণের আভাস আমাদিগকে চতুষ্পার্শ্বিক অবস্থার কথা জানাইয়া দেয়। স্নিগ্ধ রশ্মিবিক্ষেপ, "আধ' আলো," "আধ' ছায়া," "মসীমাখা তরুছায়া," "রৌদ্রমাখান অলস বেলা" আমাদিগকে কবি ও কাব্যের কথা ভুলাইয়া দিয়া বাস্তব জগতের উষা লোকের মধ্যে লইয়া যায়। আমরা ছায়াশীতল কত পরিচিত স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কবিপ্রদর্শিত দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে থাকি। যে কবি চিত্রপটে আলোক—ছায়ার রহস্য না বুঝিয়া কেবল বর্ণ বিন্যাস করিয়া সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চেষ্টা করেন তিনি দর্শকের নেত্রপীড়া উৎপাদন করেন মাত্র। সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে ছায়া-আলোকের উপযোগিতা উত্তমরূপ বুঝেন, তাই তিনি সৌন্দর্য্য বর্ণনে অতুলনীয় হইয়াছেন।

ছায়া-আলোকের অনন্ত রহস্য যে কত খণ্ড চিত্রে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। গাঁয়ের পথে যখন বিকালবেলা বেণুবনের বাতাস বহিতে থাকে,

"ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মত জড়িয়ে থাকে,"—

* *

"এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে!"

* *

"দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠ ঘরে ফিরেছে ধেনু
শ্রান্ত কায়া।
গোধূলিতে ক্ষেতের পরে
ধূসর আলো ধূ ধূ করে,
বসে আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।"　　　(পথে)

ছায়া-আলোকের খেলা দেখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হেন স্থান নাই যে সেখানে গমন করে নাই। কোথায় ঐ ওপারের বন,

"যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।"　　　(দুইতীরে)

কোথায়,　"বেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশথের তলে।"　　(যেতে নাহি দিব)

কোথায়,　"আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে—"　　(গীতাঞ্জলী)

অথবা যেখানে "সব পেয়েছির দেশে"

"পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তার চলে।"

কিম্বা যেথায় ঊর্দ্ধে, "আকাশ আলোক পুলকপুঞ্জ" ও তাহারই নিম্নে "ছায়া-সুশীতল নিভৃত কুঞ্জ" কিম্বা যেখানে,

"কানন প্রান্তের কাছে　　ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।"
(পত্রের প্রত্যাশা)

অথবা "বেত্রবতীর কূলে,"

পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে"—　　(মেঘদূত)

"নবমেঘের ছায়ায়" যখন নদী ছল ছল করে, যখন

"ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা"— (গীতাঞ্জলী)

তখন রবীন্দ্রনাথ যে কত "আলো ছায়ার বিচিত্র গান" রচনা করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। তা ছাড়া, "দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ছায়া"—ও তিনি দেখিয়াছেন। সহরের ছায়ার কথাও তিনি বলিতে পারেন।

"তরুশ্রেণী-উদাসীন
রাজপথপানে চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে।"

বকুল বনের ছায়া, তমালের ছায়া, সুনীল ছায়া, "নীলাঞ্জন ছায়া," চাঁদের আলো, তারার আলো, 'বজ্রের আলো," প্রদীপের আলো—যেখানে আলো সেই খানেই ছায়া, "এইত নিয়ম ভবে।" "ডাকিনীর মত" ছায়া চিরকাল আলোকের পিছে ভ্রমণ করিতেছে। মায়ামৃগের নৃত্য দেখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিরাম-বিহীন প্রতিভা "দিবসরাত্র চলিছে আঁধারে আলোকে।"

"মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা—"

(প্রকাশ—)

(ক্রমশঃ)

রেণুর বর।

(লেখক—জনৈক মহিলা।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২২)

প্রাতে রমেশচন্দ্র বাহির বাটীতে বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। এমন সময় মণিলাল সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মণিলালকে দেখিয়া রমেশ চন্দ্র বলিলেন, "মণিলাল যে, এত সকালে কি মনে করে?" মণিলাল বলিল, "দিদিকে লইতে আসিয়াছি, মামি মা পাঠিয়ে দিলেন।" রমেশ 'হুঁ' বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "দিদির সহিত দেখা করেছ?" মণিলাল বলিল, "না।"

রমেশ বলিলেন, "ভিতরে চল, তিনি নেহাত যেতে চান ত যাবেন আমি ত আর বারণ করিতে পারি না।" রমেশ চন্দ্র মণিলালকে লইয়া বাটীর ভিতর চলিলেন।

ভবানী তরকারী কুটিয়া, আবর্জ্জনা ও জল লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় রমেশ চন্দ্রের সহিত মণিলালকে আসিতে দেখিয়া ত্রস্তে বাম হস্তে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ভবানীকে দেখিয়া রমেশ বলিলেন, "মণিলাল আপনাকে লইতে আসিয়াছে, আপনি কি আজই যাবেন?" ভবানী মুখ নত করিয়া বলিল, "হাঁ, মামি মা একলা আছেন, আর এখানে থেকেই বা কি করিব।" রমেশ বলিলেন, "আপনার কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি যদি আপনার কষ্ট হয় তবে বারণ করিতে পারি না, তবে যদি বিশেষ অসুবিধা না হয় আর কয়েক দিন থাকিলে দোষ কি?" ভবানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, কষ্ট কি তবে একলা বড় ভাল লাগে না, তবে রেনু এখন থাক্ আমি আজ যাই।" রমেশ বলিলেন, "সে কাহার কাছে থাকিবে, তবে আপনারা সকলেই যান, এখনই যাবেন কি, গাড়ী তৈয়ারী করিতে বলিব।" ভবানী বুঝিল রমেশ দুঃখিত হইতেছে এবং অভিমানের সহিত এখন গাড়ী তৈয়ারী করিবার কথা বলিতেছে। ভবানী একটু নীরবে ভাবিয়া মণিলালকে বলিল, "মণি আজ তুমি যাও, পরশু এসে আমাদের নিয়ে যেও।" মণিলাল বলিল, "কেন" ভবানী বলিল যা বলিলাম তাই বলো আর যা বলিতে হয় আমি চিঠি লিখে দেব, এখন আমার সময় নাই, এখন তুমি যাও তোমার স্কুলের সময় হয়ে এ'ল, মণিলাল বলিল "আচ্ছা, রেনু কোথায়?" ভবানী বলিল, "উপরে বোধ হয় পুতুল খেল্‌ছে,।" মণিলাল উপরে চলিয়া গেল। রমেশ এতক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া গোঁপ পাকাইতে পাকাইতে কি ভাবিতেছিলেন এখন বলিলেন, "আপনি কি অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়া গেলেন?" ভবানী বলিল "না, আমার আবার সন্তুষ্ট আর অসন্তুষ্ট কি, যেখানে হয় এক জায়গায় থাকিলেই হল, বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।" রমেশ চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিয়া ভাবিলেন, আমার বোধ হয় এ কথাটা বলা ঠিক হয় নাই, উহার মনে ব্যথা লাগিল রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, না বুঝিয়া আপনার মনে কষ্ট দিয়াছি।" ভবানী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমার মনে ব্যথা আর কি দিবে, এজগতে আমার সুখও নাই, বেশী দুঃখ নাই, সমুদ্রের তৃণ, জল যে দিকে টানে সে দিকেই যাই," বলিয়া ভবানী সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা এমন নারীর অদৃষ্টে এমন দুঃখ, ভগবানের কি বিচার। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রমেশ উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরে যাইয়া জুতা খুলিয়া ধীর পদে রেনুর খেলা ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন, রেনু তখন মণিলালকে তাহার পুতুলের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে ব্যস্ত ছিল। মণিলালের দৃষ্টি রমেশের উপর পড়ায়, সে হাসিয়া বলিল "রেনু দেখ কে এসেছে।" রেনু চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া খাটের পাশে গিয়া লুকাইল। রমেশ রেনুর লজ্জা দেখিয়া, হাসিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সাহিত্য।

ভারতী—বৈশাখ ১৩২৩—ভারতীর ৪০শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা পড়িয়া আমরা বড় আনন্দিত হইয়াছি। রবিবাবু লিখিয়াছেন "মানুষের পক্ষে চল্লিশটা বছর বড় কম নয়।" কথাটী খুব সত্য। তাই আজ চল্লিশ বছরেও পড়িয়া ভারতীর বার্দ্ধক্যের কোন লক্ষণ না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

রবিবাবুর "তখন ও এখন" প্রবন্ধটী বড় সুন্দর লাগিল। অনেকগুলি কথা বড় সরসভাবে বলা হইয়াছে। কবির সহিত আমরাও বলি "বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই।" আর এক কথা সমালোচনার নাম দিয়া অসৌজন্যের প্রশয় দেওয়া কোন মতে উচিত নয়। 'যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না তাহার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।" যে লেখা ভাল বলিতে পারিবে "দিল খুলিয়া" তাহার প্রশংসা করিবে। লেখককে উৎসাহ দাও। যদি লেখকের ভিতর জিনিষ থাকে তাহা ক্রমশঃ বিকাশ হইয়া একদিন না একদিন লোকরঞ্জন হইবে। বঙ্গসাহিত্যের বড় সৌভাগ্য যে ষোল বৎসরের রবিকে কাহার কাছে "জবাবদিহি" দিতে হয় নাই, তাই আজ যদিও তাহার "প্রথম মুকুল প্রায় সবই ঝরিয়াছে অপ্রতিহত প্রাণের উদ্যমটা রহিয়া গেছে।" সেই কারণে সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রবাবুর গল্প "প্রথম প্রণয়ের" নায়িকা বিভার মুখ হইতে

ব্যঙ্গোক্তি যে "এত সব লক্ষ্মীছাড়া লেখা নিয়ে নূতন নূতন মাসিক পত্রই বা রোজ রোজ বেরুবে কেন"র অর্থ আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আজ তিনি যে কাগজের সম্পাদক হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন সেই কাগজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের মতটা তাহার মানা উচিৎ ছিল। আর এক কথা দেশে যত মাসিক পত্রের ছড়াছড়ি হয় তত ভাল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কঠোরতায় অযোগ্য লেখা মূল সাহিত্যে স্থান পাইবে না। অতএব সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

সৌরীনবাবুর "প্রথম প্রণয়" গল্পটির ভাষা বড় সুন্দর হইয়াছে। ভাবগুলি একের পর এক করিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া সৌরীনবাবু লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটির ভাবার্থ এই—ভাগলপুরে বরদাবাবু তাহার কন্যা বিভাকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। "বিভা কিশোরী ও অপূর্ব্ব-সুন্দরী।" শিশিরবাবু একজন খ্যাতনামা গল্পলেখক, ভাগলপুর কালেজের ফিলজফির প্রোফেসর। শিশির-বাবুর সহিত বরদাবাবু কন্যার পরিচয় করিয়া দিলেন। শিশিরবাবু বিভা সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে বিভার 'প্রথম প্রণয়ী' নরেন বিলাত হইতে আসিবার সময় জাহাজে ইহলীলা সম্বরণ করেন। এক বৎসর যাবৎ বিভা নরেনের স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া আছে। বাপের মনে পাছে কষ্ট হয় সেই জন্য বুদ্ধিমতী কন্যা নিজের শোকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাহিরে কোন প্রকার শোকের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। কাব্য আলোচনায়, রোগীর সেবায় ইত্যাদিতে প্রোফেসর শিশিরবাবু বিভার কাছ হইতে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিলেন এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করাতে বিভার কাজ হইতে "কীর্ত্তিগণের পালা" বন্ধ রাখিবার আজ্ঞা পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এক্ষেত্রে যাহা হয় তাহাই হইল। শিশিরবাবু একদিন প্রকৃতির ঝড়বৃষ্টির মাঝখানে মানসিক ঝড়বৃষ্টির হাত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় "কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায়" বিভাকে বলিয়া ফেলিল—"বিভা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।" আর যায় কোথায়? বিভা কিছুই শুনিল না। শিশিরবাবুর শত চেষ্টায় কিছু শুনিতে চাহিল না। হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। শিশির বাবুকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। আমরা বলি অত ঝড়বৃষ্টিতে একটা গাড়ী ডাকাইয়া অন্ততঃ একটা ছাতা দিয়া বিদায় দিলে ভাল হইত। সৌজন্য রক্ষা হইত ও গল্পের কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ। শিশিরবাবুর কর্ম্মফল। শিশির বাবুকে ভিজিতে হইল।

আমরা বলি এই প্রকার শতক্ষেত্রে যাহা হয় এই ক্ষেত্রে তাহা হইয়াছিল।

চাণক্য বহুবৎসর আগে বলিয়া গিয়াছেন পুরুষ অগ্নি, নারী ঘৃতকুম্ভ। দুইটি একজায়গায় থাকিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভব খুব বেশী। এমন কি সৌরীনবাবুর মতও তাই। বৃদ্ধ বরদাবাবু বলিয়াছিলেন—"আমারই দোষ, শিশির! আমি যদি তোমাকে সব কথা আগেই বলতুম, তাহা হইলে এই ঘটত না। এ বয়সে তোমাদের ও রকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।"

যদি 'ও রকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়' তবে আমরা বিভার নিম্নোক্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "এত ছোট মন নিয়ে আপনি শিক্ষার ভাণ করেন। নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী বলেই জেনেছেন। আর কোন পবিত্র ধারণাও করতে পারেন না!"

আমরা বলি শিশিরের ছোট মনের কোন পরিচয় আমরা পাই নাই অপরন্তু "শিক্ষারভাণ" দূরে যাউক বেচারী যাহা শিখিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল। একবার না বার বার শিশির স্বীকার করিয়াছে যে তাহার শিক্ষা পূর্ণ হয় নাই তিনি যাহা কিছু করিতেছেন তাহা "শুধু আপনার (বিভার) আদর্শ অনুসরণ করে।"

আমাদের এই গল্পটির সম্বন্ধে এত কথা বলিবার কারণ এই যে আজকাল একরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে যাহাতে শিক্ষিত হিন্দুযুবকে শিক্ষিতা মহিলাগণের সংঘর্ষে আনয়ন করিয়া তাহাদের উপর নানাপ্রকার বাক্যবাণ বর্ষণ করা। বাস্তব জীবনে ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে আমরা কোন কথা বলিতাম না।

অর্চ্চনা—চৈত্র—১৩২২—এই সংখ্যার অর্চ্চনায় দুইটি গল্প আছে। দুইটি কেশব বাবুর লিখিত। 'হিরণ্যকশিপু'র পরিণাম দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। মানুষের বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কত ভুল ধারণা হয় এ গল্পে কেশব বাবু অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। গল্পটির ভাব যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। ভাবটা কতকটা Tennysonর Dora নামক প্রসিদ্ধ পদ্যে পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়।

'প্রতিশোধ' গল্পটি কতকটা রোমন্টিক্ কতকটা ডিটেক্‌টিভ গল্পের মতন। বিশেষ কিছু কৃতিত্ব আছে বলিয়া বোধ হইল না তবে বর্ণনা ও ঘটনার সমাবেশ তত সুন্দর না হউক মন্দ নয়।

'সরোজ' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড় প্রীত হইলাম। আশা করি অর্চ্চনায় প্রত্যেক সংখ্যায় এই প্রকার একটি করিয়া প্রবন্ধ থাকিবে। কেশব বাবু যদি এই প্রকার সহজ ভাবে নানা জাতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বোধগম্য প্রবন্ধাদি

লিখেন তাঁহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি Huxley বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।

পাছে আমরা রাজকৃষ্ণ ও দ্বারিকানাথ অধিকারীকে ভুলিয়া যাই সেইজন্য অমর বাবু ও অমূল্যবাবু উক্ত মহোদয়দ্বয়কে আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। মহতের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা সম্মুখে থাকার উপকারিতা অনেক।

নারায়ণ চৈত্র ও বৈশাখ—চৈত্র সংখ্যায় বিপিনবাবুর লিখিত "ব্রাহ্ম-সমাজ ও রাজা রামমোহন" 'মহাজন পদাবলী ও রসকীর্ত্তন' ও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বিপিনবাবুর সহিত আমাদের যদিও এক মত নয় কিন্তু বিপিনবাবু যে সব ভাব প্রকাশ করিতেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে। তিনি যখন "বারান্তরে সবিস্তারে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব" বলিয়া আমাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন আমরাও সেই শুভদিনের জন্য আমাদের বক্তব্য মুলতবি রাখিলাম।

বৈশাখের নারায়ণ পত্রে সার আশুতোষ 'কৃত্তিবাস স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন' উপলক্ষে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার গৌরব, অদ্ভুত কর্ম্মা আশুবাবুর অভিভাষণটি বাঙ্গালা ভাষার এক অভিনব দ্রব্য। আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কণ্ঠে বিরাজিত দেখিলাম। তাঁহার এ ভাষা 'সুন্দরী ও সম্পত্তিশালিনী' হইলেও তাহা যে সকল "সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমাজ দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকায় প্রবেশ করিতে পারে" বলিয়া বোধ হয় না।

'কবি কৃত্তিবাস তদীয় অনাদ্য রামায়ন কাব্য সর্ব্বকালানুযায়িনী সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে।'

কিন্তু আমরা কৃত্তিবাসের যে ভাষা দেখিতে পাই, তাহা সেই ৫০০ বৎসরের ভাষা নহে, সেই পুরাতন ভাষার নিদর্শন অধুনা দুষ্প্রাপ্য। ১৮০৩ সালে শ্রীরাম-পুরের সাহেবরা ঐ রামায়ণ মুদ্রিত করেন সেই আদর্শেই বটতলার রামায়ণ মুদ্রিত হইয়া আসিতে ছিল, মধ্যে জনকতক বিদ্যাবাগীশ মিলিয়া ভাষা ও ছন্দকে মার্জ্জিত উভয়ের আধুনিকত্ব সম্পাদন করেন। সুতরাং এখনকার ভাষা দেখিয়া আসল কৃত্তিবাসের ভাষার সমালোচনা করা যায় না।

আশুবাবু বলিয়াছেন পরবর্ত্তীকালে ভাষা পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার

আদিকবি কৃত্তিবাস ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছেন। কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া সংশোধকগণও আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন।' অর্থাৎ আমরা কৃত্তিবাসকে যুগে যুগে adopt করিয়া লইতেছি। সুতরাং এখনকার কৃত্তিবাসে আদি কৃত্তিবাসের কতটুকু আছে তাহা বিচার্য্য। দীনেশবাবু বলিয়াছেন যে 'মাংস যোজনা বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থিভাগের বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় নাই।' সেজন্য কবির ভাষা আধুনিক হইলেও তাঁহার কবিত্ব তাঁহার নিজস্ব। আশুবাবু ঐ কল্পনাকে 'স্বৈরচারিনী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও নূতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে।' তিনি মহর্ষি বাল্মীকির রাময়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্যে লিখেন নাই, আমাদের দেশে কথকতায় যাত্রায় সর্ব্বত্রই নানাভাবে ও নানা আকারে রাম বিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে কৃত্তিবাসের বহুপূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থ রচনায় এই লোক পরম্পরাগত গাথায় অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন।' ইহাই কৃত্তিবাসের মৌলিকতা।

যদিও আশুবাবু আপনাকে 'কবিতা রসবঞ্চিত অভাজন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার অভিভাষণে মধ্যে মধ্যে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বঙ্গভাষা লেখা অনভ্যাস বশতঃ মাঝে মাঝে আরষ্ট ভাব আছে সত্য। 'অকৃপণভাবে প্রাণঢালা' বা 'ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়' পড়িয়া মনে হয় কোনও বিদেশীয় লেখা পড়িতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন—"কৃত্তিবাসের পর আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পদপূজা করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ ফুল, ফল, পল্লব কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্প কানন হইতে রচিত ও সংগৃহীত।" কথাটা একটু বেশী ব্যাপক হইয়াছে। 'প্রত্যেকই' না বলিয়া 'অনেকেই' বলিলে ভাল হইত।

যাহা হউক তিনি নিজে যে বঙ্গবাণীর সেবা আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলের আনন্দ।

কবি কৃত্তিবাসের সহিত কাশীরাম দাসের প্রভাব ও বঙ্গভাষায় যথেষ্ট আছে, তিনি অভিভাষণে তাহার নাম বলিলে ভাল হইত।

ভারতবর্ষ বৈশাখ—একটিও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই। ভারতবর্ষ হইতে আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। যে কয়েকটী গল্প আছে তাহাতে নূতনত্ব বা কোন প্রকার লিপি কুশলতার পরিচয়

পাইলাম না। 'সমাজ ধর্ম্মের মূল্য "প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। 'মধু-স্মৃতি' একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। যতটা বিষয় সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে গুছাইয়ো লিখিলে একটি সুন্দর ব্যাপার হইত। সম্পাদক মহাশয় সে বিষয়ে একটু নজর রাখা উচিত ছিল। এখন হইয়াছে ধান ভান্‌তে শিবের গীত। "ইউরোপে তিনমাস" সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের লেখা। 'মধুস্মৃতির' ন্যায় এও একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার হইতেছে তিন মাসের কিন্তু তিন বৎসর তিন মাসের উপর বাহির হইতেছে। দীনেন্দ্র বাবুর নূতন সংসার গল্পটির কোন "নূতনত্ব" দেখিলাম না, গল্পটি কি উদ্দেশ্যে লিখিত হইল তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। গল্পের কোন চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া অঙ্কিত করা হয় নাই। কোন ভাবটী আশ্রয় করিয়া গল্পটী লেখা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট ধরা যায় না। আজ কাল ছোটগল্পের রেওয়াজ বাড়িয়াছে। অতএব কিছু পদার্থ থাকুক আর না থাকুক ছোট গল্প লেখা চাই। অর্থহীন কবিতা যেমন আজকালকার কবিদের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, উদ্দেশ্যবিহীন ছোট গল্প আজকালকার গল্পলেখকদের 'ফ্যাসেন' হইয়া উঠিয়াছে। হেমন্তবাবু লিখিত 'শিউলি' গল্পটির উদ্দেশ্যটা মন্দ নয়। সমাজ পতিতা নারীর উপর খড়্গহস্ত। পতিতা নারীও সমাজের উপর দাবী করিতে ছাড়ে না। সমাজ দাবী দিতে স্বীকৃত না হইলে, পতিতা সমাজ হইতে "জিজিয়া' আদায় করে। শিউলি "ঘৃণিতা, পতিতা।" সে "সংসারের সাগর শিকতে বালুকায় ঘর বাধিয়া চঞ্চল যৌবনের দ্রুত দিনগুলি সকলের মৌখিক প্রেমে ও আন্তরিক অবজ্ঞায় গুণিয়া গুণিয়া কাটাইতেছিল এমন সময়ে "হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকার মুখে এই কবির বাণী সমাজের নয়" শুনিয়া তাহার জীবনের "ভ্রমপ্রমাদ" বুঝিতে পারিল। জীবনের পট পরিবর্ত্তন হইল। গণিকা ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইল। সে তাহার বাবু বিলাসচন্দ্রকে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে "কে কে তুমি? চলে যাও এখান থেকে ও আমার কেউ নয়। আমার গায়ে হাত দিয়েছে—আমি ওকে চিনি না" বলিয়া বিদায় দিল আর এই কথা শুনিয়া পাণ্ডা হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া বিলাসকে এক ধাক্কা মারিল—'বিলাসচন্দ্র লাটুর মত ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে আঙ্গিনায় ঠিকরিয়া পড়িল'। এইত গেল গল্পের নায়েকের অবস্থা। আমাদের মত: নিরীহ পাঠকবৃন্দ লেখকের এমন অপূর্ব্ব ভাবের ঢেউ খাইয়া 'লাটুর মত' হাবু ডুবু খাইতে খাইতে তীরে উঠিয়া হাফ ছাড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আশপাশ দেখিয়া একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া সামনের পথে ভোঁ দৌড়। কারণ লেখকের ন্যায় আমরা শিউলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।

পরের মাথায় কাটাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া নিজের পক্ষে যত আনন্দদায়ক, পরের পক্ষে তত নয়। ধর্ম্মপ্রাণ শিউলি লেখকের মতে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তবে নাগরের সহিত কাশী গিয়া ধর্ম্মের যে ভাব প্রকাশ করিল তাহা বাস্তব জীবনে আমরা অভিনয়ে ব্যতীত অনত্র দেখিতে পাই না। যদি বল লেখক চরিত্রটিকে আদর্শ করিয়াছেন তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কলিকাতার কোন কোন পল্লী বিশেষে লেখকের এই চেষ্টার বিষয় প্রচারিত হইতে লেখক সেখানে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"শপথ-ভঙ্গ" লেখিকা শ্রীচারুলতা গুপ্তা। গল্পটিতে ভাবের এত অভাব যে বার বার না পড়িলে গল্পটির ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় লেখিকা গল্পচ্ছলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে দম্পতীর কলহ কিছু কাজের নয়। বৃথা সময়ের অপব্যয়। বৃদ্ধ চাণক্য অনেকদিন "দম্পতীর কলহ" সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" কিন্তু আজকাল 'আপদকাল' ছাড়া বৃদ্ধের বচন শোনে কে? সেই জন্য লেখিকা পুরাতন বচন নূতন পাষাকে জলধর বাবুর দ্রব্যসম্ভারে সাজাইয়া ভারতবর্ষের নিরীহ পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। লেখিকা প্রচীনা হইলে অনেক নবীনার পক্ষে গল্পছলে উপদেশটি শিক্ষাপ্রদ হইবে।

মালঞ্চ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—আমরা এই পত্রিকার বহুলপ্রচার কামনা করি। গল্পগুলি মনোরম। বিবিধ প্রবন্ধাদি অতি সরল ভাষায় লিখিত।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—চৈত্র ও বৈশাখ—আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মাসিকপত্র 'মানসী' ও সাপ্তাহিক 'মর্ম্মবাণী' একত্রে সম্মিলিত হইয়া চৈত্র বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। আমাদের যতদূর মনে হয় বঙ্গসাহিত্যে মধুমাসে এ প্রকার মধুর সম্মিলন আর হয় নাই। মহারাজের সহযোগী সম্পাদক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবীণ লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতবাবুর সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার আর কিছু নাই। আমরা আশা করি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' বঙ্গসাহিত্য নূতন যুগান্তর আনিবে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' 'ভারতবর্ষের' ন্যায় আমাদের যেন নিরাশ করে না। মনোজ বাবুর 'চুরিবিদ্যা' এক নূতন ধরণের প্রবন্ধ। আজকাল পাশ্চত্য সাহিত্যে এই প্রকার প্রবন্ধ বহুল পরিমাণে স্থান পাইতেছে। লেখার বিষয় মনোজ বাবু সিদ্ধ হস্ত। "চুরি বিদ্যা"য় তিনি তাঁহার পারদর্শিতা যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া দিব কিন্তু চুরিবিদ্যার উপর

এতদূর সহানুভূতি দেখাইলে পাছে কু লোকে কু কথা বলে সেই ভয়ে ও স্থানের অভাবে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। 'লাফো' গল্পটি মন্দ নয়। 'বীরেশ্বর পাঁজা' কে 'লাফো' নামে অভিহিত করিয়া লেখিকা এক নূতন ধরণের চরিত্র স্বজন করিয়াছেন। "নরঘাতক দস্যু"র হৃদয় কি মহান্ ভাবে পূর্ণ। সে বলিল—'না বাবুজি। আমাদের বংশে এখন আর কেহ নাই খালি আমি আর শঙ্কর"। জমির উপর আমি নীচে শঙ্কর।" Wordsworthএর 'We are seven'র "little maid"র ন্যায় লাকোর জীবিত ও মৃতের পৃথক জ্ঞান নাই। থাকিবে কি করে? শাকোর জীবন শঙ্করময়। মানুষ অবস্থার দাস। নরঘাতক হইলে যে মনুষ্য একবারে নরাধম হয় না তাহা লেখিকা সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুল চৌধুরী লিখিত গল্প 'উকিলসাহিত্যিক' গল্প হিসাবে বা লিখিবার ভাবভঙ্গিতে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হইল না। তবে পড়িতে মন্দ নয়। 'বৈদেশিকী' ও দেশবিদেশর কথা' অংশ দুইটি মন্দ হয় নাই। "জীবনের মূল্য" সবে ষোড়শ পরিচ্ছদে উপনীত হইয়াছে। লেখা প্রভাতবাবুর। বলিবার কিছু নাই। কবে শেষ হইবে তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। বৈশাখের সংখ্যায় দীনেন্দ্রবাবু লিখিত গল্প 'নববধু'র 'নবত্ব' কিছু দেখিলাম না। বাঙ্গালায় সহস্র সহস্র এ প্রকার 'নববধু' বিরাজ করিতেছে। তবে আজকাল সমাজের যে গতিক তাহাতে সামাজিক চিত্র অবলম্বন করিয়া দুইটি একটি এই প্রকার গল্প প্রত্যেক মাসিকে স্থান পাওয়া উচিৎ। "দাদার স্ত্রী ও দাদার মেয়ে তাহার চোখের উপর অনাহারে শুকাইয়া মরিবে—আর সে দু-বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া হুঁকা হাতে করিয়া হরি স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত পরকালের কাজ করিবে অর্থাৎ রামায়ণ শুনিবে, ইহা সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে করিল।" এ কয়েকটির কথার মূল্য আছে। পাড়াগেঁয়ে মূর্খ রামযাদু যাহা 'অস্বাভাবিক' মনে করিয়াছিল সমাজে সম্মানিত কৃতবিদ্য এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা ইহাকে 'অস্বাভাবিক' ভাবা দূরের কথা নিজেদের কার্য্যকলাপ দ্বারা 'স্বাভাবিক' করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষু খুলিলে দীনেন্দ্র বাবুর লেখা সার্থক হইবে। আশুবাবুর রঙ্গপুরের অধিবেশনের অভিভাষণ সমস্তটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আশুববুর সহিত আমরাও বলি "নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন।" ইহা অলস ব্যক্তির উক্তির নয়। বাঙ্গালার গৌরব, অদ্ভুত কর্ম্মবীর আশুবাবুর উক্তি। আমাদের নিম্নলিখিত কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিৎ—"যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত, তাহা উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর,

যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাব পুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সদ্ভাব কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা উপেক্ষিতা, বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃসেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।”

গান।

(লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি, এ, ।

বিভু, সকলি তোমার দান।
প্রভাতে তুমি কমল ফুটাও
সাঁঝে কর তারে ম্লান।
অরুণ কিরণে জগৎ হাসাও
জ্যোৎস্না আলোতে রজনী ভাসাও
নিদঘ রৌদ্রে অগ্নি জ্বালাও
দগ্ধ করিয়া প্রাণ।
কত আশা দিয়া মনকে ভুলাও
বিফল করিয়া তাহারে কাঁদাও
সুখ ও দুঃখের বিচিত্র চিত্রে
চিত্রিত কর প্রাণ।
যখন দেখেছি ফুল্ল যামিনী,
কোথা হতে মেঘ আসিয়া অমনি
স্নিগ্ধ মধুর সেই ছবি খানি
ভেঙ্গে করে খান্ খান্
যাহা সাধ তব তুমি করে যাও
আশা ও নিরাশা দলে চলে যাও
সুখ পাই বা দুঃখ পাই প্রভু
আনন্দে করিব গান
এ যে সকলি তোমারই দান।

আমেরিকায় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক ক্ষমতায়

প্রস্তুত

মেহ, প্রমেহ, প্রদর, বাধক, অজীর্ণ, অম্ল, পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি।৵০ আনা।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক

শক্তিসম্পন্ন সাল্‌সা

সাধারণতঃ ইহা রক্তপরিষ্কারক, বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ বিনাশক, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ ও রক্তদুষ্টিজনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল রোগ এবং পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি দূর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

মূল্য প্রতি শিশি ১।০ টাকা, মাশুলাদি।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি ডি, হাজরা,

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকতা

PRINTED BY S. C. PALIT, AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS,
67-9 BALARAM DE STREET, & PUBLISHED BY S. C. PALIT
FROM 73 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

৭ম কল্প] Reg. No. C. 691. [৩য় খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২৩] [July 1916.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত বি, এল্,-সম্পাদিত।

কার্য্যালয়—৭৩ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সূচী।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
কপালকুণ্ডলা	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম্ এ, বি এল্,	...	৮১
দুল্ল ভচাঁদ	...	...	৮৩
রবীন্দ্রনাথ	শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম্ এ, বি, এল্,	...	৯১
রেণুর বর	জনৈক মহিলা	...	১০৪

অর্ঘ্যের নিয়মাবলী।

১। অর্ঘ্যের মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। নমুনার আবশ্যক হইলে ৵০ ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। প্রতিমাসের মধ্যভাগে অর্ঘ্য বাহির হয়। কোন মাসের অর্ঘ্য না পাইলে পরের মাসে ৭ তারিখের ভিতর জানাইতে হইবে। তার পর আমা আর দায়ী হইব না।

৩। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। আমরা ভাল প্রবন্ধাদি পাইলে বাহির করি।

৪। চিঠি পত্রাদি ও টাকা পয়সা সব "কার্য্যাধ্যক্ষ" অর্ঘ্য, ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। নূতন গ্রাহক 'নূতন' কথাটা লিখিবেন।

৫। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাইলে বা প্রবন্ধাদি ফেরৎ হইলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের নিয়ম এক মাসের জন্য সাধারণ একপৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা, ও সিকি পৃষ্ঠা দুই টাকা। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। মলাটের বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিলে জানিতে পারিবেন। বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—অর্ঘ্য।

৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ঘ্য

৭ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৩। | ৩য় সংখ্যা

কপালকুণ্ডলা

(লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম্ এ, বিএল্,)

নিবিড় গহন মাঝে
বৃন্তে বন-লতিকায়
ফুটেছিল যেই ফুল
বেশে নব যুথিকায়
সদয় কোমল করে কেন তারে তুলে নিলে
কেন মালা গেঁথে তুমি গলে তারে দোলাইলে
আদরে গরবে তার কিবা ছিল অধিকার
কিবা ছিল প্রয়োজন তায়
ক্ষণিক জীবন তাতে আরো আগে শুকাইবে
বুঝিলেনা, বুঝিলেনা হায় !

নীল আকাশের কোলে
বন-বিহগিনী আমি
বেড়াতাম উড়ে উড়ে
সারাটা দিবসযামি ;
বিবিধ বরণ-ছটা অঙ্গে হেরিয়া মোর
ফাঁদ পেতে কেন মোরে ধরিলে বলনা চোর
দিয়াছ দিয়াছ মানি, সোনার পিঞ্জর খানি
দিয়াছ রসাল কত ফল

নিয়াছ হরিয়া কিন্তু পাথার শকতি যাহা
আকাশেতে উড়িবার বল।

গিরি-শিখরেতে আমি
নিঝর সরল-কায়
বেড়াতাম ছুটে ছুটে
দরী গুহা সানু গায়।
উপলে উপলে লুটি হেসে কুটি কুটি হ'য়ে
ছুটিতাম কুয়াশাতে শত ফেন-বিম্ব লয়ে
কেন মোরে স্রোতোহীন করিলে মলিন ক্ষীণ
ধরি তব বাঁধা সরোবরে
যদিও রেখেছ তাতে মর্ম্মর সোপানরাজি
ফুটায়েছ কমল-নিকরে।
তোমার করুণা স্নেহ
আজীবন রবে মনে
কিন্তু মোরে ছেড়ে দাও
ছেড়ে দাও যাই বনে।

ছেড়ে দাও নীলাকাশে, ধূসর শিখর-শিরে
কিম্বা কাজ নাই আর—যেতে কি পারিব ফিরে?
তোলা কুসুমের হার কাননে ফোটে কি আর
বাঁধা পাখী ছেড়ে দিলে পরে
পারে কি উড়িতে তত, সরসীর নীর
পারে কিগো উঠিতে ভূধরে?

ডুল্লভচাঁদ।

(১)

প্রাতঃকালে রৌদ্রের আলোকে ডুল্লভচাঁদের ক্ষুদ্র পাঠাগার পরিপূর্ণ হইয়াছে। ডুল্লভচাঁদ আরামকেদেরায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি সাপ্তাহিকের পাতা উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া নানা প্রকার ছবি দেখিতেছেন। সম্মুখে টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা। এমন সময়ে ডুল্লভচাঁদের দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া পত্নী শ্রীমতী লবঙ্গলতিকা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লতিকা বলিলেন, "কি তুমি চা খাও নাই। আমি পেয়ালা লইতে আসিয়াছিলাম।" ডুল্লভচাঁদ ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তুমি ত জান আমি গরম চা খাই না। তাড়াতাড়ি বাটি লইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?" এই বলিয়া ডুল্লভচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় সাপ্তাহিকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন এবং এই অবসরে যতদূর সম্ভব নানা প্রকার জ্ঞানার্জ্জনে মন নিবিষ্ট করিলেন।

ডুল্লভচাঁদকে এই প্রকার ব্যস্ত দেখিয়া শ্রীমতী লবঙ্গদেবী আস্তে আস্তে বলিলেন—"তুমি ওকি পড়্‌চো। আইনের বই বুঝি।" এখানে বলা উচিত ডুল্লভচাঁদ একজন উকিল। কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। একজন মেধাবী উকিল বলিয়া তাহার প্রতিপত্তি হইয়াছে। কমলার আশীর্ব্বাদে তাহার মক্কেলের অভাব নাই।

পত্নীর বাক্যে ডুল্লভচাঁদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লবঙ্গলতিকা কিছু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হাস্‌ছ কেন। সবাই কি বিদ্বান হয়। একজন বিদুষী বিবাহ করিলে ত সব গোল চুকিয়া যাইত।" ডুল্লভচাঁদ কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তুমি রাগ করিও না। আইনের বহি যদি এত সহজ ও সুপাঠ্য হইত তাহা হইলে কি প্রকার আমোদ হইত এই ভাবিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।" লতিকাদেবী বুঝিতে পারিল যে তাহার স্বামী ব্যথিত হইয়াছেন ও কথাটি চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং অন্য প্রসঙ্গ অবতরণা করিবার জন্য বলিল—"কাল কত রাত্রিতে এলে? আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, টের পাই নাই।" ডুল্লভচাঁদের বোধ হইল স্বরটা অভিমানে ভরা। পত্নীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ডুল্লভচন্দ্র বলিল—"কাল আস্‌তে

রাত্রি প্রায় একটা হইয়াছিল। আশু আর দ্বিজেন কিছুতেই ছাড়্‌লে না। কি করি বল?" লতিকা ধীরে ধীরে "তা বেশ" বলিয়া অন্য কাজে চলিয়া যাইল।

"তা বেশ" কথাটা দুল্লভচাঁদের কাণে বাজিল। স্বরটা যে কেবল অভিমানের নয়, তার সঙ্গে একটা বিদ্রূপের ভাব আছে বলিয়া বোধ হইল। দুল্লভচাঁদের মনে মনে একটু রাগ হইল। এতদিন তাহার বিশ্বাস ছিল যে সে এই নিরক্ষরা নির্ব্বোধ বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ও তাহার পিতৃকুলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। আজ সে বিশ্বাসে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দুল্লভচাঁদ দুঃখিত হইল। তাহার মনে হইল যদি পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে জীবন সুখের হইত ও লোকে অকাতরে পরোপকারে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার মতন একটী কৃতবিদ্য যুবক কি সুখের আশায় একটি মূর্খ বালিকার সহিত পরিণয় পাশে আজন্ম বদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে বিবাহ করিয়া দুল্লভচাঁদ কতটা স্বার্থত্যাগ করিয়াছে এই সামান্য কথাটা তাহার পত্নী বুঝিতে পারিতেছে না। আজ যদি বিলাতে কিম্বা আর কোন সভ্য জগতে তিনি জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কথাটা কত স্বতন্ত্র হইত। হিন্দুরমণীরা পতিপরায়ণা। কথাটা সত্য কিন্তু তাহাদিগের প্রেম অন্ধ, অর্থাৎ এক কথায় তাহাদিগের প্রেমকে "intelligent প্রেম" বলা যাইতে পারে না। তাহা কেবল একটা "instinct" মাত্র। এই প্রকার গভীর গবেষণায় দুল্লভচাঁদের নিজের উপর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল এবং হিন্দুসমাজের ও স্বদেশের আচার ব্যবহারের উপর অত্যন্ত বীতরাগ হইল।

(২)

যথা সময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া দুল্লভচাঁদ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতাস্রোতে যুগপৎ হাকিমের কর্ণ ঝালাপালা ও মক্কেলদিগের মনে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিয়া বেলা ২টার সময় জলযোগার্থে দুল্লভচাঁদ উকিলদিগের বিশ্রমাগারে আসিলেন।

একটি কেব্‌লা উকিল দুর্লভচাঁদের বক্তৃতার কতক অংশ হুবাহুব আবৃত্তি করিতে লাগিল এবং কি প্রকার গবাচন্দ্র হাকিম বক্তৃতার জোরে বাসায় যাইয়া মৃতকল্প হইয়া থাকিবে এই দৃশ্যের অভিনয় করত শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে অমৃত-বর্ষণ করিতে লাগিল। দুল্লভচাঁদ ঈষদ্ হাস্য করিয়া কেব্‌লার বাক্য সকল অনুমোদন করিলে কেব্‌লা স্বশরীরে স্বর্গলাভ করিল এবং অচিরে দুল্লভচাঁদ

প্রদত্ত মক্কেলকে আক্কেল দিয়া কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা লাভ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দুর্ল্লভচাঁদ জলযোগার্থে উপবেশন করিয়া একে একে টিফিন বাক্সের বারটি কাটরা বাহির করিলেন। নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে সেইগুলি পরিপূর্ণ। বাজারের ভেজাল খাদ্য ব্যবহার করিলে দুর্ল্লভচাঁদের হজম হয় না সেই জন্য শ্রীমতী লতিকাদেবী স্বহস্তে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া কাছারিতে আসিবার সময় স্বামীর সহিত প্রত্যহ পাঠাইয়া দিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক হইল ভাবিয়া আনন্দে সমস্তদিন অতিবাহিত করে। কোন কোন দিন কিছু অভুক্ত থাকিলে তাহারও কারণ জিজ্ঞাসা করত স্ত্রীজনসুলভ কৌতুহলপ্রিয়তা নিবারণ করিত। অবশ্য দুর্ল্লভচাঁদের এসব বড় ভাল লাগে না। খাই নাই খাই নাই—তার আবার কারণ কি? ভাল লাগে নাই, তাই খাই নাই। এই সামান্য কথাটা পত্নী বোঝে না ইহা দুর্ল্লভচাঁদের কম আক্ষেপের বিষয় নয়। এত বড় কথাটা শ্রীমতী লতিকাদেবী বুঝুন বা না বুঝুন কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন দেখিয়া বোধ হয় তিনি তাহার স্বামীর পাকস্থলীর পরিমানটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিজ্ঞানবিদ্ পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা বলেন যে আহারের সময় নানা প্রকার কথাবার্ত্তার অবতরণা করা উচিৎ। দুর্ল্লভচাঁদের এ মতটা বিশেষরূপ জানা ছিল। বাল্যকালে দুর্ল্লভচাঁদ কোন কোন প্রসিদ্ধ বিলাতি ভোজের পর বক্তাদিগের বক্তৃতা সকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। সময়ে সময়ে বনভোজনের পর দুর্ল্লভচাঁদ সেই সব বক্তৃতাগুলি আবৃত্তি করিয়া সঙ্গীদিগকে নিজের ইংরাজির উপর কতটা দখল আছে তাহার পরিচয় দিতেন। কথিত আছে একদা দুল্লভচাঁদ চুচুড়ায় একটি বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রী হইয়া কন্যার পিতার বাড়ীতে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তবে শুনা যায় আহারান্তে দুর্ল্লভচাঁদ যখন অনর্গল ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন, চুচুড়ায় চৌমাথায় কতকগুলি দুষ্টবালক শিয়ালের ন্যায় চীৎকার করিয়া তাহাদিগের অসভ্যতার পরিচয় দেয়। তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার মানসে দুর্ল্লভচাঁদ বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। মূর্খ বালকেরা বুঝিল না ক্ষতি কাহার হইল। সে যাহা হউক দুর্ল্লভচাঁদ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার সহিত খাদ্য দ্রব্যগুলিকে উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। তাহার কথায় বড় কেহ প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু উকিলদিগের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সরোজমোহন বাবু দুল্লভচাঁদের দুই একটা কথার প্রতিবাদ করিবার প্রয়াস করিতে একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। মক্কেলেরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীমতী লতিকাদেবীর সযত্নে নির্ম্মিত

কয়েকখানি নিম্‌কি শীঘ্র মুখে নিক্ষেপ করিয়া চুল্লভচাঁদ টেবিলে সজোরে আঘাত করিয়া জলদপ্রতিমস্বনে কহিলেন—"শুনুন সরোজবাবু—এটা মনে রাখ্‌বেন যে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবেন। সংস্কৃত শিক্ষা আজ কালকার দিনে আরে চলে না। আজকাল কতকগুলি শিক্ষানবিশের এ একটা এ—এ অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে "fad" বলে। ও সব "theory', অনেকদিন "exploded" হয়ে গেছে। এইটা মানেন ত বর্ত্তমান অতীত নয়, অতীত বর্ত্তমান নয়। স্ত্রী জীবনের সহচরী অর্থাৎ যাকে ইংরাজিতে "partner in life" বলে। স্বামীর সঙ্গে তাহার সহানুভূতি অর্থাৎ "sympathy" থাকা চাই। আমাদিগের কি অবস্থা বলুন দেখি। বাড়ীতে থাকিবার কোন "attraction" নাই। সেই সব পুরাতন, নূতন কিছুই নাই। সেই একটা নিরক্ষর বালিকার সহিত অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন গল্প। স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্বের অভাবে বাঙ্গালার জীবনস্রোত এত ক্ষীণ। য়ুরোপের উন্নতি স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্ব ও ক্লাবলাইফ।" এমন সময়ে একটি মক্কেল আসিয়া খবর দিল যে মামলার ডাক হইয়াছে, চুল্লভচাঁদ তাড়াতাড়ি বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়া শীঘ্র গমন করিলেন।

(৩)

পাঁচটার সময় চুল্লভচাঁদ যখন গাড়ীতে উঠিতেছেন এমন সময় আশু জিজ্ঞাসা করিল "কিহে, আজ বৌবাজারে আস্‌ছো ত?" চুল্লভচাঁদ "আস্‌বো বইকি" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। চিৎপুরের জনতা ভেদ করিয়া চুল্লভচাঁদের গাড়ী গৃহাভিমুখে গমন করিল। যথা সময়ে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চুল্লভচাঁদ নিজের গৃহে যাইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অন্য দিনের ন্যায় গৃহটি সযত্নে পরিষ্কৃত করা হয় নাই। কাপড় চোপড় নানাদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। পত্নী লতিকার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া মনে মতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এমন সময় বৃদ্ধা পিসিমাতাঠাকুরাণী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে বেলা বারটার সময় বৌমা তাহার ভ্রাতা প্রতাপের সহিত বহরমপুরে যাত্রা করিয়াছেন। বৌমার মার হঠাৎ জীবন সংশয় অসুখ হইয়াছে। তোমাকে সংবাদ দিবার সময় না থাকায় পিসিমার অনুমতি ক্রমে বৌমা পিত্রালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। চুল্লভচাঁদ পিসিমাতাকে মাতার ন্যায় সম্মান করিতেন। অতএব পিসিমা যখন অনুমতি দিয়াছেন তখন চুল্লভচাঁদের বলিবার আর কিছুই নাই। হঠাৎ কি অসুখ হইয়াছে তাহা তাড়াতাড়িতে পিসিমা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

ডুল্ল্ভচাঁদ আফিসের বেশ পরিবর্ত্তন করিবার সময় ছোট খাট অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ করিলেন। অনুপস্থিত পত্নীর উপর বিরক্ত হইলেন।

কাপড় ছাড়িয়া ডুল্ল্ভচাঁদ পাঠাগারে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ ডুল্ল্ভচাঁদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। তাহার বোধ হইল কি একটা অভ্যাসের ব্যতিক্রম হইয়াছে। কিন্তু সেটা কি তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। একখানি বই লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন কিন্তু মনোসংযোগ দিয়া পাঠ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ছাতের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। উপরে নির্ম্মল আকাশ। আকাশের দিকে চাহিলেন। আজ তাহার অন্তর আকাশের ন্যায় শূন্য। ডুল্ল্ভচাঁদ বৌবাজারে যাওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু মন কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না। ডুল্ল্ভচাঁদ ভাবিলেন যে এ প্রকার অশান্ত মন লইয়া সঙ্গীগণকে বিরক্ত করা স্বার্থপরতার চিহ্ন। যে মনুষ্য নীরবে শোক বহন করিতে পারে না সে অত্যন্ত অপদার্থ ও মানব নামের কলঙ্ক। আমার শোক আমি একাকী বহন করিব। সঙ্গীগণের নির্ম্মল আনন্দে বিষাদের রেখা পাত করা আমার পক্ষে উচিত নয়। আর এক কথা—নীরবতাই শোকের ভাষা। অতএব ডুল্ল্ভচাঁদ বৌবাজারে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

(৪)

রাত্রে আহারে বসিয়া ডুল্ল্ভচাঁদ লুচি কিছু শক্ত পাইলেন। তরকারিগুলি অধিক লবণাক্ত বলিয়া বোধ হইল। দুইটি সুবৃহৎ কাল কাল চক্ষুর অভাবে আজ ডুল্ল্ভচাঁদের আহারে তত মনোযোগ দেখা গেল না। পাচকঠাকুর ও চাকরাণী বিনাকারণে তিরস্কৃত হইয়া বৃদ্ধা পিসিমাতাঠাকুরাণীর নিকট তর্জ্জন গর্জ্জন করত তিরস্কারের কতটা অংশের প্রতিশোধ লইল।

বৃদ্ধা পিসিমা ডুল্ল্ভচাঁদকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। তাঁহার নিজের কোন সন্তানাদি হয় নাই। অতএব ডুল্ল্ভচাঁদ তাঁহার নয়নের তারা। ডুল্ল্ভচাঁদের ভাল আহার হয় নাই শুনিয়া তিনিও পাচকঠাকুরকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। অবশেষে নিজের আহারের ফল মূল হইতে ভাল ভাল জিনিস বাছিয়া লইয়া একটি রেকাবে করিয়া ডুল্ল্ভচাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ডুল্ল্ভচাঁদ তখন পাঠাগারে অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ পিসিমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তোষের অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ পিসিমাতার দরজায় আঘাত না করিয়া কিম্বা কোন

প্রকার সাড়া শব্দ না দিয়া ঘরে প্রবেশ করা অন্যায় হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পিসিমা তাহাকে এতদূর নির্ব্বোধ ভাবিয়াছেন যে আহার করিতে বসিয়া তিনি ক্ষুধা থাকিতে উঠিয়াছেন। কিন্তু বাহিরে কোন প্রকার অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেন না। পিসিমার অনেক অনুরোধে দুর্ল্লভচাঁদ কিছু খাইলেন। দুর্ল্লভচাঁদের শয়নাগারে যাইবার পথে পিসিমার ঘর। পিসিমা চাকরাণীকে নানা প্রকার বুঝাইতেছেন ও বলিতেছেন যে বৌমা না থাকার দরুণ যত গোলমাল হইয়াছে। বৌমা না থাকিলে দুর্ল্লভচাঁদের অনেক ছোটখাট অসুবিধা হয় সেই জন্য মেজাজ ভাল থাকে না। একসঙ্গে থাকিতে হইলে অনেক প্রকার সহ্য করিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিসিমার কথা শুনিয়া দুর্ল্লভচাঁদের কিছু চিন্তা হইল। শুইবার ঘরে যাইয়া দুর্ল্লভচাঁদ বিছানায় না শুইয়া এক আরাম কেদারায় বসিলেন। দুর্ল্লভচাঁদ ভাবিলেন আজ তাহার ব্যবহারে গরীব পাচক ও চাকরাণীর মনোকষ্ট হইয়াছে। পত্নী লবঙ্গের পিত্রালয়ে গমন এই সকল ব্যাপারের কারণ বলিয়া পিসিমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিসিমা তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন আর পাচক ও চাকরাণীকে সেই প্রকার বুঝাইয়াছেন। দুর্ল্লভচাঁদের মনে মনে নিজের উপর ঘৃণা হইল। তিনি বাল্যকাল অবধি স্ত্রৈণ ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গীদিগকে চিরকাল বুঝাইয়াছেন যে জীবনে তাঁহার অদৃষ্টে যত অপবাদ ঘটুক ইহা নিশ্চিত যে কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিতে পারিবে না। সাহিত্যে বঙ্কিম-বাবুর অত্যন্ত ভক্ত হইয়াও দুর্ল্লভচাঁদ বিষবৃক্ষ একবার বই দুইবার পড়েন নাই কারণ বন্ধুগণ সতীশবাবুকে স্ত্রৈণ বলাতে তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ল্লভচাঁদ নিরপেক্ষ সমালোচক। তিনি অপরের কার্য্য সকল যে প্রকার কঠিনতার সহিত সমালোচনা করেন নিজের বিষয়েও সেই প্রকার। আজ পর্য্যন্ত জানিয়া শুনিয়া তিনি কাহারও কোন দোষের প্রশ্রয় দেন নাই। অতএব পিসিমার কথায় দুর্ল্লভচাঁদের চিন্তা হইয়াছে। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে যেমন বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচনা করেন আজ নিজের চরিত্র বিষয়ে তিনি সেই প্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টের সহিত দুর্ল্লভচাঁদ স্বীকার করিলেন যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বৃদ্ধা পিসিমার ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিযুক্ত নহে। আজ তাহার মনের এই প্রকার ভাবের কারণ কি? দুর্ল্লভচাঁদ ব্যাকুলনেত্রে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সকল জিনিষই সুপরিচিত।

দুল্লভচাঁদ ক্ষিপ্রহস্তে আলমারি খুলিলেন,—দেখিলেন পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে। লবঙ্গ যাইবার সময় একটিও জিনিষ লইয়া যায় নাই। চাবি দিয়া পত্নীর হাত বাক্স খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে জিনিষ পত্র নাড়িতে লাগিলেন। জিনিষগুলি নাড়িতে নাড়িতে বোধ হইল নির্জ্জীব পদার্থগুলি সহসা সজীবতা লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের নীরব ভাষা দুল্লভচাঁদের হৃদয়ঙ্গম হইল। তাহারা দুল্লভচাঁদের মনে পূর্ব্বের কথা সকল জাগরূক করিয়া দিল। দুল্লভচাঁদ আস্তে আস্তে সকল জিনিষগুলি যথা স্থানে রাখিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

চিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে দুল্লভচাঁদ নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। বিছানায় শুইয়া দুল্লভচাঁদ ভাবিলেন হায়! আমার নির্দ্দয় ব্যবহারে লবঙ্গ কত কষ্ট পাইয়াছে, তাহাকে একাকিনী রাখিয়া আমি কতবার বৌবাজারে অর্দ্ধেক রাত্রি কাটাইয়া আসিয়াছি। লবঙ্গ ফিরিয়া আসিলে ভবিষ্যতে আর তাহাকে এই প্রকার কষ্ট দিব না। এই প্রকার প্রতিজ্ঞায় দুল্লভচাঁদ কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন এবং অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

(৫)

পরদিন সকালে যথা সময়ে দুল্লভচাঁদ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। আহারাদি করিয়া কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। কাজ কর্ম্মে তত মনোযোগ দিতে পারিলেন না। কেবলা উকিলমহাশয় দুল্লভচাঁদের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আর কোন প্রকার রহস্য করিতে সাহস করিল না।

শীঘ্র শীঘ্র কাছারির কাজ সারিয়া দুল্লভচাঁদ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ভৃত্য রামচরণ আসিয়া তাহাকে একখানি পত্র দিল। শিরোণামা দেখিয়া দুল্লভচাঁদ তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রখানি বলা বাহুল্য শ্রীমতীলবঙ্গ দেবীর।

"দুপুর বেলায় যখন তুমি কাছাড়িতে গে'ছ প্রতাপ আসিয়া খবর দিল যে মার বড় ব্যায়রাম। তোমায় খবর দিতে গেলে ট্রেনের সময় থাকে না। সেই জন্যে তাড়াতাড়ি না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা আছেন ভাল। চিন্তার কারণ নাই। আসছে রবিবার আমি যাইব। ষ্টেসনে গাড়ী পাঠাইয়া দিও। পারত তুমি নিজে এস।" ইতি—

সেবিকা লবঙ্গ

দুর্লভচাঁদ একবার, দুইবার, তিনবার করিয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। পত্রখানি তুলিয়া লইয়া আবার পড়িলেন। বাহিরের লোক সে সময়ে কেহ দুর্লভচাঁদকে দেখিলে অনুমান করিত যে পত্রখানিতে এমন কোন দুরুহ ব্যাপার সন্নিহিত হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য দুর্লভচাঁদ তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছেন না। বাহিরের লোক দেখিলে কি অনুমান করিবেন তৎকালে দুর্লভচাঁদ সে বিষয়ে সংজ্ঞাহীন ছিলেন। দুর্লভচাঁদ পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন।

পত্রখানি কয়েকবার পাঠ করিয়া দুর্লভচাঁদের তৃপ্তি হইল না। দুর্লভচাঁদের বোধ হইল পত্রখানিতে দুই একটা প্রিয় সম্ভাষণ থাকিলে অতি সুন্দর হইত। দুর্লভচাঁদ নগ্ন সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী কোন কালে ছিলেন না। তাহার কাছে বিপুল অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা সযত্নরক্ষিত বাগানের সৌন্দর্য্য মনোহর বলিয়া বোধ হইত। দুর্লভচাঁদ বন্ধুদিগকে বলিতেন যে নিরাভরণা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে কবির চক্ষু দরকার। তিনি ত আর কবি নন। বন্ধুগণ ভরসা করিয়া একথার প্রতিবাদ করিতে পারিত না। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে দুর্লভচাঁদের অন্য প্রকার মত ছিল। তিনি বলিতেন মানবের ভাষা ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য নহে। ভাষার উদ্দেশ্য ভাব গোপন করা। নবপরিণীতা লতিকা দেবী যখন প্রেমের নবোন্মেষে স্বামীকে "প্রিয়তমে" ও "প্রাণেশ্বর" ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিত তখন দুর্লভচাঁদ তাহাকে বটতলার লেখিকা বলিয়া উপহাস করিতেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে লতিকাদেবী এই প্রকার উপহাসে বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে যদিও তাহার বাপের বাড়ীর বাহিরের প্রাঙ্গনে একটা বটগাছ আছে তিনি কিম্বা তাহার আর সব ভগ্নারা কখন সেখানে বসিয়া কোন লেখা পড়া করে নাই। উপরোক্ত দুর্লভচাঁদকে পত্র লিখিবার সময় তিনি ছাদের উপর বসিয়া লিখিতেন। পত্নীর কথা শুনিয়া দুর্লভচাঁদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বটতলার সম্বন্ধ রহস্য বুঝাইয়া দিয়া দুর্লভচাঁদ বলিয়াদিলেন যে পত্রে যত "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বর" থাকিবে তত প্রেম যে গভীর হইবে এ প্রকার নহে। প্রেমের ভাষা নীরব। প্রেম কেবল হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়। দীন হীন মনুষ্যভাষায় প্রেম প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা ভেলায় সমুদ্র পার হওয়ার সমান। সরলা-পত্নী সকল কথা বুঝুক আর না বুঝুক এই কথা বুঝিয়াছিলেন যে "প্রিয়তমে," "প্রাণেশ্বর" ইত্যাদি কথা তার স্বামীর ভাল লাগে না। অতএব পত্র লিখিবার

সময় তিনি আর ও সব কথাগুলি লিখিতেন না, যদি ভুলক্রমে লিখিতেন তাহা মুছিয়া বা কাটিয়া দিতেন।

রবিবারে যথা সময়ে শ্রীমতী লতিকাদেবী ভ্রাতা সমভিব্যহারে শিয়ালদহে আসিলেন। দুর্ল্লভচাঁদ ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

গৃহে আসিয়া দুর্ল্লভচাঁদ একথা সেকথা করিয়া প্রায় দুইঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিলেন। আজ কয়েক দিন পরে দুর্ল্লভচাঁদের মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইয়াছে। সন্ধ্যার পর আহার করিয়া দুর্ল্লভচাঁদ ছড়ি হাতে করিয়া বহির্গত হইলেন। সিড়িতে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাচ্ছ"। দুর্ল্লভচাঁদ বলিলেন "বৌবাজারে। অনেক দিন যাই নাই। দেখে আসি তাহারা কেমন আছে।" নবোদিত চন্দ্রের উপর একখানা কালমেঘ আসিলে যেমন মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার হয় সেইরূপ লবঙ্গের বদনকমলে একটী বিষাদ রেখা দেখা দিয়া অদৃশ্য হইল। দুর্ল্লভচাঁদ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে বৌবাজারে যাইয়া অর্দ্ধঘণ্টা কালের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে সেদিন তাহার ফিরিতে রাত্রি দুইটা হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ

(৩)

সৌন্দর্য্যের কবি

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্ এ, বি এল,)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে প্রাকৃতিক সৌন্দার্য্যের লীলা বৈচিত্র্য প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কল্পনা ''অরুণ-ধুসর পথে" ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হয় নাই "সন্ধ্যা-ধুসর পথে"ও বিচরণ করিয়া আলোক আঁধারের রহস্য উদঘাটন করিয়াছে।

"আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

কবির বিরাট কল্পনায় অন্ধকার আকাশ-জোড়া পাখা বিস্তার করিয়া দিবসের শেষে স্বর্ণালোক ঢাকিয়া ফেলে।

অন্যত্র— "নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখাসম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিম প্রান্তর পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে।—" (শেষ শিক্ষা)

উষার ম্লান আলোর উন্মুক্ততা আছে কিন্তু সন্ধ্যার স্বর্ণালোকে দিবসের অভিনয় সমাপ্ত হয়, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়িয়া যায়।

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোলপর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা!" (অশেষ)

স্বর্ণাঞ্চলে আবৃত—দেহ সন্ধ্যার মানস-চিত্র এমন নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে কবি-কল্পিত বলিয়া মনে হয় না। দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ "তন্দ্রালস" এই একটি মাত্র কথায় কেমন চিত্রাকারে আঁকিয়া তুলিলেন। প্রকৃতি অচেতন জড়-পিণ্ড নহে।

গোষ্ঠে যখন— "সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি„ (উর্ব্বশী)

তখন কে বলে প্রকৃতির চেতনা-শক্তি নাই? প্রকৃতির অন্তরে জড়তা নাই—জড়তা আমাদের হৃদয়ে। হৃদয়ের অসাড়তা দূর হইলে যেখানেই থাকি না কেন সন্ধ্যা গগণের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে,—

"নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।" (দিন শেষ)

সন্ধ্যাকালীন প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের নানাস্থানে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আসিতেছি,

"সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে" (হৃদয়ের ভাষা)

কিন্তু কয়জন সূর্য্যাস্তে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি?

"—পশ্চিমের তীরে
ধান্যক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে,—
পূর্ব্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা,
জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা ;
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর
কর্ম্ম-অবসান-ধ্বনি অজ্ঞাত পল্লীর।" (শুশ্রূষা)

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া এখন বোধ হইতেছে "সুনীলসাগরে" যে তপন নেমে যায় তাহা কবি-কল্পিত। বাঙ্গালাদেশের ধান্যক্ষেত্রে যে রবি অস্ত যায় তাহাই প্রকৃত। কল্পনার সূর্য্য আমাদিগকে চতুষ্পার্শ্বিক অবস্থার কোন খবর দেয় না। ভাসাভাসা একটা ভাব আমরা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি। ধান্যক্ষেত্রের রবির সঙ্গে কিন্তু আমাদের কেমন একটা আন্তরিকতা আছে। কবি সেইজন্য তাহার বিদায়ের চিত্রে সমস্ত পল্লীদৃশ্য প্রতিফলিত করিয়াছেন। উপমার জগতে যে রবি অস্ত যায় তাহার চিত্রে এরূপ সুন্দর বর্ণবিন্যাস সম্ভবে না।

"গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত অচলের ঘাটে,—তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।"

(পরিশেষে)

দূরের দৃশ্যে যতটা সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করা যায় কবি উপমার সাহায্যে তাহাই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে চিত্র অস্বাভাবিক হইত। সন্ধ্য কিরণে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সময়ে সময়ে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে। দিনের চিতা যখন সন্ধ্যার কূলে ধূ ধূ জ্বলিতে আরম্ভ হয় দিক্‌বধূর ব্যথিত হৃদয় গলিয়া বাহির হইতে থাকে।

"ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বর তল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,—" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

আবার দিক্‌বধূ যখন স্বপ্ন দেখে,—

"তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।" (পরশ-পাথর)

হর্ষ বিষাদের দুইখানি প্রকৃত কবিত্বময় চিত্র। ভাবের সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কবি বোধ হয় সোনার তুলিকা দিয়া ছবি দুইখানি আঁকিয়াছেন। যাহার সহানুভূতি আছে সে প্রকৃতির সুখ দুঃখ বুঝিতে পারিবে। কবির সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্টতা খুব বেশী তাই তিনি তাহার অন্তরের কাহিনী কাব্যের ভাষায় অনুবাদ করিতে পারেন। সন্ধ্যালোকে আরও কয়েকখানি সুন্দর ছবি রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন।

"গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম মাঠ পারে,—" (পণ-রক্ষা)

চিত্রে সন্ধ্যার বৈরাগ্যভাব সূচিত হইয়াছে। "পশ্চিম মাঠ পারে—"বাঙ্গালা-দেশের পশ্চিম মাঠ। অন্যত্র,—

"জনশূন্য নদীতীর, অস্তগামী রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—" (শৈশব সন্ধ্যা)

সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্যালোকে কেমন একটু মলিনতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেটুকু অনেকবার বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু এস্থলে আলো শুধু ম্লান নহে, রবির বিরহে তাহার দশা কি হইবে এই ভাবিয়া মূর্চ্ছাতুর হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের সময় পূর্ব্ব-গগণে চন্দ্রোদয় কবে হইতেছিল তাহাও কবি লক্ষ্য করিয়াছেন।

"একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য্য নিতেছে ছুটি ;
পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমা-চাঁদ করিতেছে উঠি উঠি,— (প্রকাশ)

কিন্তু ইহা চিত্র নহে—কাগজের উপর কলমের রেখাপাত। আকস্মিক ঘটনা টুকিয়া রাখা মাত্র। কবিতাও সেইজন্য নীরস গদ্যবৎ হইয়াছে। ভাবের বিশালতায় গৌরবান্বিত চিত্র জগতের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যেই পাওয়া যায়।

"তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্ব-মন্দিরে
এল আরতির বেলা।" (সন্ধ্যা)

কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র! ভাবের বিশালতা ও গম্ভীরতা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া কবিতাকারে পরিস্ফুট।

পৌরাণিক চিত্র।—বাঙ্গালি কবির কল্পনা সাধারণতঃ পৌরাণিক কাব্য-মন্দির হইতে চিত্র সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেকে দু'একখানা সুন্দর ছবির নকল করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মধুসূদন দত্তের ন্যায় সারি সারি কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র পাঠককে উপহার না দিয়া তৃপ্তি বোধ করেন না।

"প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে, দীর্ঘ-নিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্ম্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দির তলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিনী
সান্ত্বনা সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী"—

(প্রেমের অভিষেক)

প্রেমের অমরাবতী হইতে সংগৃহীত এই পাঁচখানি চিত্র রবীন্দ্রনাথ, পাঁচখানি কাব্যের ভাব ছাঁকিয়া লইয়া তুলিকার উপযোগী ঘন বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন।

"গান্ধারীর আবেদন" নামক নাট্যকাব্যে কয়খানি সুন্দর চিত্র আছে। "গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র," "গান্ধারী ও ভানুমতী," "গান্ধারী ও দ্রৌপদী"—তিনখানি সুন্দর ভাবের চিত্র। প্রথম চিত্রে আদর্শ আর্য্য-মাতা রাজ-পদতলে "সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে" বিচার প্রার্থনা করিতেছেন। অপরাধী—পুত্র দুর্য্যোধন। ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধন প্রস্থান করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র পিতৃস্নেহে অন্ধ, গান্ধারীর আবেদন গ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাহা হইলেও তাঁহার হৃদয় "পরিতাপ-দহনে" জর্জ্জরিত

"মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি! দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্ম্মে করহ সম্মান,—ত্যাগ কর
দুর্য্যোধনে!
ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপ-দহনে জর্জ্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী!"

নায়ক নায়িকার মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে গান্ধারীর সমুন্নত চরিত্রের ও ধৃতরাষ্ট্রের পরিতপ্ত হৃদয়ের ইতিহাস তাহাদের মুখের রেখায় রেখায় উজ্জ্বল বর্ণে মুদ্রিত রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে আদর্শ আর্য্য-শ্বশ্রূ নব অলঙ্কারে ভূষিতা বধূমাতাকে উপদেশ দিতেছেন।

"হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধ চিত্তে উপবাস ব্রত
কর আচরণ,—বেণী করি উন্মোচন
শান্ত মনে কর বৎসে দেবতা অর্চ্চন!
এ পাপ-সৌভাগ্যদিনে গর্ব্ব-অহঙ্কারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়োনাক বিধাতারে!"

তৃতীয় চিত্রে বনগমনোন্মুখ পাণ্ডবগণ গান্ধারীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন। গান্ধারী দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দ্রৌপদীর অবস্থা দ্বিতীয় চিত্রে ভানুমতীর বেশ-ভূষার সহিত তুলনার যোগ্য।

"জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চ পতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলঙ্কার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি' ভাগ্য-অহঙ্কার
ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচী মুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে,—বিদ্ধ হ'ত বুকে
কুরুকুল কামিনীর—সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে!"

ইহা ভানুমতীর চিত্র—"সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।" দ্রৌপদী—অক্ষয় সম্পদ হারাইয়া—"ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা"।

"কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" নামক নাট্যকাব্যে দুইখানি সুন্দর চিত্র আছে। প্রথম চিত্র যখন অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে কর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিতেছেন তখনকার চিত্র। যবনিকার অন্তরালে নারীগণের মধ্যে বাক্যহীনা কুন্তী—অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধায় জর্জ্জরিতা। কৃপ কর্ণকে কহিতেছেন যে তাঁহার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অধিকার নাই আরক্ত আনত মুখে কর্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এমন সুন্দর ভাবপ্রকাশক চিত্র খুব কম দেখা যায় চিত্রকরের তুলিকা কি এ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে?

"আজো মনে পড়ে
অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্ব্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মত।
যবনিকা অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহ ক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জ্জর বক্ষে? কাহার নয়ন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে দিল আশিষ-চুম্বন?
অর্জ্জুন—জননী সে যে! যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জ্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার,"—
আরক্ত আনতমুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে,—সেই লজ্জা আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিণী? অর্জ্জুনজননী সে যে!"

কৃপাচার্য্যের মুখে বিদ্রূপের হাসি টুকু পর্য্যন্ত কবি লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ণের "লজ্জা-আভাখানি" তুলিকার সাহায্যে যে চিত্রকর ফুটাইয়া বাহির করিতে পারেন তাঁহার চমৎকার শিল্প কৌশল যে অতুলনীয় তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় চিত্রে কর্ণ কুন্তীকে বলিতেছেন,—

"মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব!
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষ্যা নাহি করি কারে!"—

কর্ণ-চরিত্র এই কয়টি কথায় কেমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে! কর্ণের অন্তরের ভাব সে সময়ে তাঁহার মুখে যে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া ছিল তাহা চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব। কবির চিত্রাঙ্কণ-শিল্প বাস্তবিক চিত্রকরের শিল্পকলা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তুলিকার মৌন ভাষা অনেক সময়ে অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। কাব্য কলার আদর সেই জন্য বোধ হয় আমাদের দেশে দিন দিন বাড়িতেছে। চরিত্র-চিত্রনে ভাষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে গল্পপ্রিয় পাঠককে বুঝাইতে হয় না। বাচালতাময় বাঙ্গালি জগতে এখনও চিত্রবিদ্যার মাহাত্ম্য বুঝিবার সময় আসে নাই। বাঙ্গালির কল্পনা আজকাল যে সকল পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিতেছে তাহাতে চরিত্রের সৌন্দর্য্য তুলিকার স্পর্শে পরিস্ফুট হইতেছে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইজন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিত্রকরদিগের প্রতিভাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সৌন্দর্য্যের কবির পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে!

বিবসনা।—সৌন্দর্য্যের কয়েক খানি নগ্ন-চিত্র রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ আধুনিক শিক্ষিত রুচির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এই নগ্ন-সৌন্দর্য্যের আদর্শ যে তিনি প্রতীচ্য চিত্রশালা হইতে কতকটা সংগ্রহ করিয়াছেন এরূপ অনুমান করা যায়। চিত্রগুলি অতীন্দ্রিয় ভাবের বিকাশ মাত্র। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণে—"লাজহীনা পবিত্রতা", স্তন—"নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির," "জননী-লক্ষ্মীর কমলাসন।" মুক্ত বেণী বিবসনা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!"

"হৃদয়-আসন," "স্তন," "অঞ্চলের বাতাস," "চুম্বন" প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচক বলেন যে এই ধরনের কবিতা "কমল-বিলাসী" কবিদিগের বিলাসপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। আবার অনেকের মতে এই কবিতা-গুলিতে "কামগন্ধ" একেবারে নাই। বিবসনা "বিজয়িনী"র সম্মুখে যখন স্বয়ং অনঙ্গদেব "নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে নতশিরে" অস্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের আদর্শের নিন্দা করিলে চলিবে কেন? তা ছাড়া শিক্ষিত বাঙ্গালির বেশ-ভূষা

সম্বন্ধে রুচির কথা ভাবিয়া দেখিলে কবির নগ্ন সৌন্দর্য্যের চিত্রে যে সেই রুচি অল্প বিস্তর প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়। বাঙ্গালি যতটা নগ্নতার-পক্ষপাতী বোধ হয় অপর কোন জাতি ততটা নয়। বাঙ্গালি বাবু ঢাকাই কাপড়ের স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া নিজের দেহের লাবণ্য অনাবৃত করিয়া দেখাইতে ভালবাসেন। তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে, অন্তঃপুরে, বৈঠকখানায় নর নারীর আলেখ্য নগ্নতার সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করে। প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত নগ্নমূর্ত্তি আজকাল ধনী বাঙ্গালির অত্যাবশ্যক আসবাব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে দরিদ্র সে ও পাশ্চাত্য বণিকের বিজ্ঞাপন হইতে নগ্ন ছবিটুকু কাটিয়া লইয়া ফ্রেমে বাঁধাইয়া ঘর সাজাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে বাঙ্গালির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা উচ্চভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার ব্যাপকতার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালি জগতে যখন যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার প্রতিভা তাহা কাব্যাকারে পরিণত করিয়াছে।

নগ্নতা সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক অবস্থা। বস্ত্রাভরণে সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক ভাস্করগণের এই আদর্শের অনুকরণে আধুনিক প্রতীচ্য চিত্র-শিল্প সৌন্দর্য্যকে আবরণের বন্ধনী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। যাহা ক্ল্যাসিক্যাল নহে তাহাকেও নামমাত্র একটা অতি সূক্ষ্মাবরণে ঢাকিয়া রাখা হয়। এদেশে প্রতীচ্য শিল্পকলার আমদানির সঙ্গে নগ্ন-সৌন্দর্য্যের ভাব আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যকে অলঙ্কারের সংস্রব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় কল্পনা করা কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাজ নহে। ভাবুক না হইলে নগ্ন-সৌন্দর্য্যে আশক্তির মোহ আসিয়া পড়ে।

চিত্র-প্রদর্শনী—এমন ছবির মেলা কেহ কখন দেখে নাই! রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মন্দিরে যে কত শত সুন্দর চিত্র সঞ্চিত আছে তাহা বলা যায় না। তাঁহার কয়েকখানি মাত্র কাব্য পাঠ করিবার পর মনে হয় যেন বৃহৎ একটী চিত্র-প্রদর্শনী হইতে ফিরিয়া আসিতেছি।

প্রবাল-ঘেরা দ্বীপ— "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর বিহঙ্গেরা।"

পাহাড়-ঘেরা পল্লী— "আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।"

(ঝরণাতলা)

ঝর্‌ণাতলা—
"পরদিন প্রভাত হ'ল দেবদারুর বনে,
ঝর্‌ণাতলায় আন্‌তে বারি জুটল নারীগণে।" (ঝর্‌ণাতলা)

নিদ্রিতা উর্ব্বশী—
"হে অনন্ত যৌবনা উর্ব্বশী!
মণিদীপ-দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?" (উর্ব্বশী)

অভিসার—
"নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবন মদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ"— (অভিসার)

যমুনা-তট—
"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
উর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।" (নিষ্ফল উপহার)

বরুণার তীর—
"তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে,
পূর্ব্ব বনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।" (পরিশোধ)

পুরনারী—
"শীতল ছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি
কাঁকণ বাজে নূপুর বাজে—চলিছে পুরনারী।"
(নিদ্রোত্থিতা)

যমুনার তীরে—
"নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর"— (গুরুগোবিন্দ)

নীল সরোবর—
"চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক নির্ম্মল স্বচ্ছ—" (মানস-ভ্রমণ)

অরুণোদয়—
"—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়—"

অগ্নিকাণ্ড—
'কুটীর হইতে কুটীরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।
ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়—লোলুপ রসনা" (সামান্য ক্ষতি)

সমুদ্রের তটে একখানি গ্রাম— "সমুদ্রের তটে

ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্ব্বত সঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরি মধ্য পথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি আসে, কোন মতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া"— (মানস-ভ্রমণ)

অবগাহন— "সরসীর

প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী"— (বিজয়িনী)

এইখানি "বিজয়িনী" পর্য্যায়ের প্রথম চিত্র।

মদনের প্রতীক্ষা— "মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে

লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়-প্রান্ত লুণ্ঠীত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী-মালা কুঞ্চিত-কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দর
তরুণীর স্নানলীলা—অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।" (বিজয়িনী)

এইখানি বিজয়িনী পর্য্যায়ের দ্বিতীয় চিত্র। তৃতীয় চিত্র—"স্নানান্তে।"

"জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী"—(বিজয়িনী)

এই চিত্রখানিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যে গুণপনা দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

শেষ চিত্র—"বিজয়িনী"। "ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে
ক্ষণকাল তরে।
পরক্ষণে ভূমিপরে
জানুপাতি' বসি', নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনদানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।" (বিজয়িনী)

"বিজয়িনী" একখানি সম্পূর্ণ চিত্র-কাব্য। নির্ব্বাক সৌন্দর্য্যের বিশ্বজয়ী ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকৌশলে দেখাইয়াছেন।

বর্ণে ভাবের আভাস—বর্ণের সহিত মনস্তত্ত্বের যে কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। দর্শনেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা উপশিরায় বর্ণ অলক্ষিত ভাবে এমন এক শক্তি সঞ্চারিত করে যাহার প্রভাব হৃদয়ের অন্তঃপুরে অনুভূত হইয়া থাকে। "ধরনীর শ্যাম শোভা" কেবল যে নয়নানন্দকর তাহা নহে। শ্যামবর্ণ অন্তরের মধ্যে কত সুখের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়; কত আশার চিত্র আঁকিতে থাকে। "নীলাকাশের" নীলবর্ণে নীরবতার আভাস পাওয়া যায়। "কালোমেঘে ঘনিয়ে উঠে সজল ব্যাকুলতা।" সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ণের ভিতর দিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভাবের বৈচিত্র্য কেবল যে বর্ণ বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে তাহা নহে। একই রঙ্ বস্তুভেদে অর্পিত হইয়া নানাপ্রকার ভাবের সৃষ্টিকরে। "কাজল চোখের করুণ আঁখিজল" হৃদয়ের একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে। "দীঘির কালো জলে" কেমন এক ভাষাহীন শান্তি আছে বলিয়া মনে হয়। "নীল জলে" গভীরতার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। "তরুছায়া মসীমাখা গ্রামের" চিত্রে গাম্ভীর্য্যভাবের প্রাধান্য অনুভূত হয়। বর্ণের সঙ্গে ভাবের যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে রবীন্দ্রনাথ তাহা উত্তমরূপে জানেন। সেইজন্য তিনি বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনেক সময়ে রঙ্ ফলাইয়া থাকেন। প্রকারভেদে ভাবের অনুরূপ রঙ্ প্রস্তুত্ করিয়া তিনি অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শুধু এক নীলবর্ণে কত

তারতম্য লক্ষিত হয়। "নীল," "ঘন নীল," "ঘোর ঘন নীল" "উজ্জ্বল নীল," "নব নীল"--তাছাড়া, "ধূসর," "দূর্ব্বাশ্যামল," সিন্দুর বিন্দু," "অলক্তরাগ," "স্নিগ্ধশ্যাম," "গৈরিক," "ময়ূরকণ্ঠী," আরও কত রঙ্‌ কবির রঙ্গদানিতে আছে।

"কটা চুল নীল চক্ষু কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।"

চিত্র বিশেষে "গৌরকণ্ঠ," "শুভ্রভাল," "পিঙ্গল জটা," "রক্ত পদতল," "ভস্মলোচন" যেমন শোভনীয়, "পীত উত্তরীয়," "রক্ত পট্টাম্বর," "ধূসর কৌপীন" তেমনি মনোরম। দেহের ও বেশভূষার বর্ণ হইতে আমরা মানব চরিত্রের আভাস পাই। চরিত্র-চিত্রনে রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য চরিত্রের মূল ভাবের অনুরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। "তারকা হিরণ বরণী," "রৌদ্র পাণ্ড নীলাম্বর," "শ্যামল কূল," "নব-চম্পক আভরণ," "শ্যামল অঞ্জন;" "বসন্তী রং বসনখানি," "আঁখি দুটি কালো," "সোনার লেখা," "শ্যাম সমারোহ," "মেঘের কোণে রং ধরেছে" ইত্যাদি সৌন্দর্য্য বর্ণনায় কবি রুদ্র, মাধুর্য্য, শান্ত, কমনীয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ ভাব বিকশিত করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের চিত্রে বর্ণযোজনা করা সহজ কার্য্য নহে। কবিতায় সুর যোজনার ন্যায় ইহা যে দুরূহ ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। বর্ণ-বিভ্রাট সৌন্দর্য্যের হানি হয়, ভাব অস্পষ্ট হইয়া যায়। বর্ণের ভিতর যে গভীর রহস্য নিহিত আছে তাহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনি আষাঢ়ের প্রভাতে একদিন রবীন্দ্রনাথের সহিত বলিবেন—

"নদী পারের এই আষাঢ়ের
প্রভাত খানি
নেরে, ও মন, নেরে আপন
প্রাণে টানি।
সবুজ নীলে সোনার মিলে
[illegible] সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর বাণী—
নেরে, ও মন, নেরে আপন
প্রাণে টানি।" (গীতাঞ্জলি)

(ক্রমশঃ)

রেণুর বর।

(লেখক—জনৈক মহিলা।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২৩)

তিন দিন কত বলিতেছি ওঘরে শুতে রেণু বলে আমার ভয় করে কিছুতেই যাইতে চাহেনা। রমেশ বলিল—"তাতে আর কি হয়েছে আপনি ওসব কিছু বলিবেন্ না আবার কান্নাকাটী করিবে। দুটো পান দিনতো!" "দি বলিয়া" ভবানী চলিয়া গেল। সেই অবসরে বিছানার উপর বসিয়া ভবানী কি লিখিতেছিল তাই দেখিবার জন্য সেই বিছানায় যাইয়া বসিলেন। এবং চারিদিকে চা'হয়া কিছু দেখিতে না পাইয়া, বালিসটা তুলিতেই এক খানা খাতা দেখিয়া, আলোটা টানিয়া আনিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ভবানী পান লইয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, রমেশ তাহার বিছানায় বসিয়া খাতা দেখিতেছে, ভবানী বুঝিল সে তাহারই খাতা, লজ্জিত হইয়া বারাণ্ডায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা শুনিবার বুঝিবার লোক ত এজগতে আর কেউ নাই তাই সে, তাহার মনে যখন যাহা আসে লিখিয়া এবং নিজেই তাহা পড়িয়া সান্ত্বনা পায়, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ জানে নাই, কেহ দেখিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ রমেশ দেখিল, না জানি সে কি ভাবিতেছে, হয়ত মনে মনে কত হাসিতছে, এইরূপ নানা কথা তখন ভবানীর হৃদয়ে তোলা পাড়া করিতে ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "পান এনেছেন কি," ভবানী নীরবে পানের ডিবা রমেশের হাতে দিল। রমেশ বলিলেন "আপনার পদ্য পড়িতেছিলাম বড় সুন্দর লেখা হইয়াছে, কোন মাসিক পত্রিকায় দিলে হয়।" ভবানী বলিল তাহাতে লাভ কি, "রমেশ বলিলেন," সকলে পড়িবে এবং তৃপ্তি পাইবে, ভবানী বলিলেন "তাহাতে আমার লাভ কি" রমেশ বলিল "এমন সুন্দর পদ্য শুধু খাতায় লেখা থাকিবে, কেহ দেখিবে না?" ভবানী বলিল "না আমার সবই ওই খাতার লেখার মত থাকিবে, ভগবান আমাকে গোপনে থাকিতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন এই ভাবেই এজীবন শেষ হইয়া যাক্।" রমেশ একবার ভবানীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "অর্ঘ্য" নাম উল্লেখ করিবেন।

ভারতে সর্ব্বপ্রথম ইং ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত

দাস কোম্পানীর পেটেণ্ট

তালা-চাবি, লোহার সিন্দুক, ও আলমারী, ষ্টীল ট্রাঙ্ক,

ক্যাস-বাক্স, প্রভৃতির

সুবৃহৎ কারখানা।

এই কারখানার জিনিষ, গবর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী অফিস সমূহ, রাজা মহারাজা হইতে সাধারণ ভদ্র মহোদয়গণের দ্বারা, এই ৩৮ বৎসর যাবৎ অতি আদরের সহিত ব্যবহার হইতেছে।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে মূল্য তালিকা প্রেরিত হয়।

বিবিধ প্রকারের বাক্স।

খুব মজবুত ৪ লিবার কল লাগান।

ক্যাস বাক্স।
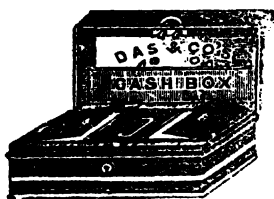
টাকাকড়ি নোট প্রভৃতি রাখিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। ভিতরে ১খানি ট্রে টাকা রেজকি পয়সা ইত্যাদি রাখিবার জন্য বিভাগ করা ও ঢাকনা দেওয়া। উপরে পালিশ করা পিতলের হাতল লাগান। বাহিরে কাল রঙের উপর সোণালী লাইন এবং হালকা রঙ করা।

ইঞ্চি	৮	১০	১১	১৪	১৬
মূল্য	১০৲	১২৲	১৪৲	১৬৲	১৮৷৷০

গহনার বাক্স।
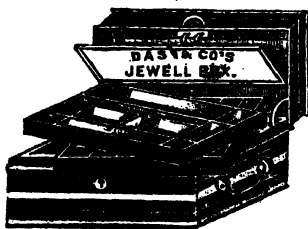
মহিলাগণের বড় আদরের জিনিষ এবং অতি আবশ্যকীয়। অলঙ্কার প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিবার জন্য ভিতরের ২খানি ট্রে বিভাগ করা আছে। দুই পার্শ্বে পালীশ করা পিতলের মজবুত হাতল লাগান। বাহিরে কাল রঙের উপর সোণালী লাইন এবং ভিতরে হালকা রঙ করা।

ইঞ্চি	১৪	১৬	১৮
মূল্য	২২৲	২৫৲	২৮৲
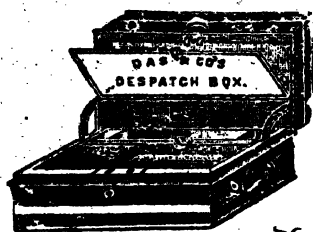
ডেস্পাচ্ বাক্স।

ভদ্রলোকের অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহারের জিনিষ। ভিতরে ১খানি ট্রে কাগজ কলম প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষের জন্য বিভাগ করা। দুই পার্শ্বে পালীশ করা পিতলের মজবুত হাতল লাগান। বাহিরে কাল রঙের উপর সোণালী লাইন এবং ভিতরে হালকা রঙ করা।

ইঞ্চি	১৬	১৮	১৯॥০
মূল্য	২২॥০	২৫৲	২৮৲

ষ্টেসনারি বাক্স।
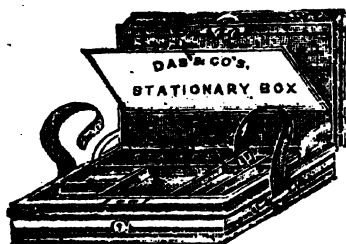
অনেক ভদ্র লোক ডেস্পাচ্ বাক্সের পরিবর্ত্তে এই নীচু সাইজের জিনিষ পছন্দ করেন। ইহার ভিতরের ট্রে খানি বিভাগ করা। হাতলের পরিবর্ত্তে চামড়ার ষ্ট্রাপ লাগান। বাহিরে কাল রঙের উপর সোণালী লাইন এবং ভিতরে হালকা রঙ করা।

ইঞ্চি	১৫	১৭
মূল্য	১৮৸০	২১৷০

অফিস ও ডিড্ বাক্স।

অফিস বাক্সগুলি হাত বাক্সর ন্যায় সেরেস্তার কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহারের পক্ষে বড় সুবিধা। ডীড্ বাক্স গুলিও দলিলাদি রাখিবার জন্য বিশেষ উপ-যোগী। ইহাদের ভিতরে ট্রে নাই। বাহিরে কাল এবং ভিতরে হালকা রঙ করা দুই পার্শ্বে মজবুত লোহার হাতল লাগান।

অফিস বাক্স—	ইঞ্চি—	১৪ × ১০ × ৫	১৬ × ১১ × ৬	১৮ × ১২ × ৭
	মূল্য—	১২৲	১৪৲	১৫৷০
ডীড্ বাক্স—	ইঞ্চি—	১৬ × ১১ × ১৩	১৮ × ১২ × ১১	১৯৷০ × ১৩৷০ × ১২
	মূল্য—	১৫৲	১৬॥০	১৮৲

ভাল কল— উপরোক্ত বাক্সর ৪ লিবার কলের পরিবর্ত্তে আর ও ভাল কল লাগাইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়, যথা—৬ লিবার কল ৩৲ এবং ডিটেক্টর কল ৬৲।

নাম লেখাই— সাদা অক্ষরে প্রতি হরপ ৴০ এবং ॥০ নিয়ে চার্জ্জ হয় না।
সোণালী অক্ষরে প্রতি হরপ ৵০ এবং ১৲ নিয়ে চার্জ্জ হয় না।

মফঃস্বলে পাঠাইবার জন্য প্যাকিং খরচা স্বতন্ত্র।

(২৪)

বলরামবাবু আহারে বসিয়াছেন, সাবিত্রী কণিকাকে ভাত খাওয়াইয়া দিতেছেন। বলরামবাবু বলিলেন, "ভবানী এলনা কেন?" মণিকে বৈকালেই পাঠিয়ে দাও। "সে যেন নিশ্চয়ই আসে।" সাবিত্রী বলিলেন তা সে কি করিবে। তোমার জামাই নানা ওজড় করিয়া আসিতে দিতেছে না। আসল কথা হচ্ছে রেণুকে রাখা জামাইয়ের উদ্দেশ্য, মা বাড়ীতে নাই, রেণু থাকে কার কাছে. কাজেই "ভবানীকে আট্‌কাইতেছে।" বলরামবাবু বলিলেন "মা বাড়ীতে নাই সেই হ'ল গোলমাল। এখন ভবানীর ওখানে থাকা ঠিক নয়। যাই হোক আজ যেন সে নিশ্চয় আসে আমার নাম করে একখানা পত্র লিখে দিয়ে মণিকে পাঠিয়ে দিও।" সাবিত্রী বলিলেন "একেত জামাই রেণু ছোট বলে পসন্দই করে না, যদি এখন মন ফিরিয়ে আবার তার অমতে জোর করে আনিলে রাগ করিবে না ত?" বলরামবাবু বলিলেন "সে তখন দেখা যাবে।" বৈকালে মণিলাল স্কুল হইতে আসিলে সাবিত্রী পত্র লিখিয়া বলরামবাবুকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং মণিলালকে পত্র দিয়া রমেশের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বৈকালে আবার মণিলালকে আসিতে দেখিয়া ভবানী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আবার এসেছ কেন, বাড়ীর সব ভালত।" মণিলাল বলিল "হ্যা সব ভাল। মামাবাবু এই পত্র দিলেন তোমাকে তিনি নিশ্চয়ই যাইতে বলিয়াছেন।" ভবানী পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্র পড়িয়া বলিল "পত্র রমেশের, তাকে দিয়ে এস।" মণিলাল বলিল "তিনি কোথায়?" ভবানী বলিল, "তাঁহার ঘরেই আছেন," মণিলাল বলিল "তবে তুমি দিয়ে এস," মণিলাল ভবানীর হাতে পত্র দিয়া রেণুর কাছে গেল, ভবানী পত্র লইয়া রমেশের গৃহে প্রবেশ করিল। ভবানী গৃহ মধ্যে গিয়া দেখিল রমেশ কপালে হাত রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন। ভবানী খাটের কাছে গিয়া ডাকিল "রমেশবাবু।" রমেশ ভবানীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া চাহিয়া বসিলেন। ভবানী বলিল "তোমাকে মামাবাবু পত্র দিয়াছেন, তুমি কি এখন ঘুমাইতেছিলে?" রমেশ বলিলেন, "হুঁ, শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না বড় মাথা ধরিয়াছে, বোধ হয় জ্বরও হইয়াছে, কই চিঠি দেখি।" ভবানী পত্রখানি রমেশের হাতে দিল। পত্র পড়িয়া রমেশ বলিলেন, 'তবে আপনারা আজই যাবেন, যান' বলিয়া রমেশ শুইয়া পড়িলেন। তখন ভবানী মহা সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, কি করি, এদিকে মামাবাবু রাগ করিতেছেন, হয়ত ভাবিতেছেন আমি ইচ্ছা করিয়াই এখানে রহিয়াছি, কিন্তু জোর করিয়া যাইতে

প্রস্তুত হইলেই একটা না একটা বিঘ্ন হইতেছে, এখন করি কি, রমেশের জ্বর হইয়াছে বাড়ীতে কেহই নাই। এঅবস্থা দেখিয়া ইহাকে একা ফেলিয়া যাওয়া উচিত হয় না এইরূপ নানারূপ ভাবিয়া ভবানী সাবিত্রীকে সব কথা লিখিয়া একবার আসিবার জন্য, মণিলালের কাছে বলিয়া দিল। মণিলাল চলিয়া যাইলে ভবানী রমেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ দেখিল। রমেশ চাহিয়া দেখিয়া চোক মুদিয়া বলিল "মাথার বড় যাতনা হইতেছে।" ভবানী বলিল 'ঘরে কি অডিকলম আছে,' রমেশ বলিলেন 'আমার টেবিলের উপর বোধ হয় আছে।' ভবানী অডিকলমের জলে কাপড় ভিজাইয়া রমেশের কপালে দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

(২৫)

মণিলাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'দিদি আসিল না রমেশবাবুর জ্বর হয়েছে, আর দিদি এই পত্র দিয়েছে।' পত্রখানি সাবিত্রীর হাতে দিয়া মণিলাল চলিয়া গেল। সাবিত্রী পত্র পড়িয়া রমেশের জ্বর হইয়াছে জানিয়া চিন্তিত মনে স্বামীর নিকট গিয়া বলিলেন, 'ওগো শুন রমেশের বড় জ্বর হয়েছে, তাই ভবানী আসিতে পারিল না।' বলরামবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,' "রমেশের জ্বর হয়েছে তা ভবানী সেখানে থেকে কি করিবে।" স্বামীর কথা শুনিয়া সাবিত্রী একটু উগ্রভাবে বলিলেন, "তোমার কথা গুলো যেন বাঁকা বাঁকা, ভবানী থেকে লাভ কি সে দায়ে পড়ে আসিতে পারিতেছে না, আমাকে কত করে পত্র লিখেছে। সত্যই ত বাড়ীতে কেউ নাই দেখে শুনে কাহার কাছে রোগা মানুষ রেখে আসিবে।" বলরামবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "যাই বল, আমার কাছে ভাল লাগে না, রমেশের কাছে আজ তুমি যাও, যদি দরকার বুঝ তুমিই বরং সেখানে থাকিও, ভবানীকে পাঠাইয়া দিও।" সাবিত্রী নানা উত্তর করিয়া সে দিন আর যাইতে সম্মত হইলেন না, স্বামীর মনের ভাব দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন, তাঁহার ভবানী কি সাধারণ মেয়েদের মত হাল্‌কা, তার মনে হইতেছিল ইনি ভবানীকে এখনও বুঝেন নাই।

সাবিত্রী পরদিন বৈকালে কণিকাকে লইয়া মণিলালের সহিত রমেশের বাটী উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী উপরে উঠিয়া রমেশের গৃহে গিয়া দেখিলেন রমেশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন আর রেণু তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া

দিতেছে, ভবানী মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছে। সাবিত্রীকে দেখিয়া রেণু ছুটিয়া "মা" বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, ভবানী পাখা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সাবিত্রী মৃদুস্বরে ভবানীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "রমেশ এখন কেমন আছে?" ভবানী বলিল "জ্বরটা খুব বেশী হয়েছে, রাত্রে মোটে ঘুমায় নাই বড় ছট্‌ফট্ করিতেছে সকালে একটু ভাল ছিল, বেলা প্রায় দশটা হইতে আবার জ্বর বেশী হয়েছে, এখন যেন অঘোরে রহিয়াছে, সকালে ডাক্তার আসিয়াছিলেন।" সকল শুনিয়া সাবিত্রী রমেশের মাথার কাছে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রমেশ চোক চাহিয়া বলিলেন, কে? ভবানী বলিল "মামিমা এসেছেন," রমেশ হুঁ, বলিয়া আবার চোক মুদিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রমেশ সেই ভাবেই রহিলেন সন্ধ্যার পর হইতে জ্বর একটু কম হইতে লাগিল, তখন একটু দুধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি একটা বাজিয়া গেল, মণিলাল আসিয়া বলিল, "মামিমা আজ কি বাড়ী যাবেন।" সাবিত্রী ভবানীকে ডাকিয়া বারাণ্ডায় গিয়া বলিলেন, "কি করি বল দেখি, এমন অবস্থা দেখে যাই বা কি করে। আমিই থাকি, তুমিই না হয় বাড়ী যাও তোমার মামার আবার রাগ হবে" ভবানী বলিল "তাই কর, আমি আজ যাই তুমি থাক।" সাবিত্রী বলিলেন "আমার বাপু কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু একজন বাড়ী না গেলে ত হয় না। মণি যাও গাড়ী আন্‌তে বল গে।" সাবিত্রী ও ভবানী আবার রমেশের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন রমেশ জাগ্রত হইয়া ছিলেন, উভয়কে দেখিয়া বলিলেন "আপনারা কোথায় গিয়াছিলেন?"

ভবানী বলিল "এই বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিলাম, আমি এখন বাড়ী যাইতেছি, মামিমা তোমার কাছে থাকিবেন।" ভবানীর কথা শুনিয়া রমেশ যেন চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপনি যাইবেন, কেন না গেলে কি চলিবে না।" ভবানী বলিল 'মামার কাছে কেহ না থাকিলে ত চলে না।' রমেশ দুঃখিত হইয়া বলিল 'তবে যান, আপনি থাকিলেই ভাল হইত।' সকলেই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। মণিলাল আসিয়া বলিল গাড়ী আসিয়াছে, সাবিত্রী ভবানীকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি আজ থাক, আমি যাই কাল আবার আসিব।" সাবিত্রী কণিকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

---

(২৬)

আজ দশ দিন পরে রমেশচন্দ্র ভাত খাইতে বসিয়াছেন, ভবানী নিকটে বসিয়া বাতাস করিতেছে। খাইতে খাইতে রমেশ বলিলেন, "মার পত্র এসেছে।" ভবানী বলিল, "তিনি কবে আসিতেছেন, কিছু লিখিয়াছেন কি?" রমেশ বলিলেন "হাঁ সরকার মহাশয় আমার জরের সময় ব্যস্ত হইয়া মাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তিনি সেই টেলিগ্রাম পাইয়াই শীঘ্র ফিরিতেছেন। বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই আসিবেন।" ভবানী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "এখন তুমি সুস্থ হইয়াছ এবং ভাত খাইয়াছ, আজ আমি বাড়ী যাই।"

রমেশ মৃদু হাসিয়া ভবানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

ভবানী কিছু না বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল. রমেশ বলিলেন, "অসুখের সময় আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক আবদার করিয়াছি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আর কি বলিব, দয়া করে এই হতভাগ্যকে একটু মনে রাখিবেন, কি।" ভবানী কিছু বলিল না কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল; রমেশ বলিলেন "অমন করে নিশ্বাস ফেলিলেন কেন?" ভবানী বলিল "তুমি আবার আমাকে 'আপনি' বলে কথা কও কেন।" রমেশ বলিলেন 'অসুখে মাথার ঠিক ছিল না, কি বলিয়াছি, তাই বলে কি এখন বলিতে পারি।" ভবানী বলিল, "না, আমাকে আপনি বলিও না, আমার শুনিতে লজ্জা করে।' রমেশ বলিলেন, "বেশ তবে এবার তুমিই বলিব, কেমন," বলিয়া রমেশ ভবানীর দিকে চাহিলেন, ভবানী একটু মৃদু হাসিল। রমেশ বলিলেন, "তুমি তবে আজই যাইতেছ?" ভবানী বলিল "কাজেই।" রমেশ বলিলেন "কেন, যাইতে কি তোমার ইচ্ছা নাই?" ভবানী বলিল "সে কথায় কাজ কি, যখন যাইতেই হইবে, যাইব, তার আর ইচ্ছা অনিচ্ছা কি।" রমেশ অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "একটা কথা বলিব, উত্তর দিবে কি?" ভবানী বলিল, "বল, সাধ্য হয় উত্তর দিব।" রমেশ বলিলেন, "সত্য কি তোমার বাড়ী যাইবার জন্য মন অস্থির হইয়াছে?" ভবানী বলিল, "কেন একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ," রমেশ বলিলেন 'মনে হইতেছে তাই।' ভবানী বলিল কি মনে হয়?' রমেশ বলিলেন 'মনে হয় তোমার যাইতে একটুও ইচ্ছা নাই।' ভবানী নত মুখে নীরবে রহিল। রমেশ বলিলেন "সত্য নয় কি? বল চুপ করে রইলে যে।" ভবানী বলিল "জগতে আমার এমন কে আছে যার জন্যে আমার মন

অস্থির হবে, ভগবান যখন যেখানে রাখেন সেই খানেই থাকি।" রমেশ বলিলেন "কেন, সেখানে তোমার ভাই আঁছে, মামা মামি মা আছেন।" ভবানী বলিল "হুঁ" রমেশ বলিলেন "কই আমার কথার উত্তর দিলে না?" ভবানী বলিল "ও কথা বলিবার সাধ্য আমার নাই। তুমি হাত মুখ ধোও।" রমেশ ভাবরে মুখ ধুইয়া বিছানায় বসিলেন এবং বলিলেন "বড় গরম হচ্ছে।" ভবানী বাতাস করিতে লাগিল। রমেশ বলিল "তোমার নামটী কে রেখেছিল।" ভবানী হাসিতে হাসিতে বলিল "কেন বল দেখি" রমেশ বলিল "হুঁ ঠিক হয় নাই।" ভবানী বলিল "আমার নাম ছিল মালতিমালা, বিধবা হওয়ার পর মামা আমাকে ভবানী বলিয়া ডাকেন। সেই থেকে আমার নাম ভবানী হয়ে গেল।" এবার হাসিয়া রমেশ বলিলেন, "তাহা ত জানিতাম না আবার বছর বছর নাম বদল হয়। তবে আমিও একটা নাম বদল করে দিতে পারি, কেমন।" ভবানী বলিল, "কি নাম, শুনি।" রমেশ বলিলেন, "যদি বলি গোলাপ," ভবানী বলিল, "যেমন অপরাজিতাফুল লইয়া লোকের কাছে গোলাপফুল বলিয়া পরিচয় দিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তেমনই তোমার এই নাম বলিয়া আমাকে ডাকিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।" রমেশ বলিলেন, "তবে যদি বলি ভ্রমর. কেমন পছন্দ হয়।" ভবানী বলিল, "জিনিষটা আমার সহিত মেলে বটে, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর নভেলের ভ্রমরের সহিত তুলনা হয় না, কারণ ভ্রমর ভাগ্যবতী, আর আমি অভাগিনী।" ভবানীর মুখে অভাগিনী শুনিয়া রমেশ যেন ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "ভাগ্য মানুষের হাত গড়া, ভগবান মানুষকে তাঁহার সর্ব্বসুখময় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তবে এখন মানুষেরা একটা সমাজ গঠন করিয়া নিজ নিজ প্রাধান্য ও সুখ তৃপ্তি বজায় রাখিবার জন্য অপরকে দুঃখী করে। সকলেই যদি সকলের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিত, তবে সকলেই সুখী হইত।" সকল শুনিয়া ভবানী মনে মনে কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২৭)

সন্ধ্যাকালে রমেশের গৃহে আলো জ্বালিয়া দিয়া, জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ভবানী চলিয়া আসিয়াছে, আর তাঁর গৃহে যায় নাই। রমেশ একাকী গৃহ মধ্যে একবার শুইতেছেন একবার বসিতেছেন, এবং প্রতিক্ষণে ভবানী ও রেণুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কাটিল ক্রমে রমেশ অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। রমেশ উঠিয়া গায়ে একখানা র‍্যাপার জড়াইয়া

গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভবানী যে গৃহে থাকিত সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভবানী তখন নিস্পন্দ ভাবে স্থিরনেত্রে শয়ন করিয়া যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। রমেশ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ এত সকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছ?" ভবানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল "তুমি ঠাণ্ডার মধ্যে কেন এসেছ," রমেশ বলিলেন "কি করি দুই তিনঘণ্টা একলা থাকিয়া আর পারিলাম না, তাই দেখিতে এলাম সকলে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

ভবানী বলিল "চল ঘরে চল আবার ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবে।" রমেশ নিজ শয়ন গৃহে ফিরিলেন ভবানী ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিল। রমেশ বলিলেন "রেনু কি ঘুমাইয়াছে?" ভবানী বলিল "হাঁ, সে ঘুমাইয়াছে।" রমেশ বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, এবং ভবানীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন, ভবানী তখন চেয়ারে বসিল। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে থাকিয়া রমেশ বলিলেন, "সন্ধ্যা থেকে একলা ঘরে শুইয়া কি ভাবিতে-ছিলে?" ভবানী বলিল 'কত কি'। রমেশ বলিলেন "আজ তোমার যাওয়ার কথা ছিল না?" ভবানী বলিল "হুঁ। আজ দিনটা ভাল নয় তাই গেলাম না, কাল বৈকালে যাইব।"

রমেশ বলিলেন "আমি ভাবিতেছিলাম, বুঝি আমাকে না বলেই সব চলিয়া গিয়াছে।" আবার অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভবানী বলিল, "আমরা চলিয়া গেলে তোমার রেনুর জন্য বোধ হয় একটু মন কেমন করিবে?" রমেশ বলিলেন "তা একটু করিবে বৈকি।" ভবানী বলিল, 'আচ্ছা তুমি রেনুকে একটু ডাক না কেন?' রমেশ একটু হাসিয়া বলিলেন "সত্য কথা বলিতে কি রেনুকে আমি আমার স্ত্রী বলে মনে করিতে পারিনা, তবে উহার সরল মুখখানি দেখে বড় কষ্ট হয়, উহাকে যে ভালবাসিনা তাহা নয়, তবে সে ভালবাসা অন্য প্রকার। তুমি ত যাইতেছ, তোমার ত কাহারও উপর মায়া নাই, আমার জন্য একটু মন কেমন করিবেনা বোধ হয়?" ভবানী বলিল, 'কেন তুমি বার বার ও কথা বলে আমাকে অস্থির করিতেছ.' রমেশ বলিলেন "মাপ কর, আর বলিবনা, তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা হইতেছিল, তাই বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।" ভবানী বলিল "আমাকে হীন কর কেন, যা শুনে কোন লাভ নাই. যা বলে কোন ফল নাই, তাহা শুনিয়া কি হইবে।" রমেশ উঠিয়া বাতিটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন লাভ নাই, জগতে বন্ধুর কাছে বন্ধুর মনের কথা কেন বলিবে না, আমাকে তুমি তোমার বন্ধু মনে কর, তোমার মনের ব্যাথা বল, আমি যথা সাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিব।"

ভবানী বলিল, "কি বলিতেছ, সত্যই কি তুমি কিছু বোঝনা" বলিয়া ভবানী কাঁদিয়া ফেলিল। রমেশ উঠিয়া ভবানীর হাত ধরিয়া বলিল, "ভবানী সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস, সত্য কি আমায় ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হইতেছে, বল, বল, আমার এ অনুমান কি সত্য ?" ভবানী বলিল "জগতের একধারে দুঃখের অন্ধকারে পড়িয়াছিলাম, কোন জ্বালা অনুভব করিতাম না, কেন তুমি আমায় সুখের আলো দেখাইলে, কেন আমায় ভালবাসা আহ্বানে ডাকিয়া আমার লুপ্ত বাসনার নদীকে শত আশার মুখে ছুটালে, কেন তুমি আমার এমন সর্ব্বনাশ করিলে।" রমেশ বলিলেন "ভবানী আমারও যে ওই অবস্থা, তুমি যে আমার সমস্ত হৃদয়টা অধিকার করিয়াছ, কেঁদনা, যেমন আমি তোমার, তুমিও আমার আমাদের মিলনে ভগবান সহায় হইবেন।"

(২৮)

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে, এখনও রমেশ ঘুমাইতে পারিতেছেন না। নানা চিন্তায় তাহার দুর্ব্বল মস্তক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ভাবিতেছেন কি করিতেছি, ইহা কি ন্যায়, না অন্যায়। সুবাসের কথা সুবাসের স্মৃতি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কই সে স্মৃতি ত মনে স্থান পাইতেছে না, আজ যেন ভবানী-স্মৃতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রণয় ও বিবেকের মহাযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। বিবেক যেন বলিতেছে, ছি, তুমি কি মানুষ, সে সুবাস তোমার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল, যে তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না, সেই স্বর্গীয় দেবী ভুলিয়া তাঁহার প্রেমের অবমাননা করিতেছে, সে দেবী স্বর্গ হইতে ইহা দেখিয়া তোমাকে ধিক্কার দিতেছেন। আবার প্রণয় বলিতেছে সুবাস আর ত আসিতেছেনা, সেত আমার প্রাণে ব্যথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমার দুঃখ দেখে কই, সেত দুটো সান্ত্বনার কথাও বলিয়া গেলনা, সে যতদিন বেঁচেছিল তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছি, সে চলিয়া গেলে তার স্মৃতি বুকে করে কতরাশি কাঁদিয়াছি, কই সেত স্বপনেও আর দেখা দিলনা, তবে আর কেন তাহার কথা মনে করিব।"

আবার যেন বিবেক বলিতেছে, বেশ তাঁহার কথা না ভাব, রেণুর কথা ভাব, তাহার কি হবে, তাহার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য আছে তাহা কি তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। "আবার প্রণয় বলিতেছে," তাহাকে ত আমি ভাল বাসি চিরকালই বাসিব, সে আমার কাছে ছোট বোনের মত চিরদিনই স্নেহ পাইবে তাহার কোন কষ্ট এ জীবনে হইবে না, কারণ আমার জননী আমার চাইতে তাহাকে বেশী ভাল

বাসেন আমি তাহাকে শুধু তাহার স্বামীর অধিকার দিতে পারিব না। "আবার যেন বিবেক বলিতেছে" তুমি বিধবাকে গ্রহণ করিলে, তোমার সমাজ তোমায় ত্যাগ করিবে, লোকের কাছে তুমি ঘৃণিত হইবে, তোমার জননী অতিশয় মর্ম্ম ব্যাথা পাইবেন, তোমার শ্বশুরের বংশে কলঙ্ক পড়িবে ইহা কি তোমার উচিত। এপথ তুমি ছাড়িয়া এ ঘটনা তুমি মন হইতে মুছিয়া ফেল।"

আবার প্রণয় যেন বলিতেছে, 'সমাজ কি, তাহার কোন ভিত্তি নাই, তাহার কোন ন্যায় বিচার নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। যে সমাজ শুধু নিজের স্বার্থ এবং শ্রেষ্টতা রাখিতে পরের অনিষ্ট বা ব্যাথা বুঝেনা, সে সমাজ আমার সমাজ কি, জননী দুঃখিত হইবেন, কেন, আমি ত তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছি না, তার সেবা আমার জীবনে এক প্রধান কার্য্য, তিনি কেন দুঃখিত হবেন। তবে যদি তিনি আমায় ঘৃণা করেন, আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমার দোষ কি, শ্বশুরের বংশে কলঙ্ক হইবে, তাহারা দুঃখিত হইবেন, নিন্দার ভয়ে। কিন্তু স্বশুর মহাশয় নিন্দায় যতটা দুঃখিত হইবেন, ভবানীর দুঃখ দেখে কি তাঁহার ততখানি দুঃখ হয়, সে পরের দুঃখ বোঝেনা বা দেখেনা তার প্রতি আবার কর্ত্তব্য কি? আমি এমন কি অন্যায় করিতেছি একটী জন্ম দুঃখী অনাথা বালিকা আমাকে প্রাণ ঢেলে ভাল বাসিয়াছে, তাহার প্রতিদান করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়। যাক ধর্ম্ম যাক সমাজ ভবানীর চোখের জল মুছাইব, তাহাকে সুখী করিব ভবানীকে আমার করিব। দন্দ্বযুদ্ধে প্রবল তরঙ্গীত প্রণয়ই জয়ী হইল, বিবেক পরাজিত হইয়া প্রণয় তরঙ্গে লুপ্ত হইল। রজনীর শেষে রমেশ একটা জানালা খুলিয়া দিলেন, প্রভাতে শীতের শীতল বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিয়া একটু তন্দ্রা আসিল নিদ্রার ঘোরে তিনি সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

(২৯)

আজ ভবানীর বড় লজ্জা বোধ হইয়াছে, সে আজ রমেশের গৃহে যাইতে পারিতেছেনা, যদিও তাহার মন হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গিয়াছে, তথাপি মনে হইতেছে কি করিলাম, কেন বলিয়া ফেলিলাম, মনের কথা মনে রাখিলেই হইত রমেশ সত্যই কি আমায় ভালবাসে, না আমাকে স্তোক দিবার জন্য ঐরূপ বলিল, আবার ভাবিতেছে, না রমেশ সেরূপ লোক নহে। কিন্তু বালিকা রেনুর কি হইবে, কি করিতেছি রমেশ যে আমার বড় স্নেহের, রেনুর সর্ব্বস্ব, আহা ও এখন শিশু, কিছুই বুঝিতেছে না, সে যদি বুঝিত তাহার দিদি আজ তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তবে সে কি করিত, হয় ত সকলের সম্মুখে অপমান করিয়া তাহার

বাটী হইতে তাড়াইয়া দিত। না, যাহা করিয়াছি, আর নয় ভগবান রক্ষা কর, মনে বল দাও। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভবানী মাঝে মাঝে মনে মনে ভগবানকে ডাকিতেছে। আজ রমেশ আহারে বসিলে, ভবানী রেণুকে পাঠাইয়া দিল, রেণু অনিচ্ছা সত্ত্বে দিদির তিরস্কারে রমেশের ঘরে গিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমেশ তখন অন্য মনস্ক ছিলেন, তিনি সেদিকে লক্ষ করিলেন না। যখন আহার শেষ করিয়া উঠিলেন তখন রেণুকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে, তিনি আপনাকে সংযত করিয়া, বলিলেন "কি রেণু, আজ বাড়ী যাবে?" "হাঁ" বলিয়া রেণু চলিয়া গেল। রমেশ বিছানায় শুইয়া আবার চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। ভবানী বৈকালে রেণুর চুল বাঁধিয়া কাপড় পরাইয়া রমেশের গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, আপনার ও রেণুর জামা কাপড় ইত্যাদি গোছাইতে লাগিল।

রেণু রমেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলে, হঠাৎ রেণুর পায়ের মলের শব্দে রমেশ চাহিয়া দেখিল, রেণু দাঁড়াইয়া আছে।

রমেশ বলিলেন, "কি রেণু, কি মনে করে? এখন বাড়ী যাইতেছ নাকি," রেণু কথা কহিল না। নীরবে দাঁড়াইয়া দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। তখন রমেশ মনে করিলেন রেণুকে একটু আদর করা উচিত। তিনি উঠিয়া রেণুর হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিলেন, 'বাড়ী গিয়া আমার জন্য তোমার মন কেমন করিবে কি?' রেণু কিছু বলিল না, একটু মৃদু হাসিয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া আঙ্গুলে কাপড় জড়াইতে লাগিল। রমেশ বলিলেন, "তোমার পুতুলগুলি সব নিয়েছ ত?" রেণু বলিল "হু," রমেশ তখন আর কি কথা কহিবেন খুজিয়াই পাইতেছেন না। একটু নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "কতকগুলি ছবি লইবে?" রেণু বলিল, "লইব।" রমেশ উঠিয়া ড্রয়ার খুলিয়া ছবি বাহির করিয়া রেণুকে দিলেন, রেণু আনন্দে ছবি দেখিতে লাগিল এমন সময়ে মণিলালের কণ্ঠস্বর শুনিয়া "মণিদাদা এসেছ আমি যাই" বলিয়া রেণু চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভবানী গৃহে প্রবেশ করিল, রমেশ ভবানীকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন কি বলিবেন যেন খুজিয়া পাইলেন না। ভবানী নত মুখে বলিল "আমরা যাচ্ছি, মণি এসেছে" রমেশ বলিলেন "আচ্ছা আমি পত্র লিখিতে পারি কি?" ভবানী একটু ভাবিয়া বলিল "হ্যাঁ রেণুকে লিখিও, তবে আসি" বলিয়া ভবানী গৃহ হইতে চলিয়া গেল। রমেশ উঠিয়া বারণ্ডায় দাঁড়াইল। গাড়ী চলিয়া যাইলে রমেশ বিষণ্ণ মনে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

(৩০)

আজ প্রায় দুই মাস পরে রমেশের জননী মানদাময়ী তীর্থ ভ্রমন করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। পত্রে পুত্রের অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি নানা বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া বাটী ফিরিয়া পুত্রকে সুস্থ দেখিয়া সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন করিয়াছেন। রেণুকে আনাইয়াছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা পঙ্কোজিনী পুত্র কন্যা সহ পিত্রালয়ে আসিয়াছেন বহুদিন পরে সকলে মিলিত হইয়া বড় আনন্দলাভ করিতেছেন। মধ্যাহ্নে মানদাময়ী ৺পূজার গৃহ পরিস্কার করিয়া আলিপনা দিয়া বিস্তর ফল লইয়া কাটিতে বসিয়াছেন। রমেশ দ্বারের উপর বসিয়া জননীর সহিত কথা কহিতেছেন, জননী রমেশের অসুখের কথাই বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং রমেশের মুখে সাবিত্রী ও ভবানীর সুখ্যাতি শুনিয়া এবং তাঁহারা তাঁহার রমেশকে অসুখের সময় এত যত্ন করিয়াছেন শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেছেন। রমেশের অসুখের সময় পঙ্কোজিনী আসে নাই শুনিয়া কন্যার প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন। এমন সময় পঙ্কোজিনী শিশু পুত্রটীকে কোলে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

মানদাময়ীর মনে তখন রমেশের অসুখের কথাই জাগিতেছিল, তিনি কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, "পঙ্কো, রমেশের এমন অসুখ হয়েছিল, তোমরা একটু দেখিলে না, আমি তোমাদেরী ভরসায় উহাকে একলা রাখিয়া, দুরদেশে গিয়াছিলাম।" মাতার কথা শুনিয়া পঙ্কোজিনী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "একদিন দরবান গিয়া বলিল, দাদাবাবুর জ্বর হইয়াছে, আমি ভাবিলাম বোধ হয় সামান্য জ্বর, আর তখন আমার ছোট খোকার বড় পেটের অসুখ হইয়েছিল, আমিও একদিন আসিয়া দেখিতে পারিলাম না, লোক পাঠাইয়া রোজই খবর লইতাম, শুনিলাম তিনি ভাল আছেন। আমি মোটেই শুনি নাই এত বেশী অসুখ হইয়াছিল। আর রেনুর মা, বোন এসেছিল, এসব আমি কিছুই জানি না, আজ এখানে আসিয়া শুনিলাম। রমেশ ত আমাকে একটা চিঠি লিখিয়া কিম্বা একটা লোক পাঠাইয়া আনাইলেই পারিত," পঙ্কজিনী ক্ষণভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। ভগ্নিকে বিষন্ন দেখিয়া রমেশ বলিলেন, "তাহাতে আর হইয়াছে কি, মানুষের কি অসুখ হয় না, তবে উহারা আসিয়াছিল, এক রকম চলিয়া যাইতেছিল, তাই তোমাকে খবর দি নাই। বিশেষ মা বাড়ীতে নাই, ছেলেদের লইয়া আবার আমাকে লইয়া তোমার কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া তোমাকে আনি নাই।" পঙ্কজিনী অভিমানভরে বলিলেন, "মা মনে করিতেছেন, আমাদের মায়া দয়া নাই, আমি গ্রাহ্য করিয়া আসি নাই।"

রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "মার কথা শোন কেন, মার যেমন কথা, দেখ দিদি, মা বদ্রিকানাথ দেখেন নাই, সেখানে মা, তাঁর রমেশ, আর ঘর সংসার এই সবই সারাদেশ ভরা দেখিয়া এসেছেন। তাই ত মাকে বারণ করেছিলাম তুমি একলা যেও না, আমি তোমায় নিয়ে যাব, তাহাত মা শুনিলেন না, কেবল মিথ্যা কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া আসিলেন। দেখ মা তোমার কিন্তু কোন পুণ্যই হয় নাই। এবার আমি তোমাকে পুণ্য করিয়ে আনিব।" মানদাময়ী বলিলেন, "তাই করিও বাবা. আমার কি এমন বরাত হইবে, আমি তোমার সঙ্গে তীর্থে যাইব।" রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "কেন আমি কি এখনও বড় হই নাই মা।" মানদাময়ী হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ বুড় কর্ত্তা হইয়াছ।" পঙ্কজিনী ও রমেশ জননীর মনের ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

(৩১)

রেণু আবার পিত্রালয়ে আসিয়াছে। মানদাময়ী একদিন সাবিত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছেন। বেহানের নিমন্ত্রণে সাবিত্রী একা গিয়াছিলেন, ভবানীকে লইয়া যান নাই, কারণ তিনি দেখিতেন, রমেশের বাটী হইতে আসিয়া অবধি ভবানীর প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। বাল্যকালে বিধবা হইয়াও ভবানী সর্ব্বদা সদানন্দ প্রাণে সরল মনে হাসিয়া খেলিয়া সংসারের কাজ করিয়া বেশ শান্তভাবে থাকিত, কিন্তু আজকাল যেন তাহাকে গম্ভীর দেখা যায়, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনা হইয়া থাকে, সকল কাজেই যেন বিরক্ত হয় বলিয়া মনে হয়। এই সকল দেখিয়া, সাবিত্রীর মনে কোন কোন সময় স্বামীর সাবধান করিবার কথা মনে পড়ে; তিনি কোন কোন ভয়ানক কথা মনে ভাবিয়া শিহরিয়া উঠেন, আবার মন হইতে সে সব আশঙ্কা দূর করিয়া, মনকে শান্ত করেন। যাই হোক এইরূপ মনে কোন সন্দেহের ছায়া পড়ায়, তিনি আর ভবানীকে সে বাটী লইয়া যাইতে সাহস করিলেন না।

বৈকালে সাবিত্রী উনানে আগুন দিয়া কাপড় কাচিতে গেলেন। ভবানী ময়দা মাখিতে বসিল। সাবিত্রী কাপড় কাচিয়া ভিজা কাপড়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাস্তার ধারে জানলার কাছে গৃহের মধ্যে একখান খাম পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি সাগ্রহে তুলিয়া দেখিলেন উপরে ভবানীর নাম লেখা। তিনি ভাবিলেন, ভবানীকে কে পত্র দিল। মধ্যে মধ্যে ভবানীর এক ননদ পত্রাদি লিখিত বটে কিন্তু সে পোষ্টকার্ডে; এইরূপ পত্র ত কখনও আসে না। তাঁহার কোন ভয়াবহ কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মনে কেবল কুসন্দেহ উদয় হইতে লাগিল।

তাঁহার হৃদয় দুরদুর করিতে লাগিল। তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তিনি কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন দেখিলেন পত্রে লেখা আছে যথা—

'ভ্রমর তুমি কেমন আছ জানিবার জন্য মন সর্ব্বদা ব্যাকুল হয় পত্র লিখি লিখি করিয়াও লিখিতে পারি নাই আমার কথা কি তোমার মনে আছে? যদি ভুলিয়া গিয়া থাক বেশ সুখী হইও। আর যদি আমার মতন হইয়া থাক তবে নিজের অবস্থা বুঝিয়া উত্তর দিয়া কিঞ্চিৎ সুখী করিতে কুণ্ঠীত হইও না। ইতি—

তোমারই রমেশ।

পত্র পড়িয়া সাবিত্রীর সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ সেইখানে বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন একবার মনে হইতে লাগিল স্বামীর কাছে সমস্ত খুলিয়া বলি আবার মনে হইতে লাগিল, না, একথা শুনিয়া তিনি বড় ব্যাথা পাইবেন। আর তার বড় স্নেহের, বড় আদরের ভবানীকে কি ভাবিবেন, তিনি যে সকল সময় স্বামীর সাবধনাতাকে তুচ্ছ করিয়া ভবানীর চরিত্রে বড় গর্ব্ব করিতেন আজ তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল তিনি পত্রহস্তে রন্ধন গৃহে যাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "ভবানী তোর মনে এই ছিল।" ভবানী চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন, "রমেশ তোকে এমন ভাবে চিঠি লিখেছে কেন?" ভবানী আবার চমকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সাবিত্রী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তোকে ছোট থেকে বুকে করে মানুষ করে সৎশিক্ষা দিয়া আসিতেছি আজ কি তার এই ফল হইল, তুই কি ধর্ম্ম, মান, ইজ্জত সব ভুলে গেলি?"

ভবানী নিরুত্তর হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। সাবিত্রী পত্রখানা জলন্ত উনানে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এ পত্র তোর পড়া হবে না।" পরে ভবানীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বল ভবানী যাহা করেছিস, তাহা করেছিস ওসব কথা আর ভাব্‌বি না, আর ওপথে অগ্রসর হইবি না বল, বল, আমি তোর মা বল আমায় ছুঁয়ে বল।" ভবানী মৃদুস্বরে বলিল 'না'।

(৩২)

রমেশের পত্র আসিবার পর চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল ভবানী মনে মনে অনেক ভাবিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। রমেশের কথায় তার হৃদয় পুর্ণ। তাহার স্মৃতিপথে ছায়ার মত ঘুরিতে লাগিল। রমেশ কি লিখিয়াছিল জানিবার জন্য তাহার মনে সর্ব্বদাই যেন প্রশ্ন করিতে থাকে। ভবানী মনকে শান্ত করিতে পারিল না। সাবিত্রীর উপদেশ আর তার মনে স্থান পাইল না। ভবানী ধর্ম্ম ভুলিল মানকুল ভুলিল, স্নেহমমতা ভুলিয়া প্রণয়লালসাস্রোতে প্রাণ খুলিয়া দিল সে গোপনে রমেশকে পত্র লিখিল।

জীবন সর্ব্বস্ব !

তুমি পত্র লিখেছিলে আমি পত্র পাই নাই। মামীমার হাতে সে পত্র পড়িয়াছিল তিনি পড়িয়া সে পত্র পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন, আমি যে কি ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা আর কি জানাইব, এক দিন রাত্রে তোমার জন্য মন অস্থির হয় তারপর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সন্দেহের মধ্যে আমার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। এক একবার মনে হয় আত্মহত্যা করিয়া এ জ্বালার শেষ করি আবার তোমার স্মৃতি আমায় শান্তনা দেয়, তোমাকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইব। সত্যই কি আমাদের মিলন এ জগতে সম্ভব হইবে। যদি উত্তর দাও, ডাকে দিও না। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম। ইতি—

তোমারই ভ্রমর।

পত্র খিলিয়া গোপনে পাশের বাড়ীর একটী বালককে ছুটি পয়সা দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিয়া ভবানী নিশ্চিন্ত হইল। যথা সময় রমেশ ভবানীর পত্র পাইল এবং পত্র পাইয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার জন্য ভবানী এত কষ্ট ভোগ করিতেছে। কেন, সে কি করিয়াছে, সে যদি তাহাদের সংসারে না থাকে, তবে তাহাদের ক্ষতি কি। বোধ হয় বিনা বেতনে একটী চাকরাণী সরাইবার আশঙ্কায় তাঁহারা এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কেহ কি তাহা বুঝিতেছে, কেহ কি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতেছে, যাই হোক আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ভবানীকে সুখী করিব, তাহার সুখ দুঃখের ভাগী হইব। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া রমেশ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূ মনোরমাকে সংক্ষেপে এই প্রণয় ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া একখানা পত্র দিলেন এবং এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, পরামর্শ চাহিলেন। পরে ভবানীকে একখানি পত্র লিখিয়া একজন ঝীকে ডাকিয়া, বলিলেন, "তোমাকে একবার পদ্মপুকুরে যাইয়া এই পত্রখানি দিয়া আসিতে হইবে।" ঝী মৃদু হাসিয়া বলিল, "বৌদিদিকে দিতে হবে বুঝি ?"

রমেশ বলিল হুঁ।

ঝী বলিল, "আসিতেছি এই ময়লা কাপড়খানা ছাড়িয়া আসি।" ঝী হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর কাছে গিয়া বলিল, "মা ! আমি দাদাবাবুর চিঠি নিয়ে পদ্মপুকুরে যাচ্ছি।" গৃহিণী তখন রামায়ণ পড়িতেছিলেন তিনি বলিলেন কিসের চিঠি। ঝি হাসিয়া বলিল, "বৌদিদির চিঠি।" গৃহিণী এবার বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দাঁড়া শুধু হাতে যাবি এক টাকার মিষ্টি কিনে নিয়ে যা।" "তিনি বাক্স খুলিয়া একটা টাকা ঝিয়ের হাতে দিলেন। ঝী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন এইবার

রমেশের মন ফিরিছে, এই কয় দিন রেণু গিয়াছে বাবার আমার মন খারাপ হইয়া উঠিয়াছে আমিও শীঘ্র রেণুকে আনিতেছি। রমেশ আবার সংসারী হইয়া সুখী হউক। আমি এই দেখে যেন মরিতে পারি।

রমেশ ঝীর হাতে চিঠি দিবার সময় বলিয়া দিলেন, "দেখ এ চিঠি তোমার বৌদির বোনের হাতে দিও আর কাহারও সাম্‌নে দিওনা গোপনে সাবধানে দিও। কেউ যেন দেখে না।" ঝী হাসিয়া বলিল "তাহা আর আমায় বলিতে হইবে না।"

(৩৩)

অপরাহ্নে সাবিত্রী যখন রন্ধনে ব্যাপৃত ভবানী তখন রুটি গড়িয়া হাতের ময়দা ছাড়াইতেছিল তখন মানদাময়ীর নূতন ঝী সন্দেশ হস্তে উপস্থিত হইল, ঝীকে দেখিয়া ভবানী সাবিত্রীকে বলিল, "মামীমা রেণুর শশুরবাড়ীর লোক আসিয়াছে।" সাবিত্রী গৃহের বাহিরে আসিয়া মিষ্টভাবে বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঝী মিষ্টান্ন রাখিয়া সেইস্থানে বসিয়া বলিল, "বাটীর সব ভাল আছেন, বৌদি আপনারা কেমন আছেন খবর লইতে মা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সাবিত্রী বলিলেন, "হ্যা, সব ভাল আছে! তুমি বস বলিয়া সাবিত্রী তরকারি নামাইতে গেলেন।" ঝী ভবানীর সহিত কথা কহিতে লাগিল। ভবানী ঝীয়ের সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং চক্ষু, কর্ণ সতর্কতা করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝী চলিয়া গেল ভবানীও একটু পরে ছাদে চলিয়া গেল। সাবিত্রী ভবানীকে না দেখিয়া রেণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেণু ভবানী কোথায়?"

রেণু বলিল, "দিদি আমার হাতের লেখা করিতে বলিয়া ছাদে গিয়াছে।" ভবানী অসময়ে অকারণে ছাদে গিয়াছে শুনিয়া সাবিত্রীর সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। তিনি বিচলিত হইয়া ছাদে উঠিতে লাগিলেন। সাবিত্রী ছাদে গিয়া দেখিলেন ভবানী ছাদের আলিসা ধরিয়া গালে হাত দিয়া কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে তাহার পায়ের কাছে একখানা খাম ছেঁড়া পড়িয়া আছে সাবিত্রীর আগমন ভবান জানিতে পারে নাই। সাবিত্রী ডাকিলেন, "ভবানী!" ভবানী চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একখানা চিঠি লুকাইবার জন্য কাপড় দিয়া হাত ঢাকিল। সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, "ও কার চিঠি।" ভবানী বলিল "আমার চিঠি।" সাবিত্রী তীব্রস্বরে বলিলেন, "তাহাত দেখিতেছি তোমার চিঠি কে লিখেছে জানিতে চাহিতেছি।" ভবানী নিরুত্তর হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাবিত্রী বলিলেন "কে লিখিয়াছে দেখি চিঠি আমায় দাও।"

ভবানী দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল, না—ভবানীর মুখে "না" শুনিয়া সাবিত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি এত বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে বলিয়া সাবিত্রী জোর করিয়া ভবানীর হাত হইতে চিঠি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন চিঠি পড়িয়া, সাবিত্রীর রাগে, দুঃখে, অপমানে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কালামুখী, তোর কি ধর্ম্মাধর্ম্ম সব গিয়াছে, তুই মরিস না কেন? এখনও তোর এ মুখ জগতকে দেখাইতেছিস কি করে? মরিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর" বলিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলেন।

সাবিত্রীর তিরস্কারে এবার ভবানী লজ্জিত কিংবা দুঃখিত হইল না সে রাগে দিকবিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইল সে আবার রমেশকে পত্র লিখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল। এবং স্থির করিল, এবার সে লিখিবে, সে আর এ বাটীতে থাকিবে না। শীঘ্র যেন তাহাকে লইয়া যায়। নানা কল্পনা তখন তাহার মনে আসিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, ভাবানী নীচে নামিল না, আজ আর তাহার ভুতের ভয় নাই. তাহার সংসারের কাহার কথা মনে নাই, সে সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া তন্ময় চিত্তে বসিয়া আছে। অনেক রাত্রে নীচে হইতে রেণু কয়েকবার ডাকিল, দিদি নীচে এস। ভবানী উত্তর দিল না। অথবা নামিল না। পরে রাত্রি গভীর হইলে, ধীরে ধীরে নামিয়া গৃহের বারাণ্ডায় গিয়া শয়ন করিল।

(৩৪)

সাবিত্রী ছাদ হইতে নীচে আসিয়া স্বামীর গৃহে দাঁড়াইলেন কিন্তু কি করিয়া এমন ভয়ানক কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "ও গো সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" বলরাম বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?" সাবিত্রী উত্তর দিতে পারিলেন না। বলরাম বাবু অধিক ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "বল না, কি হইয়াছে, রমেশের বাড়ী সব ভাল আছে ত, মলি কোথায়? বল বল চুপ করে রহিলে কেন।" সাবিত্রী কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "রমেশ ভাল আছে বটে, কিন্তু সেই এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, রমেশ ভবানীকে পত্র দিয়াছে, "বলরাম বাবু বলিলেন" কি লিখিয়াছে, তখন সাবিত্রী স্পন্দিত হস্তে কম্পিত কণ্ঠে পত্র পড়িলেন, যথা—

ভ্রমর,—

তোমার পত্র পাইলাম, আমার জন্য তোমার কষ্ট ও যন্ত্রণা হইতেছে জানিয়া আমি যে কিরূপ অধীর হইয়া রহিয়াছি তাহা আর পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। তুমি কিছু

দিন অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিতেছি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া তোমাকে জানাইব, অধৈর্য্য হইও না. আমার পত্র পড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিও এবং সাবধানে উত্তর দিও, জানিও আমি তোমারি, তোমাকে মুক্ত করা তোমাকে সুখী করা আমার জীবনের এখন প্রধান লক্ষ, আর বেশী কি লিখিয়া জানাইব। নিজের অবস্থা বুঝিয়া দেখিলেই আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে, আমি কেমন ভাবে দিন কাটাইতেছি।

ইতি তোমারি রমেশ।

বলরাম বাবু পত্র শুনিয়া বলিলেন, "ভ্রমর কে বুঝিতে পারিলাম না", সাবিত্রী বলিলেন, বুঝিলেনা, "কালা মুখী ভবানী। তোমার জামাই তার আদর করে নাম রেখেছে।" 'ওঃ' বলিয়া বলরাম বাবু কপালে হাত দিয়া মুখ নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাবিত্রী বলিলেন "তুমি অমন করে রহিলে, কি করিব, কি হইবে বল? আমার যে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।" বলরাম বাবু বলিলেন, আর এখন কি বলিব, যখন বলিয়াছিলাম যখন সাবধান করিতাম, তখন সে সব গ্রাহ্য কর নাই মনে করিতে আমার দৃষ্টিশক্তি নাই, এবং বোধশক্তিও নাই। কিন্তু সাবিত্রী, এখন বহির দৃষ্টি হারাইয়া, আমার অন্তদৃষ্টি এখন বেশী তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ ঘটনার আশঙ্কা আমি বহুদিন আগে করিয়াছিলাম। সেজন্য তোমাকে বার বার সতর্ক করিয়াছিলাম তখন অবহেলা করিলে, এখন আমি আর কি করিব, এখন যাহা ভালবুঝ কর। তুমি সর্ব্বদা সাবধান কর! যদি পার, ফেরাও। আমার দৃষ্টি নাই ক্ষমতা নাই আমি আর কি করিব। আর পারত ভবানীকে হাতে করে মানুষ করেছ আবার তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইবে," বলিয়া বলরাম বাবু শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলেন রমেশের মাতাকে জানান দরকার। তিনি যদি পুত্রকে শাসন করিতে পারেন তবে সবদিক রক্ষা হয়। আবার মনে হইতে লাগিল ভবানীর কলঙ্কের কথা প্রচার হইলে পরে আবার ভাবিলেন যদি ঘটনা আরো বাড়িয়া যায়, তবে সে কলঙ্ক লুকাইতে পারিবেননা এইরূপ নানাবিধ ভাবিয়া সাবিত্রী পত্রলিখিয়া মানদাময়ীকে, রমেশের পত্রখানি সহ মনিলালকে দিয়া মানদাময়ীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে ভবানীকে ডাকিতে তাঁর আর ইচ্ছা হইলনা। রেণু ও মনিলাল যখন জিজ্ঞাসা করিলেন দিদি কোথায়? তখন তিনি বলিলেন "তার মাথাধরিয়াছে ছাতে শুইয়া আছে। সকলে শয়ন করিলে সাবিত্রী সদর দ্বারে ভিতর হইতে চাবি দিয়া শয়ন করিলেন তাঁহারও আহার হইলনা, মর্ম্ম বেদনায় তার হৃদয় ভরিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

PRINTED BY S. C. PALIT, AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS,
67-9 BALARAM DE STREET, & PUBLISHED BY S. C. PALIT
FROM 73 MANICKTALA STREET, CALCUTTA.

৭ম কল্প] Reg. No. C. 691. [৪র্থ খণ্ড

অর্ঘ্য

শ্রাবণ, ১৩২৩] [August. 1916.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত বি, এল্,-সম্পাদিত।

কার্য্যালয়—৭৩ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সূচী।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথ	শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম্ এ, বি, এল্,	...	১২১
গুরুগিরি	নিমচাঁদ	...	১৩৫
পরিণাম	শ্রীঅমরজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	...	১৪০

অর্ঘ্যের নিয়মাবলী।

১। অর্ঘ্যের মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। নমুনার আবশ্যক হইলে ৵০ ডাক টিকি পাঠাইতে হইবে।

২। প্রতিমাসের মধ্যভাগে অর্ঘ্য বাহির হয়। কোন মাসের অর্ঘ্য না পাইলে পরের মাসে ৭ তারিখের ভিতর জানাইতে হইবে। তার পর আমা আর দায়ী হইব না।

৩। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। আমরা ভাল প্রবন্ধাদি পাইলে বাহির করি।

৪। চিঠি পত্রাদি ও টাকা পয়সা সুব "কার্য্যাধ্যক্ষ" অর্ঘ্য, ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। নূতন গ্রাহক 'নূতন' কথাটা লিখিবেন।

৫। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাইলে বা প্রবন্ধাদি ফেরৎ হইলে ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের নিয়ম এক মাসের জন্য সাধারণ একপৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা, ও সিকি পৃষ্ঠা দুই টাকা। তিন মাসের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। মলাটের বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিলে জানিতে পারিবেন। বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—অর্ঘ্য।

৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২৩। | ৪র্থ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

(৩)

সৌন্দর্য্যের কবি

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্ এ, বি এল,)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গের পল্লীগ্রাম—রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিত্রমালা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন,—"বাংলার পল্লীজীবন কবিতায়, গল্পে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে এত প্রচুর রকমে, এত অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে আর কে আঁকিয়াছেন আমি তো তাহা জানি না। কবিতাতে—"চিত্রা"য় পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, "চৈতালী"তে মধ্যাহ্ন, দিদি, পরিচয়, পুঁটু প্রভৃতি কবিতা বাংলা-পল্লীজীবনের সাঁচ্চা প্রাণের চিত্র নয়? সমস্ত "ক্ষণিকা" কাব্যখানি সোণার ছন্দের ফ্রেমে বাঁধানো বাংলার পল্লীচিত্রমালা বই আর কি বলিব ?"—(প্রবাসী ১৩১৯)

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ও পল্লীজীবনের খণ্ডচিত্রে রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন কোন নিপুণ চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে সেরূপ সৌন্দর্য্য রচনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় ভাব হৃদয়ের নির্ব্বাক সঙ্গীতকে জাগাইয়া দেয় তাহার কথা আমরা এস্থলে বলিতেছি না। যে সৌন্দর্য্য বর্ণ গন্ধ শব্দ ও স্পর্শগত, যাহা সাঙ্কেতিক চিহ্নের ন্যায় বঙ্গের পল্লীগ্রামে বাস্তবের সীমার মধ্যে রহিয়াছে, সেইটিকে আগে ভাল করিয়া না দেখিয়া লইলে তাহার ভিতরকার রহস্য বুঝা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের চিত্রময় কাব্যে বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিস্ফুট যে তাহার বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন আমাদের চোখের সম্মুখে পরিচিত কোন পল্লীগ্রামের একটি অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন দৃশ্য জাগিয়া রহিয়াছে।

"বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি', তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ,—চলে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে উঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য পরে
চিলের সুতীব্রধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত্ত শব্দ বাঁধা তরণীর,—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি;
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।" (মধ্যাহ্ন)

শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের দেশে যথার্থই "পরবাসী।" মধ্যাহ্নকালে স্বগ্রামের "সুষুপ্ত শান্তিরাশি," গ্রামপ্রান্তে "অরণ্যের স্নিগ্ধচ্ছায়া," "মধ্যাহ্নের অব্যক্ত করুণ একতান" সম্বন্ধে আজকাল তাহার অভিজ্ঞতা খুব কম। অবকাশপ্রাপ্ত শিক্ষিত বাঙ্গালি হিমালয়ের কাঞ্চনশৃঙ্গার সৌন্দর্য্যে এতই মুগ্ধ যে কবিকে তাহার জন্য

বঙ্গের পল্লীচিত্রে চতুষ্পার্শ্বিক বিষয়গুলি উজ্জলবর্ণে অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত স্বভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ আর কেহ নাই। মধ্যাহ্নে "শুষ্ক তৃণগন্ধ" ও "চীলের সুতীব্রধ্বনি" প্রবাসী বাঙ্গালির স্মৃতি-মন্দিরে যে পল্লীচিত্র প্রকাশ করিবে তাহার সৌন্দর্য্য পান করিতে করিতে পাঠককে কবির সহিত বলিতেই হইবে,—

"প্রবাস-বিরহ-দুঃখ মনে নাহি বাজে,—
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;"—(মধ্যাহ্ন)

বঙ্গের পল্লীচিত্রাধারে রবীন্দ্রনাথ যে কত সুন্দর খণ্ড চিত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন বলা যায় না।

"হেথা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল,
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারিপাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকণ কোমল !
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।" (পসারিণী)

"জনশূন্য পল্লাপথে" মধ্যাহ্ন বাতাসে যখন ধূলি উড়ে তখনকার একখানি ক্ষুদ্র চিত্র—

"স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে পড়েছে"—
(যেতে নাহি দিব)

আর একখানি ছবি—

ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলী সুপারি,
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, * * *
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগু পিছু।" (শৈশব সন্ধ্যা)

একখানি খুব ছোট ছবি—

"সন্ধ্যা বেলা লাঠি কাঁখে বোঝা বহি' শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।" (সামান্য লোক)

একখানি একটু বড় ছবি—

"যে-যার বোঝা মাথার পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠ্‌ল পল্লী শিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চ কণ্ঠে নৌকা ডাকে
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে। (অবসানে)

"সে ছিল এই গাঁয়ে!"—একখানি বেশ সুন্দর ছবি।

"এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক্-নামে তার জানে পরিচয়।" (গ্রাম)

পল্লীচিত্রের সংখ্যা হয় না। ছবির পর ছবি চলিয়াছে। বঙ্গের পল্লীজগত রবীন্দ্রনাথের গীতি-কাব্যের ছন্দে ছন্দে যে সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার তুলনায় অলকার কল্পিত সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। সুনিপুণ চিত্রকর চিত্রের অনুরূপ চিত্রফলক বাছিয়া লইয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার পল্লীচিত্রের মাপে ছন্দ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আশ্চর্য্য চিত্রবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। বৃহৎ চিত্র আবার তদনুরূপ বৃহৎ চিত্রপটে অঙ্কিত করাও অল্প শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে।

"সোণার ক্ষেত্রে কৃষক বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে' যায়, মাঝি বসে' গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়া গৃহস্থ জন আসিছে গ্রামের হাটে।"

(আকাশের চাঁদ)

সজীব চিত্র—"দিদি", "পরিচয়", "পুঁটু", "সঙ্গী", "সুখদুঃখ", "পুরাতন ভৃত্য", "দুই বিঘা জমি" প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করেন নাই। এই গতিশীল সজীব চিত্রগুলি যন্ত্রের

সাহায্যে যবনিকার উপর প্রতিবিম্বিত হইলে তবে তাহাদের যথার্থ সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়। "দিদি" ও "পরিচয়"—দুইখানি সুন্দর ফিলম্। যাহারা গায়ে রেশমি চাদর উড়াইয়া বিদ্যুতালোকে রাজনৈতিক বক্তৃতা করে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিনামূল্যে উপদেশ দান করিয়া নাম জাহির করিবার জন্য সারা জীবন ব্যস্ত তাহাদের চক্ষে হয়ত "পশ্চিমী মজুরের" ছোট মেয়ের কাজ কর্ম্মগুলি ভাল লাগিবে না। আবার,

"তারি ছোট ভাই
নেড়ামাথা, কাদা মাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মত পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্য্যভরে!"

দিদি ঘটি-বাটি মাজা শেষ হইলে,

"ভরা ঘট লয়ে মাথে
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর; জননীর প্রতিনিধি
কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।"

"পরিচয়" নামক কবিতায় কবি ইহাদের জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। একদিন একটি ছাগ বৎস বালকের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল। বালক ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলে "দিদি" ছুটিয়া আসিয়া,

"এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু,—দিদি মাঝে পড়ে'
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।"

রবীন্দ্রনাথের পশুপ্রীতি "পুঁটু" ও "সঙ্গী" কবিতায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। "হৃদয়-ধর্ম্ম" নামক কবিতায় তিনি মানবহৃদয়ে পশুপ্রীতির জন্ম সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায়, অল্প কথায় তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে পশুরে জন্ম হ'তে আপনার জানি
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটু রাণী।"

"মিলন-দৃশ্য" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার পশুপ্রীতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"হেসোনা হেসোনা তুমি, বুদ্ধি-অভিমানী,
একবার মনে আন, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজন-বৎসলা
জন্ম তপোবন হ'তে ;—সখা সহকার,
লতা ভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার,
মাতৃ-হারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে,—স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি' উঠিল কাঁদি পল্লব মর্ম্মরে
ছল ছল মালিনীর জলকলস্বরে,"—

"পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটিও একখানি সুন্দর ফিলম্। "কেষ্টা" আমাদের ছেলেবেলার "কেষ্ট দাদা।" তাহার কোলে, পিঠে, কাঁধে চ'ড়ে আমরা যাত্রা শুনেছি, রথ দেখেছি, পাঠশালায় গিয়াছি। তামাক সাজিতে কৃষ্ণকান্তের মত সিদ্ধহস্ত আর কোন ভৃত্যকে দেখা যায় না। সে নিজে প্রভুকে পরিত্যাগ না করিলে বাস্তবিক তাহাকে জবাব দেওয়া যায় না।

"দেবতার গ্রাস" কবিতাটি একখানি সম্পূর্ণ ফিলম্। এই কবিতার সমালোচনা হয় না। কবিতাটি যতবার পাঠ করা যায় চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। বাঙ্গালির ঘরের "দস্যু ছেলে" রাখালের মৃত্যুর ন্যায় এমন হৃদয়-বিদারক দৃশ্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের শিশু-প্রেম তাঁহার কাব্যের যে সকল স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কবি-হৃদয় সেই সকল স্থানে যেন একেবারে গলিয়া গিয়াছে। শিশুর হৃদয়ের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন কবি পাঠ করেন নাই। শিশুর একটুখানি হৃদয়ের মধ্যে সে যে কত মতে কত প্রকার আশার, আনন্দের, সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে তাহা কেহ বুঝে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যদি কোন বিশেষত্ব থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় শিশুর হৃদয়ের সহিত সহানুভূতিতে সেই বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিশু যে কেবল শিশু নহে, তাহার মধ্যে যে কবিত্ব আছে সেকথা আমরা বয়সের পরিণতির সহিত ভুলিয়া যাই। "শিশু" নামক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি

সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন সেগুলি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে অক্ষয় সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে। স্বর্গের সীমানায় সোনার রবির আলোর মত এই কবিতাগুলি সুন্দর। সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ যদি এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোন কবিতা না লিখিতেন তাহা হইলেও তাঁহার সোনার লেখনী অমর হইয়া থাকিত।

বঙ্গের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাণী জগতের সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের প্রাণী পর্য্যায়ের কোনটি তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা হইতে বাদ পড়ে নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বহির্জগতের উপর বাস্তবিক তাহাদের অধিকার খুব বেশী। গর্ব্বিত মানব মনে করে জগৎ তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। কবি জগতের দিকে চাহিয়া দেখেন মানব একটী বৃহৎ প্রাণী-পরিবারের একজন মাত্র। মানবের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে লোপ পাইলেও বসুন্ধরা প্রাণীশূন্য হইবে না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কবি আর কেহ বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। প্রকৃতির মহাকাব্য তিনি যে ভাবে পাঠ করিয়াছেন আমাদের বোধ হয় আর কোন বাঙ্গালী কবি সে ভাবে পাঠ করেন নাই। গরু চরে, মহিষ জলে ডুবে থাকে, "অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়, হস্তীশালায় হাতী"—এসব কথা সকলেই জানে কিন্তু "গ্রামের কুকুর কলহে মাতিয়া উঠে," "চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চিৎকার,"

"আমাদের এ নদীরকূলে
ভাঙ্গা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।
দূর গ্রামের দু'একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারাদিন ধরি।"   (কূলে)

"শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি," "ছায়াতলে সুপ্ত হরিণী," "বাঘের সাথে আসিত বাঘিণী,"

"রাত দুপুরে শিয়ালগুলো
ডেকে উঠে ঝাউ ডাঙাটার পরে"—

"মৃগশিশু সম পাতিল কাণ"—পশুজগতের এ সকল দৃশ্য এ পর্য্যন্ত কেহ চিত্রিত করেন নাই। "কস্তুরী মৃগ" "শ্যামল দুটি গাই," "ডালকুত্তা," "কাঠ-বিড়ালী" "দুটি পালন—করা ভেড়া," এমন কি, "বিপুল ভেট্‌কি মৎস্য," "আলেয়া,"

"বিড়ালছানাটী" পর্য্যন্ত কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গৃহপালিত পশুর প্রতি আমাদের, বিশেষতঃ বাঙ্গালির ঘরের ছোট ছোট ছেলেদের, কেমন একটা প্রাণের টান আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই জন্য গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার কথা বার বার শুনা যায়। "কচ্ছপেরা ধীরে, রৌদ্র পোহায় তীরে," "জোনাকি চমকে গাছে," "কীটের খোঁজে কে দেবে হাত, কেউটে সাপের গর্ত্তে ?" "পথে কেবল জোনাক জ্বলে, নাইক কোনো আলো"—এসব খাঁটি বাঙ্গালাদেশের জীব-জগতের ব্যাপার কাব্যের ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবির কল্পনা কীট পতঙ্গের অন্তরের কথা পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়াছে। বাঙ্গালির হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব সকল কবি ইতর প্রাণীর মুখে কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন!

"ভীমরুলে মৌমাছিতে হ'ল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।" (হার জিৎ)

"শুনঞ্জ" নামক ক্ষুদ্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রজাপতির দুঃখ শুনাইয়াছেন। মধুকর ও বোলতার মধ্যেও যে রেষারেষি আছে তাহা "হাতে কলমে" কবিতা পাঠে বেশ বুঝা যায়। "স্বদেশদ্বেশী" কেঁচো কিন্তু নীচতায় সকলকে হারাইয়া দিয়াছে।

পত্র পুষ্পে পরিশোভিত বঙ্গদেশে পক্ষীগণের অস্ফুট মধুরধ্বনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে সঙ্গীত বর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে তাঁহার কবি হৃদয় অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে। স্বভাবের শোভা বর্ণনায় কবি সেইজন্য পক্ষীর ঘর-কন্নার সুখ-দুঃখের কথা পাঠককে জানাইয়া থাকেন।

"ভাঙ্গা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।"

* * * *

"আমি ভাল বাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।"

"নিভৃত পাতায় ঢাকা কপোত যুগল," "দোয়েল দুলায়ে শাখা, গাহিছে অমৃত মাখা,"

"ওপার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,

থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।"

পাখীদের কত কথাই যে রবীন্দ্রনাথ জানেন তাহা বলা যায় না। "কোকিলের ডাক" সকল কবিরই ভাল লাগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "ঘুঘুডাকে, ঝিল্লিরবে," "কপোত দম্পতীর বিহ্বল কূজনে," এমন কি, "শালিকের ডাকে" যে আনন্দ লাভ করেন তাহা বর্ণনাতীত। কবে কোথায় "সারস ঘুমায়েছিল," "সারারাত টিটি পাখী, টিট্‌কারি দিয়ে" ডাকিয়াছিল, "কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন" পাঁকের গায়ে আঁকা ছিল, কোন ভগ্যবানের গৃহে, "সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী" তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। "সন্ধ্যা বেলা ছাদে ব'সে ডাকিতেছে কাক" —পক্ষী জগতের এই সামান্য ঘটনাটুকুও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "স্তব্ধ বাদুড়," "খঞ্জন," "দাড়কাক," "রাজহাঁস," "চীল," মাছরাঙ্গা," ময়ূর," "চাতক," "ময়না," "বউকথাকও," "টিয়া"—সকলেই কবির স্নেহের সামগ্রী, কল্পনার সাথী। চড়াই পাখী দেখিলে ছেলেদের যে আনন্দ হয় তাহাও রবীন্দ্রনাথ বর্ণন করিয়াছেন।

"চড়াই পাখীর দেখা পেলে
ছুটে যাই সব পড়া ফেলে।"

"ভার" ও "শত্রুতাগৌরব" নামক দুইটি কবিতা-কণিকায় "টুনটুনি" ও "পেঁচার" উক্তি যেমন রহস্যজনক তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বঙ্গমাতার দ্রুম-পরিচ্ছদ—সৌন্দর্য্যের লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে বর্ণ গন্ধ গীতি, দ্রুম লতায়, ফলে ফুলে পাতায় অনন্ত কাল ধরিয়া স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া রাখিয়াছে। উষায় মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় চন্দ্রালোকে আলোক আঁধারের অপূর্ব্ব রহস্য বাঙ্গালি কবির কল্পনাকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সৌন্দর্য্যের এমন বিরাট রঙ্গমঞ্চ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এখানে প্রকৃতির আনন্দোৎসব দেখিয়া দর্শকবৃন্দ মত্ততার সুখ অনুভব করে। দৃশ্যপটের অনন্ত বৈচিত্র্য আমাদিগকে ভাবিবার অবসর দেয় না। ঘন ঘন ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি বঙ্গমাতার দ্রুম পরিচ্ছদে পরিস্ফুট হইতে থাকে। বর্ষার শরতে বসন্তে প্রকৃতি দেবী নূতন নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইয়া আপনার সৌন্দর্য্য বৈভব প্রদর্শন করেন।

"————শরৎ কিরণ
পড়ে যাবে পূর্ণশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র' পরে,

নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে

আলোকে ঝিকিয়া।”— (বসুন্ধরা)

শরতকালের শোভা রবীন্দ্রনাথ অনেক বার বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু এস্থলে চিত্রের মৌলিক ভাবটি নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

“বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,

এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা।

বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,

পথ তরু-শাখে ধরেছে মুকুল,

রাজার কাননে ফুটেছে বকুল

পারুল রজনীগন্ধা।” (অভিসার)

চৈত্র সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের পুষ্পোদ্যান যেমন মনোরম! কবি খণ্ড সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় তরু-শাখার উল্লেখ যে কতবার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না।

“নারিকেলের শাখে শাখে

ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে”—(বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী)

“বকুলের শাখে পাখী গায়,” “অকম্পিত চম্পকের ডাল,” “আম্রশাখা,” “ঘন মহুল শাখা,” তা ছাড়া, কোথায় “বাঁশবন হেলায়ে শাখা” রয়েছে, “নিম্বশাখা দ্বারের পরে নুয়ে পড়ে” আছে.

“জলের পরে বেঁকে-পড়া

খেজুর শাখা হতে

ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি

ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।”

এসবও কবি লক্ষ্য করিয়াছেন। উদ্ভিদের যে অনুভূতি শক্তি আছে রবীন্দ্রনাথ সে কথা জগদীশচন্দ্রের পুর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন।

“অশ্বত্থ শাখার

প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা

যতটুকু বাজে তার”— (স্বর্গ হইতে বিদায়)

তাহাও তিনি অনুমান করিয়াছেন। কে বলে পাতার আবরণে বৃক্ষের সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়ে?

“রয়েছে বট, শতেক জটা

ঝুলছে মাটি ব্যেপে,

পাতার' পরে পাতার ঢেউ
উঠ্‌ছে ফুলে' ফেঁপে'।" (ভোরের পাখী)

তরুদেহের সকল স্থানে সৌন্দর্য্য মাখান রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যের তরঙ্গে বন, উপবন, লতাকুঞ্জ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। "শাল বন," "বেণু বন," "তাল বন," "শ্যামল তমাল বন," "বাবলা বন," দুর্ভেদ্য নিবিড়তার সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালাদেশের নানা স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলেও, "লজ্জাবতী লতা," "মাধবী লতা," "সহকার," "ঝাউ ঝাড়," "কদম্ব গাছের সার," "শিমুল," "সেফালি," কদলী সুপারি প্রভৃতির অভাব নাই।

"কুটীরেতে বেড়ার পরে
দোলে ঝুম্‌কা লতা .
সকাল হতে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা।" (সব পেয়েছির দেশ)

এমন সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে আম্র মুকুলের গন্ধে মৌমাছিরা যে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে আশ্চর্য্য কি! "শর্ষে ক্ষেতে উঠচে মেতে মৌমাছিরা,"

"বকুল—শাখায় জানি না কি পাখী
কি জানা'ল ব্যাকুলতা!
আম্র কাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে,
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে
মৌমাছি উড়ে আসে।" (পিয়াসী)

কবি নিজে একদিন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের কথা-জাগানে!
"আজকে কেবল বউ কথা কও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প পাগল শাখে,
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সামনে অশোক টগর চাঁপা চামেলি"— (সম্বরণ)

বঙ্গদেশে বৃক্ষের নামের শেষ নাই কিন্তু কবিরা গোটাকতক নামজাদা বৃক্ষ ছাড়া অপর সকলগুলিকেই উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উপেক্ষিত বলিয়া কোন জিনিষ নাই। মাদার, কচু, আমলা, কুষ্মাণ্ড, শাক,

কাঁচকলা, তিসির ক্ষেত, শনের ক্ষেত, এমন কি কঞ্চির ন্যায় উদ্ভিজ্জ জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিষ তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

"কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তাঁর পুষ্পক বিমান।" (যথার্থ আপন)

* * * *

বকুল কহিল শুন বান্ধব সকল
গন্ধে আমি সর্ব্ব বন করেছি দখল।
পলাশ কহিল শুনি মস্তক নাড়িয়া
বর্ণে আমি দিগ্‌দিক্ রেখেছি কাড়িয়া।
গোলাপ রাঙিয়া উঠি করিল জবাব
গন্ধে ও শোভায় বনে আমারি প্রভাব।
কচু কহে গন্ধ শোভা নিয়ে খাও ধুয়ে
হেথা আমি অধিকার গাড়িয়াছি ভূঁয়ে।
মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিৎ হইল কচুর!"
(গুণের অধিকার ও দেহের অধিকার)

* * * *

"বাগ্‌দি বুড়ি চুবড়ি ভরে
শাক তুলেছে পুকুর ধারে।"

* * * *

"কহিল কঞ্চির বেড়া,—ওগো পিতামহ,
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড় অহরহ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উচুঁ করে থাকি চিরকাল!
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়তে,
নত হই, ছোট নাহি হই কোন মতে!" (নম্রতা)

* * * *

"বাব্‌লা শাখারে বলে আম্রশাখা, ভাই
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই?
হায় হায় সখি তব ভাগ্য কি কঠোর!—
বাব্‌লার শাখা বলে দুঃখ নাহি মোর!

বাঁচিয়া সফল তুমি, ওগো চূতলতা,
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা !" (প্রকার ভেদ)

* * * *

"আম্র তোর কি হইতে ইচ্ছা যায় বল্ ?
সে কহে হইতে ইক্ষু সুমিষ্ট সরল !—
ইক্ষু, তোর কি হইতে মনে আছে সাধ !
সে কহে হইতে আম্র সুগন্ধ সুস্বাদ !" (আকাঙ্খা)

* * * *

"আম্র কহে—একদিন, হে মকালে ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;—
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,
মূল্য ভেদ সুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি !"

(পর বিচারে গৃহ-ভেদ)

বৃক্ষ ফল ফুল—ইহাদিগের জীবনেও ক্ষুদ্রত্ব নাই। ইহারাও সাম্য নীতি বুঝে, ভেদ-জ্ঞানের নিন্দা করে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আশীর্ব্বাদে এখন আর কবির কল্পনার উপর উদ্ভিদের প্রচ্ছন্ন চেতনা ও অনুভূতি শক্তির গূঢ় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ ধাতু পদার্থেরও যে চেতনা শক্তি আছে তাহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কবিতার ভাষায় ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি কবিতার প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য বাঙ্গালাদেশের দ্রুম লতার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "ভগ্ন, শুষ্ক. দীর্ঘ, শীর্ণ, দেবদারু তরু"র ন্যায় বৃক্ষগণ প্রাণহীন নহে। বৃক্ষলতাদির মূল মানব দেহের অসংখ্য শিরা উপশিরার ন্যায় শত সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বঙ্গজননীর হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। দেশমাতার হৃদয়-স্পন্দন সেই জন্য তাহারা যেমন অনুভব করে অসাড়-হৃদয় বাঙ্গালি সেরূপ অনুভব করে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়ের অসাড়তা দূর করিবার জন্য মাতৃদেহের বেশ-ভূষার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় শিল্পকৌশলে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

গুরুগিরি।

(লেখক—নিমচাঁদ)

আমার ছাত্রজীবন Dr. Johnsonএর Schoolএ আরম্ভ হয়। বেত্রদণ্ডের discipline সেই জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। পাঠ্যাবস্থার ইতিহাস আমার সর্ব্বাঙ্গে indelible black and blueর রেখাপাত করিয়াছে। গুরুগিরি করিবার burning desire বোধ হয় সেই কারণে আমি বরাবর হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেদিন আমি শিক্ষকের আসন অধিকার করিলাম সেদিন জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির রাস্তায় উপস্থিত হইয়াছি ভাবিয়া আনন্দে গোটাকতক mental summersaultএর অভিনয় করিয়াছিলাম।

যদিও শিক্ষকতা সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের Schoolএ আমার হাতে খড়ি কিন্তু আমার প্রকৃত training began like charity at home—আমার বিশ্বাস, যে teacher আপন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে শিখে নাই সে কখনও successful educationist হইতে পারে না। আমার ছেলেরা আমাকে সাক্ষাৎ যম মনে করিত। বড়দাদার সম্বন্ধী আমার একটী ছোট ভাইপোকে পঞ্জিকার অনন্তচতুর্দ্দশীর ছবিতে যমরাজার চেহারা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে সেই দণ্ডধারী ভীষণমূর্ত্তি তাহার কাকাবাবুর। বলা বাহুল্য, আমি এই complimentএ অত্যন্ত শ্লাঘান্বিত হইয়াছিলাম। পিতৃত্ব লাভ করিয়া যদি হিন্দু নীতিশাস্ত্রের মতে পুত্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সংসার অচল হইয়া পড়িবে। "Spare the rod and spoil the child"—Dr. Johnsonএর এই golden mottoর আমি বড়ই পক্ষপাতী ছিলাম।

অতি অল্পদিন মাষ্টারি করিবার পর frequent and impartial application of the cane আমার সুনাম রটাইয়া দিল। আমার ছাত্রদের মধ্যে যাহারা worse than the worst ছিল তাহারা পর্য্যন্ত আমার সুখ্যাতি করিত—বলিত, আমার কাছে মুড়ি মিছরির একদর। Classএর best boy, বড়মানুষেরগ রের দুলালচাঁদ, proprietor বা head masterএর ছেলে, সুবিধা পাইলে কারেও

আমি বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিতে ছাড়িতাম না। উপরওয়ালারা কিন্তু আমার executive functionsএর উপর অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে এমন হইল যে আমাকে প্রতিদিন ছেলেদের guardianদিগের complaintএর উপর একটা না একটা explanation submit করিতে হইত। লেখনী চালনা করিতে করিতে বেত্র চালনার কস্‌রত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি বাধ্য হইয়া কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। আমার বিরুদ্ধে insubordinationএর অভিযোগ হইল। কমিশন বসাইয়া আমার কার্য্য কলাপের বিচার হয়। যদিও, as the result of this I was dismissed কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অভিযোগের মাথা—মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া মন্তব্য প্রকাশ হইল সেটি যেমন interesting তেমনি instructive, আর তা ছাড়া, full of impertinent and sweeping remarks,—এমন wonderful document কেহ কখন কল্পনা করে নাই। আমি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছিলাম, বিচারক ঘুড়ির মত গোঁত্তা খাইয়া মন্তব্যে সেগুলি carefully avoid করিয়া গেলেন। Blackstoneএর মত eminent jurist, parental authority বেত্রাকারে শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিতে আপত্য করেন নাই, একথা আমি বলিয়াছিলাম। আমি যে শাসনদণ্ডের indiscriminate use করি নাই কিন্তু impartial use করিয়াছিলাম, ইহার প্রমাণ দিয়াছিলাম। যত unruly boys classএ ছিল সকলে মিলিয়া আমার পক্ষে এ বিষয় সাফাই সাক্ষী দিয়াছিল। আমার চাকরি যাওয়াতে যা না ক্ষতি হইয়াছিল, আমার সাফাই সাক্ষীদিগকে বিচার-সমিতি অবিশ্বাস করাতে তদপেক্ষা অধিক দুঃখ হইয়াছিল। বেত্রদণ্ডের salutary effect যাহারা হাড়ে হাড়ে feel করিয়াছিল সেই সকল দুর্দ্দমনীয় ছাত্রেরা যে ভবিষ্যৎ জীবনে great administrative ability দেখাইবে একথা আমি আমার valedictory addressএ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলাম। আমার prophesy আশ্চর্য্যভাবে ফলিয়াছে। Dr. Johnsonএর আশীর্ব্বাদে কিনাঙ্কিত-করপল্লব আজ policeman's baton ধারণ করিয়া সমাজের শত্রুদিগকে শাসন করিতেছে, cat-o'-nine tails apply করিয়া old offenderএর পৃষ্ঠদেশে Summary trialএর রায় মুদ্রিত করিতেছে, whip-stock handle করিয়া সমগ্র দেশের cooly labour control করিতেছে।

চাকরি গেলে নূতন চাকরি যোগাড় করা সোজা কাজ নয়। মুরুব্বি, সুপারিশ, খোসামোদ প্রভৃতির আশ্রয় না লইলে তখনকার দিনে মাষ্টারি জুটিত না। একটী Schoolএর managing committeeর প্রভুরা আমার অবস্থা বুঝিয়া অতিশয় fair and reasonable terms offer করিলেন। Head মাষ্টারি করিতে হইবে, মাহিনা একশত টাকা, কিন্তু ৴৬৫ টাকা লইয়া full amountএর রসিদ দিতে হইবে। আমি শুনিয়াছিলাম আমার মত graduates যাহারা law পড়িতেছে তাহারা যৎসামান্য মাহিনা লইয়া দু'এক বৎসর কোন স্কুলে মাষ্টারি করে আর Schoolওয়ালারা সেই জন্য বেশ দু'পয়সা রোজগারের সুবিধা পায়। আমি committeeকে বলিলাম, যদি আমার disciplinary authorityর উপর হস্তক্ষেপ করা না হয় তাহা হইলে আমি উক্ত terms accept করিতে পারি। কর্ত্তারা সম্মত হওয়াতে আমি ভারি খুসি হইলাম। গুরুগিরি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আবার চাকরি করিতে লাগিলাম।

বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার School collegeএ successful teacher হইতে গেলে blooming politician হইতে হইত। আমার নূতন Schoolএ গুরুগিরির চূড়ান্ত করিবার সুবিধা পাইলাম না। অনেক চেষ্টার পর একজন বিখ্যাত professional politician দ্বারা পরিচালিত Schoolএ মাষ্টারি যোগাড় করিলাম। স্বত্বাধিকারী এমন high principleএর লোক যে প্রতি কথায় Burke, Glads one প্রভৃতির উক্তি না আওড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতেন না। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া আমি অল্পদিনের মধ্যে student মহলে well known হইয়া পড়িলাম। এমন public meeting ছিল না যাহাতে আমি দু'কথা বলিতে পেছ-পা হইতাম। আমার illuminating lectures in the class and on the platform শুনিয়া ছেলেরা আমার নাম "রাজনৈতিক বাজবৌরি" রাখিয়াছিল। এক কথায়, আমার মত popular teacher সে সময়ে কলিকাতা সহরে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের মধ্যে schoolএ বেত্রদণ্ডের discipline কতকটা lax ছিল। আমার বোধ হয় constant reference to politics in the class room in season and out of it was considered as the worst infliction on the young mind—যাহা হউক, আমার ব্যবসা একরকম বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল।

আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ Summer vacation সময় চাকরি হইতে বরখাস্ত হইলাম। শুনিলাম, স্বত্বাধিকারী নাকি ছেলেদের নিকট দুই

মাসের মাহিনা অগ্রিম আদায় করিয়া লইয়া মাষ্টারদিগকে লম্বা ছুটির মরসুমে জবাব দিয়া থাকেন। এরকম mercenary policy in the matter of education আমার বরদাস্ত হইল না। আমি উকিলের চিঠি দিয়া proprietorকে জানাইলাম যে without notice তিনি আমাকে dismiss করিতে পারেন না। শেষে Calcutta Small Cause Courtএ নালিশ করিয়া এক মাসের মাহিনা আদায় করি।

গুরুগিরি কি ঝকমারি! তখনকার দিনে educational institutions officialised হয় নাই, সুতরাং বেচারি মাষ্টারদিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। যে schoolএ ই যাই একটা না একটা দোকানদারির জ্বালায় অস্থির হইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয় লইলাম। তিনি আবার পরীক্ষা না করিয়া কাজে বাহাল করেন না। ভাল! Second-year classএ Macaulay পড়াইবার হুকুম হইল। আমার মনের মত subject—politics and patriotism এর থলি খালি করিয়া lecture দিতে আরম্ভ করিলাম। আধঘণ্টা গলাবাজির পর classএর কোণ্ থেকে back bencherদের ভিতর হইতে একটা হতভাগা ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে at the top of his voice আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"Sir, who is that author who has said, "Patriotism as well as politics is the last resort of a scoundrel?" প্রশ্ন শুনে আমি ত যেন petrified হইয়া গেলাম। কি ভয়ানক! এ যে আমার গুরু Dr, Johnson এর কথা! আমার ভাব গতিক দেখিয়া ছেলেরা হাসা সম্বরণ করিতে পারিল না। ব্যাপারখানা বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে পঁহুছিয়াছিল। তার পর দিন First-year classএ পড়াইবার আদেশ হইল। ইতি মধ্যে অপর মাষ্টারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে Metropolitan Institutionএ politics একেবারেই চলে না। দ্বিতীয় দিনে poetry পড়াইতে হইবে শুনিয়া ভাবিলাম politicsএর whirlpool হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। কি দুর্দ্দৈব! আবার Dr. Johnson! আবার সেই কথা!

"With slavish tenets taint our poison'd youth,
And lend a lie the confidence of truth."

Dr Johnsonএর London নামক কবিতার এই দুইটি line বেশ কায়দা করিয়া explain করিতেছে এমন সময় একটা over brisk গোছের ছেলে suggest করিল, "Slavish tenets" অর্থে "the political creed of

those who like the So-called Bengalee patriot repeat in a Slavish manner the teachings of others," আমিত অবাক্! নিজের উপর বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলাম, "মশাই, আমাকে School departmentএ trial দিন।" তিনি Entrance classএ পড়াইতে বলিলেন।

নূতন শিক্ষককে studentরা প্রথমটা যাচাই করিয়া লয়। তাহাকে দেখিবামাত্র unbroken ঘোড়ার মত ছেলেরা হঠাৎ vicious হইয়া উঠে। আমি তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। classএ প্রবেশ করিবামাত্র "বাজবৌরি" "বাজবৌরি" শব্দ চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। দুই চারিটা ছেলে পায়রা উড়াইবার শিশ্ দিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিল। আর আমাকে পায় কে? একধার থেকে সপাসপ্, সপা-সপ্, সপাৎ সপাৎ সপাৎ শব্দে বেত্রাঘাত আরম্ভ হইল। প্রথম পঙক্তি finish করিবার পূর্ব্বেই আমার পিছন হইতে "হয়েছে" "হয়েছে" শব্দে তর্জ্জন করিয়া স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে নিরস্ত করিলেন। আমি কতকটা জড়-সড় হইয়া গেলাম। বিদ্যাসাগরমহাশয় নিজে আমাকে সঙ্গে লইয়া libraryতে গেলেন। সেখানে আমাদের মধ্যে যে কথা বার্ত্তা হয় তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। প্রথম প্রশ্ন তিনি এমন গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এখনও সেটি আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে।

"মাষ্টারি করবার আগে কি আড়গোড়ায় চাকরি করতে?"

"আজ্ঞে দুষ্ট ছেলে শাসন করতে হ'লে—

"Coachmanএর মত চাবুক ধরতে হয়?"

"Dr. Johnson বলেছেন, "Spare the rod—

"আমার Schoolএ ও নিয়ম খাটে না। বাঙ্গালির ছেলের পক্ষে "Use the rod and spoil the child"—এই কথা মেনে নিতে হবে।"

এইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমার যে একটা ভুল ধারনা ছিল সেটাতে হটাৎ যেন বিষম ধাক্কা লাগিল। তিনি যে ইংরাজী জানিতেন, আমার জানা ছিল না। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে করিলাম বোধ হয় দু'চারটা ইংরাজী বোল্ আওড়াইতে শিখিয়াছেন। দেখা যাক্, পণ্ডিতের বিদ্যা কতদূর, এই ভাবিয়া বলিলাম—

"But Sir, Blackstone has laid down in his—

"রাখ তোমার Blackstone—কালাপাহাড়ের principle কালা বাঙ্গালির দেশে খাটে না।"

"A great authority like Dr. Johuson—

"তার ডাক্তারি ডাল ভাত খাওয়ার ধাতে খাটে না। Herbert Spencer কি বলে?"

আমার মুখে আর কথা নাই, মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে Herbert Spencer এর নাম শুনিয়া আমার "অহং" বলে জিনিষটা এমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল যে তাহার মুখের দিকে তাকাইতে আর সাহস হইল না। ইতিমধ্যে তিনি librarianকে Herbert Spencer on Education পুস্তকখানি আনিতে বলিয়া স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাবু তাড়াতাড়ি পুস্তক আনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিলে তিনি পাতা উল্টাইয়া একস্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে পড়িতে বলিলেন:

"For whereas domestic and school discipline, though they should not be much better than the discipline of adult life should be somewhat better ; the discipline which boys meet with at Eton, Winchester, Harrow, &c. is worse than that adult life—more unjust and cruet. Instead of being an aid to human progress which all culture should be, the culture of our public schools, by accustoming boys to a despotic form of government and an intercourse regulated by brute force, tends to fit them for a lower state of society than that which exists. And chiefly recruited as our legislature is from among those who are brought up at such schools, this barbarizing influence becomes a hindrance to national progress."

আমার পাঠ শেষ হইলে বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, Roger Ascham কি বলে দেখ।" তিনি নিজেই School-master নামে বিখ্যাত পুস্তক হইতে পড়িতে লাগিলেন। "Love is better than fear, gentleness than beating, to bring up a child rightly in learning."

গুরুগিরির একটা নূতন এবং noble ideal আমি এতদিনে লাভ করিলাম। সশরীরে সেই ideal আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। আমার "গোরুগিরি" আর তিষ্টিতে পারিল না।

"—Noble grace that dashed brute violence
With sudden adoration and blank awe."

Miltonএর comus কবিতার এই দুইটি lineএর অর্থ এতদিনে বুঝিতে পারিলাম।

"—folly doctor-like controlling skill."

Shakespearএর এই কথাটাও মনে পড়িল। ডাক্তারদের উপর অভক্তি হইল। "Dr. Johnson আজ হইতে তোমাকে ত্যাগ করিলাম, আর তুমি আমার Skill in handling the cane কিছুতেই control করিতে পারিবে না।"—এই বলিয়া আমি হস্তস্থিত বেতসখণ্ড জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে শঙ্কর ঘোষের লেনে ফেলিয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আঃ করলে কি ? তোমার photograph নিতে হলে যে ঐ বেতখানির দরকার হবে।"

আমারও ঐ রকম একটা ambition ছিল। Cambridgeএর Fitzwilliam museumএ Gerard Dowএর তুলিকা প্রসূত ferulaধারী Schoolmasterএর যে বিখ্যাত ছবি আছে তার নকলে বেত্রধারী schoolmaster নিমচাঁদের একখানা স্বদেশী ছবি প্রস্তুত করাইবার জন্য অনেক দিন হইতে উপযুক্ত চিত্র করের সন্ধান করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সে ambition চিরকালের তরে মুছিয়া দিয়াছেন।

পরিণাম।

(লেখক—শ্রীস্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ)

বৈশাখ মাস। নিদাঘ সৌরকরতপ্ত দুর্গাপুর গ্রামখানি, দূরবিসর্প বিটপীশ্রেণী, পরিচ্ছন্ন ও সযত্নরক্ষিত লতা, গুল্মাবৃত গৃহ, কুমুদ-কহ্লার পরিশোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্করিণীগুলিকে লইয়া—"রঘুপতি-হৃদে হীরকের হারের" ন্যায় ঝলমল করিতেছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। এমন সময় শ্রীযুক্ত হরিমোহন স্মৃতিভূষণ মহাশয় গ্রামোপকণ্ঠস্থিত বিপনি হইতে মৎস্য ও তরকারী লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন; তাঁহার পদদ্বয়

দেখিলে বোধ হয় তিনি যেন অনেক পথ চলিয়াছেন, গণ্ডে, কপোলে, বক্ষে দরদর ধারে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। মাঝে মাঝে বলিতেছেন "ভগবান, সামর্থ দেও নাই, তবে কন্যারত্ন দিয়াছিলে কেন? যদি দ্বাদশ বর্ষেও কন্যাকে সৎপাত্রে দান না করিতে পারি, পিতৃপুরুষ জল পাইবে না; আমারও অনন্ত নরক বাস হইবে," ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত অনেক কথা মনে মনে বলিতে বলিতে বৃদ্ধ স্মৃতিভূষণ মহাশয় আসিয়া গৃহের বাহিরদারে উপস্থিত হইলেন। কন্যা সুশীলা পিতাকে আসিতে দেখিয়া দ্রুতগতি, পদধৌত করিবার জন্য জল আনিয়া দিলেন ও কক্ষিলম্বিত হুকাটী লইয়া তামাকু সাজিতে গেলেন। ইত্যবসরে লাল পেড়ে সাড়ী পরিহিতা স্মৃতিভূষণ-গৃহিণী আসিয়া সযত্নে ব্যাজন আরম্ভ করিলেন। তামাকু আসিল। তামাকু খাইতে খাইতে বলিলেন "মা! সুশীলা আজ রাত্রে দু'জন ভদ্রলোক আহার করিবেন, ঐ মাছ আনিয়াছি, যাহা ভাল বিবেচনা কর, করিও।"

সুশীলা কমল পদবিক্ষেপে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলে, গৃহিণী আদ্যান্ত শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, কোন পত্র পেলে নাকি? ছেলের বাপ, ভাই কেহ আসিবে না কি?"

"না! আশ্চার্য্যের কথা আর বল কি? ছেলে আসিতেছেন তাঁহার জনৈক বন্ধু সহিত আমার কন্যা দেখিতে, দেখিয়া শুনিয়া যদি মতমত হয় তবে অন্য কথা, নচেৎ দেখাই"—

"হ্যাঁ! বেশ কথা! আমার মেয়ে দেখে, যে কেউ খারাপ ব'লবে ব'লে ত আমার বোধ হয় না। তা কি জানি ইংরিজি প'ড়লে আবার দুধের ছেলে চশ্‌মা চোখে দিলে অনেক রূপ দেখ্‌তেও পারে। তবে জোর ক'রে ব'লতে পারি—যা'ক সে কথা এখন রেখে দাও। অন্য বিষয় দেখিতে হইবে। যাহাতে ছেলের মনস্তুষ্টি হয়, সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি আজ ডাকঘরে ব'সেছিলুম সেই সময় বসু মহাশয়—এই সময় গৃহিণী স্ত্রীস্বভাবসুলভ-চাতুর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "ও যিনি কলকেতায় কাঠের আপীযে ২০০৲ টাকা মাইনার চাকুরি করেন—হ্যাঃ হ্যাঃ কি বল্লেন?"

"কি আর বলব; তুমিই কথা শুনিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আদি অন্ত সমস্ত সংবাদ দিয়া দিলে।"

"তিনি ব'ল্লেন যে আজকালকার ছেলেদের একটু গান, বাজনা, দুটো আদব কায়দার কথা—যা'ক সে তুমি বুঝিবেনা। এই মনে কর কোন বড় শালী পান সাজিয়া আনিয়া একটু সুর কাটিয়া—ভাবী জামাইবাবুর হস্তে দিল ইত্যাদি ইত্যাদি—

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন—তাহা করিতে নাই, বলা বেশী হইবে না—তাহা ভদ্রপরিবারে শুনিতেও নাই।" তবে বসুমহাশয় যে বিষয়টী অতিরঞ্জিত করেন নাই, ইহা অবিশ্বাস্য—তবে স্মৃতিভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ সমস্তই বিশ্বাস করিয়াছেন। কারণ বসুমহাশয় উচ্চ বংশোদ্ভূত ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে মিথ্যা কথা কেন বলিবেন। এই সব নাকি অনেক স্থলে আজকাল ক'লকাতায় হইয়া থাকে—

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন। তিনি সগর্ব্বে, বলিয়া উঠিলেন "প্রাণ থাকিতে ত আমার এখানে ওসব হইবে না, কি এখনও ত যাহ'ক বাহাত্তেরা হও নাই—কি হয়েছ নাকি? আমার ত ছেলের অভিভাবক কেহ আসিবে না, বন্ধু নিয়ে আসবে শুনেই, এ ছেলের হাতে আমার সুশীলাকে দিতেই অনিচ্ছা"—শুনিয়াই স্মৃতিভূষণ মহাশয় যেন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এখন আমি কন্দর্পের ন্যায় রূপবান, বৃহন্নলার ন্যায় গুণবান ও বুদ্ধিমান ছেলে তোমার কন্যার জন্য পাই কোথা? এ ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারি—বি, এ, পাশ, ইহা অপেক্ষা ভাল আজকাল কোথা পাইব। আর অবস্থাও বেশ ভাল।"

"যাহা তোমার ভাল বোধ হয় কর, আমাকে বলিবার আবশ্যক কি?" বলিয়া গৃহিণী ঘনঘটাচ্ছন্ন প্রাবৃট-প্রদোষের ন্যায় মুখ করিয়া "সুশী," "সুশী" বলিয়া গগন-বিদারিণী স্বরে কন্যাকে ডাকিয়া পিতার আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আহারে বসিলেন। অর্দ্ধকোরক-দগতা, প্রাতঃশিশিরস্পৃক্তা, বালারুণরঞ্জিতা নবকন্দলের ন্যায় সুশীলা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া পিতাকে ব্যঞ্জনাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বহস্তে সমস্ত রাঁধিয়াছেন কিনা, সেই জন্যই আবেগ এত বেশী। রান্নাঘরের গরমে গণ্ড দুইটী লাল ও ঘর্ম্মাক্ত, মধ্যে মধ্যে অঞ্চলাগ্রভাগ দিয়া মুখ মুছিতেছেন ও পিতা আহার করিয়া উত্তম হইয়াছে বলিতেছেন আর আনন্দে, বালিকার হৃদয় নাচিতেছিল। সুশীলা অত্যন্ত সরলা।

এখনও অনেক সুশীলা আছে। যেখানে বালিকা-বিদ্যালয় হয় নাই, ইংরাজি হাব-ভাব প্রবলবন্যার ন্যায় প্রবেশ করিয়া স্বভাবসুলভ বাঙ্গালি মেয়েদের কোমল প্রাণের "মৃদুনি কুসুমাদপি" বৃত্তিগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই সেখানে দুটী একটী সুশীলা এখনও পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে পূর্ব্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভয়াবহ পাশ্চাত্য ভাবে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিতে যাইয়া কি সর্ব্বনাশই

আমরা না করিতেছি। প্রত্যেক যুবকই একথা এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। হায়! অনুকরণের কি বিষময় ফল।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় আহারান্তে বহির্ব্বাটী গমন করিলেন। কতকগুলি তালবৃন্তে লিখিত পূর্ব্বপুরুষদিগের পুঁথী ছিল তাহা দেখিতে দেখিতে একটু তন্দ্রা মত আসিয়াছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক পান চিবাইতে চিবাইতে ফাঁকা তেড়ি কাটা, ফরাসডাঙ্গার কালপেড়ে ধুতির একভাগ স্কন্ধোপরি বেশ মনোরম করিয়া ফেলিয়া সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে আসিয়া"স্মৃতিভূষণ মহাশয়, স্মৃতিভূষণ মহাশয়" বলিয়া ডাকিলেন স্মৃতিভূষণ মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া "আসুন মাষ্টার মহাশয়, কি মনে করিয়া এই বেলা দ্বিপ্রহরে?" আগন্তুক গ্রাম্য মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া যখন এফ, এ, দিতে গিয়ে ৮।৯ খানা ইংরাজি বই, কোনক্রমেই আয়ত্বাধীন করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা উচ্চ শিক্ষার আশা ছাড়িয়া দুর্গাপুর গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ভার, ২৫৲ টাকা মাসিক বেতন হিসাবে, স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। মাষ্টার মহাশয় রসিক লোক। গ্রাম্য মাষ্টারগণ যেরূপ হইয়া থাকেন আমাদের ভূপেন বাবুও তদ্রূপ। অযাচিত ভাবে পরোপকার ও বাস্তবিক দরকার হইলে "শরীরটা সকাল থেকে কেমন বোধ হইতেছে, মাথা ভয়ানক ধরিয়াছে—চোখ লাল মাঝে মাঝে হইত অতএব সে জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না" এ সমস্ত অজুহাত দিতে কখনই মাষ্টার পুঙ্গব পরাঙ্মুখ হইতেন না। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "আজ যদি দয়া করিয়া একটা ভাল দিন দেখিয়া দেন তবে আমি একটা কার্য্য আরম্ভ করি।" "কি কার্য্য আরম্ভ করিবেন" "একটা দোকান দিব মনে করিতেছি"—"বেশ, বেশ এমন সুমতি আমাদের দেশের ইংরাজি শিক্ষিত যুবকদিগের হইতেছে শুনিয়াও প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। আচ্ছা, দিন দেখিয়া দিব, আজ আমার সুশীকে দেখিতে স্বয়ং পাত্র নিজে ও তাঁহার জনৈক বন্ধু আসিতেছেন! আমরা ত হাল, চাল্ সব জানি না, আপনি যদি দয়া করিয়া একবার সন্ধ্যার সময় আসেন ও হারমোনিয়মটী লইয়া আসেন তবে বড়ই ভাল হয়। সম্মতি প্রকাশ করিয়া সঙ্গীত-রসজ্ঞ মাষ্টার মহাশয় ২।৩ বার তেড়ি ঠিক আছে কিনা, হাত দিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে স্মৃতিভূষণ-গৃহত্যাগ করিলেন।

স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের আর নিদ্রা হইল না। কিছুকাল পরে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ দেখিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন।

গৃহিণী রন্ধন কার্য্যে নিজেই ব্যস্ত হইয়াছেন। পাড়ার নববিবাহিতা ও স্বামি-প্রেম গর্ব্বিতা সদা হাস্যমুখরা প্রফুল্লনলিনি আসিয়া কেশবিন্যাস ও কাপড় পরাইতে

বসিয়াছেন। স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে দেখিয়া প্রফুল্ল একটু লজ্জিতা হইলেন, তাঁহার পাকা আপেল সন্নিভ গণ্ডদ্বয় অধিকতর রক্তাভ হইল, স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন "মা! তোমরা দেখিয়া, শুনিয়া না দিলে, কেই বা দিবে, তোমারই ছোট বোন যাহা করিলে ভাল হয় কর। মা আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী—"— প্রফুল্ল এই কথার পর একটু সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "এমন সুন্দর মোচ দেখিলে, আর কিছু বলতে হবে না" এই বলিয়া সুশীলার গায়ে একটু ঠিপিলেন, সুশীলাও তাহার দিকে তাকাইয়া ভ্রুকুটিত করিলেন এবং পিতার দিকে তাকাইলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। প্রাগুক্ত মাষ্টার মহাশয় এবার চূড়িদার পাঞ্জাবী কালরংয়ের পমসু, তেড়ি পাটে-পাটে বেশ করিয়া বসাইয়া, এসেন্সের গন্ধে ভরপুর হইয়া, হারমোনিয়াম লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া "আজকেন তোর হ'ল এত বেলা" ইত্যাদি ডি, সপ্টে বাজাইয়া গলা মিশাইলেন। কিছু পরেই দুইটী যুবক বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া হরিভূষণ বাবু, হরিভূষণ বাবু বলিয়া ডাকিলেন। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন আসুন আসুন আস্‌তে আজ্ঞা হউক ইত্যাদি অনেক ভদ্রতা ও বিনয়সূচক কথায় আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ও অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিলেন ও আসুন আসুন বলিয়া বসিতে বলিয়া তাহার চাকরকে পদধৌত করিবার জল আনিতে বলিলেন। বলাবাহুল্য মাষ্টার মহাশয় সিগারেটের বাক্স বাহির করিলেন। দেখিলে দুই জনকেই সমবয়স্ক বলিয়া অনুমিত হয়। চেহারা এক কথায় বলিতে বেশ সুন্দর। একজনের মুখ দেখিলে বেশ সরল প্রকৃতির ও বিংশ শতাব্দীর হিসাবে ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হয়। দেখিলেই ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়। অন্য যুবকটিকে দেখিলে বোধ হয় বড় চালাক, চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা চঞ্চল, মুখমণ্ডল বেশ গর্ব্বস্ফীত ও কথাবার্ত্তা বেশ ইংরাজী ধরণের, সামান্য বিষয়েই ইংরাজীতে কথা বলেন। তবে বেশ বিন্যাশ দ্বিতীয় বর্ণিত যুবকটিরই বেশী হাল ফ্যাসানের। চুল সাহেবী ধরণে ছাটা, গুম্ফরাজি বন্য-মহিষের শিংদ্বয়ের ন্যায় তবে আশ্চর্য্য চশমা কাহারও নাই। নীল চশমা আছে তাহা সন্ধ্যায় আবশ্যক হয় নাই। তাহা আমরা পরদিন জানিতে পারিয়াছিলাম। যুবক দুটীর নাম যথাক্রমে জিতেন্দ্র ও নীতিশচন্দ্র। নীতিশচন্দ্রই পাত্র। জিতেন্দ্র কায়স্থ কিন্তু নীতিশের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মাষ্টার মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া নীতিশচন্দ্র বলিলেন—"বাঃ আপনার ত বেশ গলা"—"কি ক'রে জান্‌লেন"—"জানে আর কি ক'রে, শুনে দেখে, পড়ে অবশ্য বিষয় বিশেষে However you have a taking voice—(যাহা হউক

আপনার বেশ সুমধুর স্বর)—মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"কিছু জানি না, এমনই একটু সময় কাটানর জন্য—তা বেশ, একটা হক না! না! আপনাদের একটা হ'ক আমার ত আছেই।"

এমন সময় স্মৃতিভূষণ মহাশয় আসিয়া মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন দয়া করিয়া যদি আপনারা একবার গৃহাভ্যন্তরে আইসেন তবে বড় ভাল হয়—মাষ্টার মহাশয় নীতিশবাবু ও জিতেন বাবুকে অনুরোধ করিলেন। নীতিশচন্দ্র বলিলেন "চলুন! আপনিই আগে চলুন।"

একখানি সাধারণ গৃহস্থ ভাবে সজ্জিত গৃহে জল খাবারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তিন জন গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্মৃতিভূষণ মহাশয় পুর্ব্ব হইতেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। বলাবাহুল্য যে পুর্ব্বপরিচিত প্রফুল্লনলিনী ও সুশীলার মাতা সকলেই অন্তরাল হইতে স্ত্রী-স্বভাবের পরিচয় দিতে ছিলেন। নীতিশ ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন—oh ! they have killed the fatted calf. জিতেনও বেশ সুন্দর ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন "Yes certainly for the prodigal son."—নীতিশ বলিলেন, যা— তুই ভারি ফাজিল।

জিতেন্দ্র বলিলেন—আচ্ছা! এখন বস। নীতিশচন্দ্র মাষ্টার মহাশয়কে বসিতে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্পেটাসনে উপবেশন করিলেন। গৃহে তৈয়ারি অনেক রকম রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য দেখিয়া নীতিশচন্দ্র ও জিতেন্দ্র বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হইলেন। জিতেন্দ্র যদিও সরল প্রকৃতির লোক কিন্তু স্থান বিশেষে মুখর ছিলেন। নীতিশ আহার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সামান্য আহার করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পান খাইতে যাইতেছেন এমন সময় স্মৃতিভূষণ মহাশয় অলঙ্কার নিক্কন শব্দে পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়াই ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলিলেন, "কই কিছুইত খাইলেন না।" এইটে খান, এটা আমার কন্যার নিজে হাতে তৈরি, আপনি খান এটা সবারই ইচ্ছা" ইহাতে জিতেন নীতিশের কানের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন "খাওহে খাও" কারণ "A lady's suit or aministel's strain By a knight should not be heard in vain."

নীতিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন' I have আমি যাহা পারি খাইয়াছি, আচ্ছা দেখি এই বলিয়া ক্ষীরনির্ম্মিত আহার্য্যটি গলাধঃকরণ করিলেন এবং বলিলেন "বা; অতিসুন্দর,—জিতেন পুনরায় পুর্ব্বের ন্যায় বলিলেন "The maker or the thing made ?" (প্রস্তুত কারক না খাদ্য) এবার বুঝি মাষ্টার মহাশয় শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন জিতেন বাবু—"Both" (উভয়েই)

দেখিলেই বুঝিবেন।" মাষ্টার পুঙ্গব বেশী ইংরিজি সাহস করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলেন না, কারণ নিজের বিদ্যা তাহার জানা ছিল।

আহারান্তে বহির্ব্বাটী আসিয়া দেখেন তামাকু ইত্যাদি প্রস্তুত। জিতেন তামাকু খান্‌না নীতিশ খান, ২।৪ টান দিয়া সিগারেট টানিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে প্রফুল্ল সুশীলাকে গাল টিপিয়া দিয়া একগাল হাসি হাসিয়া গৃহে গমন করিলেন। সুশীলা যেন আজ কত অপরাধ করিয়াছে। সে দোষীর ন্যায় চুপ করিয়া, মাতা যাহা বলিতেছেন তাহাই করিতেছেন।

এমন সময় স্মৃতিভূষণ মহাশয় গৃহিনীকে কন্যা সাজাইতে বলিয়া বহির্ব্বাটী যাইয়া জিতেনের সহিত সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া নীতিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার শরীর'ত বিশেষ সুবিধার নয়" নীতিশ "না, এই রকমই, বিশেষ অসুখ কিছুই নাই" স্মৃতি—"আপনারা কাল যদি থাকিয়া যাইতেন, তবে ভালরূপে দেখিতে পারিতেন, রাত্রে দেখা, তবে আমি সময় দেখিয়া এই সময়ই ভাল বিবেচনা করিয়াছি"—নীতিশ—"কাল থাকা অসম্ভব, কাল ৪৸৹টার ট্রেন আমাকে ধরিতেই হইবে। দেখা মনে করুণ একসময় দেখিলেই হইল" স্মৃতি—"বেশ বেশ। বাবা যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর" এমন সময় হরি চাকর আসিয়া বলিল—"বাবা, আসিতে বলুন" "আচ্ছা, জিতেনবাবু, তবে চলুন যাই, আমার কন্যাটিকে একবার দেখিবেন, মাষ্টার মহাশয় চলুন যাই।"

স্মৃতিভূষণ মহাশয় অগ্রে ও তিনটি যুবক তাঁহার পশ্চাতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যাইয়া দুইখানি কাঠ কেদারায় নীতিশ ও জিতেন বসিলেন।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় যখন সুশীলাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন আমাদের বোধ হইল যেন মহামুনি কণ্ব সমভিব্যাহারে শকুন্তলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রফুল্ল সুশীলাকে ফুলের বালা, সিঁথি, ইত্যাদি ফুলভারে সাজাইয়া "নীলাবাসে তনু আবরিয়া"—দেববালার ন্যায় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

সুশীলাকে অত্যন্ত নয়নতৃপ্তিকর দেখাইতেছিল কারণ যৌবনের প্রথম মলয় মারুত সবে মাত্র তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। বালিকাসুলভ সারল্যের সঙ্গে প্রথম যৌবন বিকাশের সলজ্জভাব মিশিয়া কেমন একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। সেটি অনুভবের—বর্ণনার নহে। যাঁহারা সবুজ পত্রাবৃত অশোক ফুলগাছ বসন্তাগমে লালফুল ভরে নত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন ও দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন ও নয়নারাম বলিয়া চক্ষু ফিরাইতে চাহেন নাই তাহারাই সুশীলার রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুশীলা নীতিশের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। নীতিশ তখন যেন আরক্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে বিশেষ পটু ছিলেন না। কারণ আমরা অজ্ঞাত।

জিতেন্দ্র তখন তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য্যের পূর্ণবিকাশ করিয়া সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

জি। আপনি কি কি বই পড়িয়াছেন?

সুশী। পদ্যপাঠ ২য় ভাগ, কথামালা ও সরল শরীরপালন।

জি। ইংরাজি কিছু পড়িয়াছেন কি?

সুশী। না!

এই সময় স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন "আমাদের গৃহস্থের ঘরে ইংরাজীর দরকার নাই বুঝিয়াই ইংরাজী পড়াই নাই এবং গ্রামে পড়াইবারও সুবিধা নাই। তবে এখন শিখিবে, শিখিতে আর কদিন।"

জি। হ্যাঃ তাত বটেই। আচ্ছা আপনি—আপনার হাতের লেখাটী কেমন দেখি।

এই সময় কার্য্যতৎপর মাষ্টার মহাশয় একখানি কাগজ ও কালি কলম আনিয়া দিলেন। সুশীলা দুর্গা নাম, হরি শরণম্ ইত্যাদি লিখিলেন।

জি। আচ্ছা আপনি পদ্যপাঠ হইতে একটু পড়ুন দেখি?

সুশীলার সম্মুখে পদ্যপাঠ, কিন্তু নবকিশলয়সন্নিভ অধর শুষ্ক, গণ্ড আরক্তিম, চক্ষু অবনত ছলছল। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের "মা পড়, মা একটু পড়"—একথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা জানি না। সুশীলা পড়িতে পারিলেন না। নীতিশ বলিলেন "আচ্ছা আর পড়িয়া দরকার নাই"—অগত্যা সুশীলা বাঁচিলেন।

উভয়েই মন্ত্রমুগ্ধ; সেই সলজ্জ আরক্তিম গণ্ড, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলদাম-ফুলমালা শোভিত ভুজবল্লরী, বিনম্র, তরল আধমুকুলিত লজ্জা দুই জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবককে মুক করিয়া রাখিল। স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন, "তবে এখন ও যাউক"—জিতেন—"হ্যাঃ আর কি?" কিন্তু নীতিশের "নয়ন না তিরপিত ভেল"—

বহির্ব্বাটী আসিয়া অনেক কথাবার্ত্তার পরে আহারান্তে যখন শয়নাগারে গেলেন তখন জিতেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"নীতিশ কেমন দেখলে?" নীতিশ বলিলেন "এক রকম মন্দ নয়।"

জি। বল পছন্দ হ'য়েছে।

নী। You are a fool না—যাক্—যা বল্লাম, তাই ব'ল। বেশী কথা বলে নিজেকে Commit ক'রে ফেল না।

জি। দেখ—সব বিষয়ে ওকালতি চাল্‌টা কি ভাল, ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই ভাল।

নী। আচ্ছা, আমি যা ব'ল্লাম তাই ব'ল। কারণ অন্য সময় বলিব। দেখিও কথাবার্ত্তায় চালচলনে যেন কোনরূপ ভুল না হয়। তোর যদি আর একটু ধার থাকিত তা' হ'লে কি তোর এত কষ্ট হয়।

যাহা হউক এইরূপ বাকবিতণ্ডার পরে উভয়েই সুষুপ্তির শান্তিময়ী ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিলেন।

প্রাতঃকালে ঠিক ৫টার সময় স্মৃতিভূষণ মহাশয় বাবুদ্বয়কে গাত্রোত্থান করাইয়া, হস্তমুখাদি প্রাক্ষালনান্তে কিছু জলযোগ করাইয়া নিজে সঙ্গে ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইয়া কলিকাতার গাড়ী ধরাইয়া দিলেন। জিতেন নীতিশের উপদেশানুসারেই স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের কথার উত্তর দিলেন। স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন "জিতেনবাবু যাহাতে আমি শীঘ্র খবর পাই, দেখিবেন" জিতেন "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন।

নীতিশ গাড়ীতে উঠিয়াই বলিলেন "The native pandit has bothered my soul out. I am not going to marry his daughter" (পণ্ডিতটা আমার প্রাণ বের ক'রে দিয়েছে আমি এর মেয়ে বিয়ে করব না)—

জিতেন। সে কি গো—চোখ ফেরে না—এর মধ্যেই এই ভাব, এর মানে কি?

নী। দেখ্‌লে না মেয়েটা কি জঙ্গলী—না জানে ইংরিজি, না জানে কিছু, তার পর একেবারে লজ্জাবতীলতা—কি impertinent (অবাধ্য বা একগুঁয়ে) প'ড়তে ব'ল্লে কিছুতেই প'ড়ল না। ফুলের সাজে কি আমি ভুলি—তবে দেখাচ্ছিল মন্দ নয়, তাই দেখ্‌লুম। আবার কি? However a pleasure trip indeed. (যা'হক একটু আনন্দ-ভ্রমণ হ'ল)

জি। তোমার এ কথায় ভাই আমি বড় দুঃখিত হলুম। তোমার মতলব যদি এইরূপই ছিল, তবে আগে বলা উচিত ছিল।

নী। দেখ তুমি আমাকে নীতিশাস্ত্র শিখিও না—আমি ওদের ওসব বাজে tricks বুঝি (চালাকি)।

জি। তোমার ত সবই চালাকি—বিশ্বাস ত ক'রতে শেখনি—শিখ্‌বেও না।

নী। তোমায় বিশ্বাস করি কেন ?

জি। সে আমার ভাগ্য।

নী। আচ্ছা—যাহ'ক ঠিক ক'রব এখন—তাহার পর নীতিশচন্দ্র ইংরিজি বাঙ্গালার খিঁচুড়ি করিয়া যে সব বিষয় বলিতে লাগিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে হয়।

গাড়ী যথা সময় শিয়ালদহ আসিয়া পৌঁছিল। দুজনে একখানি ফেট্‌ন্ ভাড়া করিয়া ছাত্রাবাসে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্যান্য সকল জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন মেয়ে ইত্যাদি—যথাযথ উত্তর দিয়া স্নানার্থে নীতিশ ও জিতেন কলতলায় গমন করিলেন।

আহারান্তে দুজনে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন এমন সময় একজন হ্যাটকোটধারি বাঙ্গালীসাহেব আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন—May I come in (আমি কি আসিতে পারি)। Yes, sir, welcome (হ্যাঃ আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক) —জিতেন চেয়ার টানিয়া বাঙ্গালী সাহেববাবুকে বসিতে দিলেন। বাবুটী ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া জিতেন উঠিয়া অন্যঘরে গেল।

অনেক ইংরাজিতে ভদ্রতাসূচক কথাবার্ত্তার পরে বলিলেন আপনি আমার Sisterকে (ভগ্নীকে) দেখিতে যাইবেন কথা আছে—আজ কি যাইতে পারিবেন। ওখানেই Dinnerর (সান্ধ্যভোজের) বন্দোবস্ত হইবে। নীতিশ সম্মতি প্রকাশ করিয়া অনেক সাহেবি ভদ্রতা করিয়া বাবুটীকে বিদায় দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিতেন, জিতেন বলিয়া ডাকিলেন। জিতেন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিহে ? ওটী কে ?

নী। ও আমার একটী পুরোন বন্ধু। আজ রাত্রে ওদের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ।

জি। বেশ শিগ্‌গির করে এস। তুমি ত' আবার কোন মজা পেলে সব ভুলে যাও।

নী। হ্যাঃ তোমার মত কিনা যে শ্বশুর বাড়ীর নাম শুনিলেই ন্যাজ মুখে করে দৌড়ই—আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না।

জি। ও দোষ ত' তুমি দেবেই। আচ্ছা ভাই দেখা যাবে।

নীতিশ আজ বিকাল হইতেই দাঁত পরিষ্কার করিয়া ২।৩ বার ক'রে সাবান মাখিয়া মুখে অনেক বিলেতি মালিস মাখিয়া—বিলেতি পায়রাটী সাজিয়া—সন্ধ্যা হইতে না হইতেই বাহির হইয়া পড়িলেন। ছাত্রাবাস হইতে ট্রামে যাইয়া Bristol Hotelর সম্মুখ হইতে একখানি মোটরগাড়ী ভাড়া করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে

"জল্‌দি চালাও" হুকুম দিলেন। মোটর পথচারি গরীব পথিকের ভীতি-সঞ্চার করিয়া রসভ-নিন্দিত স্বরে অনেক প্রকারের শব্দে কর্ণ ঝালাপালা করিয়া ৬॥০ সময় একখানি বৈদ্যুতিক আলো সমুজ্জ্বলিত দ্বিতল গৃহের সম্মুখে আসিয়া ধুমদিগরণ করিয়া দাঁড়াইল। সফর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলে আমাদের নীতিশ-সাহেব অবতরণ করিয়া ভাড়া দিলে সফর সেলাম দিলে—নীতিশ সাহেবি ফ্যাসনে ঘাঁড় বাকাইয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মুখস্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ রায় অর্থাৎ মিস্ রায়ের পিতা আসিয়া নীতিশকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং মিস্ জে রায়ের অর্থাৎ তাঁহার কন্যার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তৎপরে করমর্দ্দনান্তে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন। মিস্ রায়ের ভ্রাতা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সাহেবটী আসিয়া নীতিশের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং বলিলেন "নীতিশবাবু এই আমার ভগ্নি"। এই সময় মিস্ রায় গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, নধর ওষ্ঠদ্বয়কে গোলাপ-কুড়ি করিয়া—মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন—"বাবা আমাদের already introduce (আগেই পরিচিত) ক'রে দিয়েছেন"—

"আচ্ছা, জ্যোতিঃ এখন একটা গান কর, শুনি, এর মধ্যেই ডিনার ready (প্রস্তুত) হ'য়ে যাবে এখন।" জোতিঃ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া—অরগ্যান খুলিয়া "যদি এসেছ যদি এসেছ দয়া করিয়া কুটীরে আমার"—গান আরম্ভ করিলেন। গানের মুচ্ছর্ণায় ভাব, পদে ভাব, অরগ্যানে চম্পকাঙ্গুলি সঞ্চালনে ক্লান্তি ও ক্লান্তি-জনিত অঙ্গবিশেষের প্রসারণ ও সংকোচন নীতিশের মস্তিষ্ক বিচলিত করিল। স্বরলহরী সেই কার্পেটাবৃত ঘরে আছড়াইয়া পড়িয়া নীতিশের পদপ্রান্তে আসিয়া বাধা পাইয়া যেন বলিতে লাগিল "দেহি পদপল্লব মুদারং।"

কিছুক্ষণ এইরূপ গানবাজনা হইতেছে এমন সময় মিঃ সিন্‌হা আসিয়া সেই কার্পেটাবৃত ঘরে প্রবেশ করিলেন। মিস্ রায় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া কটাক্ষ করিলেন। এই কটাক্ষের অর্থ আমরা শেষে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মিঃ সিন্‌হা একজন বিলাত প্রত্যাগত এণ্ট্রাস পাশ করা ব্যারিষ্টার। কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুই হইত না। কারণ বাঙ্গালা দেশে আর বাহিরের চুণকামে লোক ভুলে না। তবে মিঃ সিন্‌হার সাহেবির কোন ত্রুটি ছিল না। বিলাতে গিয়া তিনি "সোসাইটীতে" মিসিয়াছিলেন। চালচলন বেশই শিখিয়া-ছিলেন। তবে শেখেন নাই যাহা শিখিতে গিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন হইতেই পাঞ্জাবে ব্যবসা করিতে যাইবেন এই মনস্থঃ করিয়াছেন। শুনিয়াছেন মিস রায়ের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে ও আজ একটী ভদ্রলোক তাহার সহিত পরিচিত

হইতে আসিবেন তাই মিঃ সিন্‌হা বুকে পাষাণ বাঁধিয়া শেষ দেখা করিতে আসিয়াছেন। মিঃ সিন্‌হা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানি, ঘটনা পরম্পরায় তাহা বোধগম্য হইবে।

এমন সময় একজন মুসলমান বাবুর্জ্জি আসিয়া বলিল "সাহেব, খানা খুলেগা।" মিঃ রায় (মিস্ রায়ের দাদা) বলিলেন "হাঁ জলদি"

সকলে মিঃ সিন্‌হাও নীতিশকে সঙ্গে করিয়া অন্য ঘরে গেলেন। ডিনার প্রস্তুত। মিস রায় ও নীতিশ পাশাপাশি বসিলেন।

নীঃ—আমার সৌভাগ্য যে আপনার ন্যায় বিদুষীর সহিত পরিচিত হইলাম।

মিস্ রায় লজ্জিতা হইলেন, গণ্ড আরক্তিম করিলেন কি আপনিই হইল জানি না,—তিনি বলিলেন।

"নীতিশবাবু, ও কথা কেন বলেন, আমারই সৌভাগ্য—কিন্তু এ সৌভাগ্য চিরস্থায়ী কিনা, জানি না।

নীতিশ।—সে ত আপনার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

আরও অনেক কথা হইল। রাত্রি ৯৷৹ টার সময় নীতিশ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে রবিবারে পুনরায় আসিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া একখানি গাড়ী আনিবার জন্য "বেয়ারা" পাঠাইলেন। যথা সময় গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। নীতিশ সকলের সহিত করমর্দ্দন ও শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া কম্পমান বক্ষে ডাকিয়া আস্তে আস্তে মিঃ রায়ের নিকট বিদায় লইলেন। মিস্ রায়ও সহানুভূতি দেখাইলেন। শেষে মিস্ সিন্‌হা ও মিস্ রায়ের সহিত কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা আমরা জানি না। তবে দুজনকেই বিশেষ দুঃখিত দেখিতে পাইলাম আর মিস্ রায়কে বলিতে শুনিলাম "আপনি পাঞ্জাব যান, সময় মত নিশ্চয়ই মিলিব"—

নীতিশের গাড়ী আসিয়া ছাত্রাবাসের সম্মুখে দাঁড়াইল। নীতিশ গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া ছাত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখেন জিতেন একখানি আইনের পুস্তক পড়িতেছেন।

নীতিশকে দেখিয়াই, জিতেন উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন—"বন্ধু বাড়ী কি খেলে"—

নীঃ—কি আর খাব ? শরীরটা কেমন করিতেছে।

জিঃ—কেন কি হ'ল। তা হ'লে আলো নিবিয়ে তাড়াতাড়ি শু'য়ে পড়।

নীতিশ তাহাই করিলেন। কারণ আজ তাঁহার জিতেনকে ততটা ভাল লাগিতেছিল না। শয়ন করিয়া কেবল সেই মিস্ রায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রায় ১২টার সময় নিদ্রা গেলেন। জিতেন কিন্তু ইত্যাগ্রে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সকালে গাত্রোত্থান করিয়া "ল'কলেজে" গেলেন। কলেজ হইতে আসিয়া স্নানাহার করিয়া শুইয়া আছেন। তখন বেলা প্রায় একটা এমন সময় একটী দারোয়ান আসিয়া একখানি পত্র নীতিশের হাতে দিল। নীতিশ পড়িয়া চিঠির কাগজ ও রঙ্গিন খাম বাহির করিয়া পত্রের জবাব দিলেন। জিতেন কেবলমাত্র দেখিলেন, কোন কথা বলিলেন না। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন ও ভাবিলেন যে নীতিশ আমাকে কিছু না বলিয়া চিঠি পাইয়া পড়িয়া উত্তর দিল ও পত্রখানি সযত্নে বাক্সের মধ্যে উঠাইয়া রাখিল। আমাকে পড়িতে দিল না। নীতিশের এমন কোন গোপনীয় বিষয় নাই যাহা আমাকে বলে না, ইহার কারণ কি? জিতেনের সন্দেহ হইল কিন্তু দারোয়ানের সম্মুখে কিছুই বলিল না। দারোয়ান তাহার নাগরাইর শব্দে সিঁড়ি কাঁপাইয়া, গৃহ ঝঙ্কারিত করিয়া চলিয়া গেলে জিতেন অভিমান সঞ্জাত রোষভরে বলিলে—"নীতেশ, এর মানে কি?"

নীঃ—"কই কি? শরীরটা মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না"—

জিঃ—আচ্ছা ওসব চালাকি রাখ,—আসল কথাটা কি বলত?

নীঃ—কই কি? ওই চিঠির কথা—কাল যে আমার বন্ধুটি এসেছিলেন, তাঁরই ভগ্নি লিখিয়াছেন, তাঁর শ্বশুর বাড়ী সংক্রান্ত কথা আছে তাই দেখাইলাম না।

জিঃ—নীতিশ, কোন দিন ত তোমার এ বন্ধুর কথা বল নাই, অন্যান্য অনেক বন্ধুর কথা বলেছ—আর একদিন যাইয়াই এত ভাব হইয়া গেল যে ভদ্রলোকের মেয়ে তোমার মত বুড়ো এক পুরুষ মানুষকে চিঠি লিখিল আর শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে লিখিল?

নীঃ—আছে হে আছে—সে অত্যন্ত গোপনীয়?—

জিঃ—নীতিশ—যাহা তুমি জান, তাহা আমার জানার সমান। এই আজ নূতন শুনিলাম যে কোন গোপনীয় বিষয় তুমি আমাকে কহিতেছ না। কোন বিষয় শুনিলে, জানিলে, তুমি আমাকে না বলিয়া থাকিতে পার না, আজ আর কিনা, তুমি কোন কথাই বলিতেছ না। যাক ভাই যদি সুখী হও কর, কিন্তু সাবধান মুখ হাসাইও না। আর আমি কাল রাত্তির থেকে তোমাকে লক্ষ্য করিতেছি। দেখ নীতিশ সাবধান—যাহা করিতেছ আমি কিছু কিছু বুঝিয়াছি।

নীতিশ ভাবিলেন জিতেন বুঝিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ করা হইবে না; কিম্বা কোন প্রকারে আমার মনের ভাব জানিতে দেওয়া হইবে না "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" ভাবে চলিতে হইবে।

নীঃ—কিছুই করিতেছি না, ভাই যদি কিছু করি সবই তুমি জানিতে পারিবে। তুমিত জান তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ।

জিঃ—জানিতাম, বিশ্বাসও ছিল—কিন্তু সে বিশ্বাস তুমি রাখিতে দিচ্ছ কই ?—

নীতিশ বলিলেন,—আচ্ছা দেখিও।

* * * *

চাকর ডাকিয়া জলখাবার আনিতে দিলেন। জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। যথা সময়ে গৃহে ফিরিলেন! নীতিশের কিন্তু মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নহে। জিতেন তাহা লক্ষ্য করিলেন। নীতিশ জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি শুক্রবার। এবং নিজে ২।৩ বার শুক্র, শনি রবি করিলেন। জিতেন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রবিবারে কিছু আছে নাকি ?—

নীঃ—হ্যাঃ মিস্ রায়ের...না...একটা কাজে একটা ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে যাইতে হইবে।

জিতেন কোন কথা আর না বলিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া একখানি পোষ্টকার্ড নীতিশের পিতার নিকট লিখিলেন।

রাত্রে জিতেন সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া নীতিশকে বুঝাইলেন ও বলিলেন ইংরাজী জানা, গান বাজনা জানা মেয়ে অনেক এখন ভদ্রলোকের ঘরে পাওয়া যায়। তুমি আর সেখানে যাইও না। নীতিশ জিতেনের কথায় কোন বিশেষ জবাব না দিয়া "তুমি আসিতেছ" বলিয়া ফিরিয়া শুইয়া নিদ্রার ভান করিলেন।

এদিকে ব্যাপরে গুরুতর হইয়া উঠিল। নীতিশের পিতা পত্র পাইয়া ভাবিলেন ওসব বাজে কথা,—যা হক যতশীঘ্র পারি পুত্রের বিবাহ দিব। গৃহিণীত একদম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্র ব্রাহ্ম বিবাহ করিবে শুনিয়া কাঁদিয়া, না খাইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া জিতেনকে এক পত্র দিলেন। জিতেন সে পত্র পাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিল ও ভাবিল কি করিব। আমিত আজ ৪ দিন নীতিশের কোন খবরই পাই না—অনেক স্থান খুঁজিলাম কিছুই সংবাদ পাইলাম না, নীতিশের মার পত্রের উত্তর যাহা সম্ভব দিলেন।

পরদিন জিতেন বসিয়া প্রাতঃকালে চা পান করিতেছেন—ইহা প্রায় নীতিশের মিস্ রায়ের সহিত দেখা করিবার একমাস পরের কথা।—এমন সময়—ছাত্রা-

বাসের একটি "ল ক্লাসের" ছাত্র আসিয়া একখানি চতুষ্কোণ পুরু কাগজের খাম হাতে দিয়া বলিলেন—"এই জিতেন বাবুর আজ সুপ্রভাত, মেমসাহেব পত্র দিয়াছেন"—জিতেন বসিতে বলিল "না বোধ হয় অন্যকেহ লিখিয়াছেন –দেখি—" যে ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।—

খাম খুলিয়া জিতেন যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন ও হতাশ হইলে লোকে যেমন বলে "ভগবান কি করলে"—জিতেন তাহাই বলিলেন ও বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

চিঠিখানি নীতিশের নব পরিণীতা পত্নীর লিখিত।

My Dear Jitan Babu

You dearest friend Nitish Babu asks me to request you to come and see us—husband wife—this evening at 55. A. ......Ballygunge.

Yours sincerely

Joyati.

জিতেন প্রথম ভাবিলেন দেখা করিব না। কিন্তু নীতিশকে দেখিবার জন্যই তাহার ইচ্ছা এত প্রবল হইল যে জিতেন পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে বালিগঞ্জে গেলেন। পোষাকের বিশেষ বাহার নাই; তবে ভদ্রলোকের যেরূপ হওয়া উচিত তাই! জিতেনকে দূর হইতে দেখিয়া নীতিশ ঘরে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিতেন নীতিশকে দেখিয়া নিজেই লজ্জিত হইলেন। নীতিশ জিতেনকে ফটক খুলিয়া দিয়া বলিলেন "জিতেন, তোমার ত কাল বিকালে আসিবার কথা ছিল, আজ দুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে যে"—

জিঃ "দোষ হইয়া থাকে চলিয়া যাই।" নীতিশ—"সেকি ভাই, আজ প্রায় দেড়মাস দেখি না" এই বলিয়া বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিলেন ও উপর্য্যুপরি চুম্বন করিলেন। জিতেনের গণ্ড বহিয়া অশ্রু নির্গত হইতেছে দেখিয়া নীতিশ বলিলেন "জিতেন ওকি?"

জিঃ তোমার কি করিয়া চলিতেছে—

নীঃ কেন; এখানেই আছি গরমের ছুটী হইলেই কলিকাতা ত্যাগ করিব এবং শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছেন, যে গোরক্ষপুর স্কুলে ৬০, টাকা বেতনে একটি মাষ্টারি ঠিক করিয়াছেন। আমিও তোমার বৌদিদি সেখানেই থাকিব। ভাই তোমার সহিত দেখা হইবে না এই বিশেষ কষ্ট।

জিঃ আচ্ছা—বুঝিলাম। বাড়ীর কোন সংবাদ রাখ।

নীঃ বাবাকে ত জান। তিনি আমাকে তাঁহার গৃহ প্রবেশ করিতে নিশেধ করিয়াছেন। মা এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া স্ত্রী লইয়া দেখা করিতে গেলাম। মা আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করিলেন না। মুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও আমাকে অনেক অভাব জানাইবার পর ১০০৲ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি কিছু সাহায্য কর, বড় ভাল হয়। আমি তোমার সহিত দেখা করিতাম কিন্তু আমার মেসে যাইতে বড় লজ্জা করে। ●

জিঃ আচ্ছা—কাল ১০৲ টাকা পাঠাইয়া দিব। গোরক্ষপুর যাইয়া পত্র দিও। আমি বাড়ী যাইব। বাড়ীর ঠিকনায় পত্র দিও। নীতিশ আর একটী কথা আমার কাষ্টমস্ আপিসে চাকরি হইয়াছে আমি ১লা জুলাই হইতে কার্য্য আরম্ভ করিব। বাড়ীতেই পত্র দিও তাহারা এখানে পাঠাইলে আমি পাইব। এমন সময় হাসিতে হাসিতে নীতিশের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন "তুমিত আচ্ছা লোক জিতেন বাবু এসেছিল আমায় সংবাদ দিতে হয়—"

জিতেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীমতীকে বসিতে বলিয়া। বলিলেন—"ভাল আছেন ত, শরীর ভাল ?"

জ্যোঃ আজ্ঞে হ্যাঃ আপনাকে ক্লান্ত দেখাইতেছে। ঠাণ্ডা সরবত কিছু দিই কি বলেন।"

নীঃ আন না, বেহারাকে বল।

হুকুমাস্তে একখানি ডিসোপরি কাঁচের গ্লাসে পরিষ্কার বরফ মিশ্রিত লেমনেড আসিল। জিতেন পান করিয়া বলিলেন—আপনাদিগকে ধন্যবাদ।

তৎপরে বিকালে নীতিশ বলিবেন চল জিতেন তিনজনে গাড়ী করে একটু হাওয়া খাইয়ে আসি। জিতেন কিছুতেই রাজি হইলেন না। অগত্যা নীতিশ বলিলেন "আচ্ছা—টাকার কথাটা ভুলিও না মাঝে মাঝে দেখা করিস—পত্র দিস্। এই সময় জ্যোতিঃ আসিয়া জিতেনের হাত ধরিয়া বলিলেন আমাদের ভুলিবেন না। মাঝে মাঝে আসিবেন। আপনার শান্ত, অমায়িক প্রকৃতিতে আমি বড়ই প্রীতি হইয়াছি। (ইংরাজীতে বলিলেন) জিতেন যথাযথ উত্তর দিয়া—হাঃ ভগবান বলিয়া বিদায় লইলেন।

এদিকে দুর্গাপুরে স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে আজ বিবাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পাত্রটী এম, এ, সুশালাকে দেখিয়া বিনা পনে বিবাহ করিলেন। ছেলেটী

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত হইয়া ডেপুটি হইয়াছেন। তার পর তিনি কোথায় গিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না।

নীতিশ গোরক্ষপুরে গেলেন। আইনের পুস্তকগুলি সঙ্গে লইলেন। এম এ, আর দেওয়া হইল না আর কখনও হয় নাই। বলিয়া রাখা উচিৎ সাহেবের অঙ্গ বিশেষ খাদ্য পানও নীতিশ অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে নীতিশ বি, এল পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে ওকালতি করিবেন ঠিক করিয়া সঞ্চিত টাকা গুলি পোষ্ট আপিস হইতে আনিলেন। স্ত্রীকে বলিলেন এবার কিছুদিন কষ্ট করিয়া চালাইতে হইবে। জ্যোতি বলিল "তুমি যদি কষ্ট করিতে পার তবে আর আমি কেন পারিব না"—

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইবার দিন স্থির হইল। নীতিশ ঘুনাক্ষরেও জানিতেন না যে তাঁহার স্ত্রী গোপনে মিঃ সিন্‌হার সহিত পত্র লেখালিখি করে। ইতিমধ্যে নীতিশের একটী কন্যা হইয়াছিল। মেয়েটী দুই বৎসর হইয়া টাইফয়েড জ্বরে মারা পড়ে। নীতিশের কোমল হৃদয় তাহাতে অনেকটা দমিয়া গিয়াছিল। আজ এ কি ভীষণ ব্যাপার তাঁহার চোখের উপর ঘটিল। যে স্ত্রীর জন্যে তিনি তাঁহার অত্যাজ্য বন্ধু, স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় পিতা, আনন্দময় সংসার সব ত্যাগ করিয়া গোরক্ষপুরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন সেই দুষ্টা আজ তাঁহাকে না বলিয়া, রাত্রে পলায়ন করিয়াছে। ২।৩ দিন পরে জানাগেল যে "জ্যোতির্ময়ী" লুধিয়ানার মিঃ সিন্‌হার নিকট চলিয়া গিয়াছে। মিঃ সিন্‌হা গোরক্ষপুরে আসিয়া অজ্ঞাত ভাবে ছিলেন ও নীতিশের কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বদিন জ্যোতিকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। অনেকে বলিল নীতিশ বাবু "কেশ" (মোকদ্দমা) করুণ। নীতিশ কোন পরামর্শই না শুনিয়া ও কিছু হইয়াছে এরূপ পর্য্যন্ত কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া মিঃ রায়কে এক পত্রদিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। হাতে তাঁহার মাত্র ৩০০৲ টাকা। দেখিলেন জ্যোতিরায়ের পিতা আর তাঁহাকে সাহায্য করিবে না এবং নীতিশের ইচ্ছাও হইলনা যে ভ্রষ্টাস্ত্রীর পিতার সহিত দেখা করেন। জিতেনকে সংবাদ দিবেন মনে করিলেন কিন্তু অভিমানে, লজ্জায় তাহাও বাধা পড়িল। একটী মেসে থাকেন আর কি করিবেন এই ভাবেন। একদিন খবরের কাগজে দেখিলেন যে ১৫০৲ টাকা বেতনে একটী বিলিতি কোম্পানি একজন দেশীয় খ্রীষ্টান গ্রাজুয়েট কেরানি চায়। নীতিশ বড় সাহেবের সহিত দেখা করিলেন ও নিজের নাম "স্যামুয়েল রবিন্সন্" বলিয়া চাকরি গ্রহণ করিলেন। সাহেবও আইন পাশ আছে দেখিয়া অন্যান্য কার্য্য হইবে আশায়

চাকরি দিলেন। আইনজ্ঞ নীতিশ ১০।১৫ দিনের মধ্যেই খ্রীষ্টান হইলেন ও উক্ত নাম গ্রহণ করিলেন। সেই পাদরি সাহেবের সার্টিফিকেট আনীলে যথা সময়ে দাখিল করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। কারণ সাহবে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনার সার্টিফিকেট কোথায় নীতিশ বলিয়াছিলেন যে তিনি তাহা দার্জ্জিলিঙ্গে যেখানে কার্য্য করিতেন সেখানে রাখিয়া আসিয়াছেন। তাহার পুর্ব্বের নামও বলিয়াছিলেন ও খ্রীষ্টীয় নামে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাদরি সাহেবকে বলিয়া সার্টিফিকেটের তারিখ একটু বেশী পুর্ব্বের করিয়া লইয়াছিলেন। পাদরি সাহেবও তাহাই করিলেন ও এইরূপ ভাব করিলেন যে তিনি বুঝিয়াও বুঝেন নাই। দুঃখের কথা এই যে কালের কুটীল গতিতে স্বাধীন ইংরাজ পুরোহিত ও প্রবঞ্চক হয়!

"শ্যামুয়েল সাহেব বৌবাজার কিণ্ডারডাইন লেনে একটী দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া সাহেবি ভাবে গৃহ সজ্জিত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নীতিশ উচ্ছৃঙ্খলতার চরমে উপস্থিত হইলেন। দেড়শত টাকায় তাহার চলে না। ফিরিঙ্গি বিবিদের মনস্তুষ্টি ও টাকায় হয় না। নীতিশের আপীষের খাজাঞ্চির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ১০,০০০৲ টাকা সরাইয়া ফেলিলেন। টাকার হিসাবের সময় খাজাঞ্চি বাবু ধরা পড়িলেন। সঙ্গেই নীতিশেরও হাত কড়ি পড়িল।

খাজাঞ্চি বাবু আলীপুরের বড় বড় উকিল দিলেন কিন্তু নীতিশের টাকা নাই। মোকদ্দমার কথা কাগজে বাহির হইল। ডেপুটী বাবু বিচারে নীতিশের ষড়যন্ত্র আছে একটু প্রমাণ পাইয়া ও অন্যান্য সমস্ত জানিতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও একদিন ডাকিয়া বলিলেন আপনিই নীতিশ বাবু স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের কন্যার সহিত আপনারই বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।

নীতিশ—অবনত মস্তকে বলিলেন—আজ্ঞে হাঃ।

ডেপুটী বাবু—বলিলেন যাউক সে স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের ও তাঁহার কন্যার সৌভাগ্য—সুশীলা এখন আমার গৃহিনী। নীতিশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। নীতিশ কুকুরের ন্যায় বলিলেন আমাকে যদি দয়া করিয়া এযাত্রা বাঁচান

ডেঃ—অসম্ভব। তবে আপনার নামে বিশেষ প্রমান নাই। দেখা যাউক।

যথা সময়ে মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইল। বিচারে খাজাঞ্চি বাবুর তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস ও ১০০০৲ টাকা জরিমানা নীতিশের ২ মাস কারাবাসের হুকুম হইল।

নীতিশ জেল হইতে বাহির হইয়া কিণ্ডারডাইন লেনে আসিয়া তাঁহার প্রতি-বেশী এক সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার সমস্ত জিনিষ পত্র আমার এখানে আছে। এখন যদি আবশ্যক হয় লইয়া যাইতে পার।"

নীঃ—কোথায় লইয়া যাইব। আমাকে এখানে থাকিতে দেও। আমি কিছুদিন পরেই কোন একটা কার্য্য পাইলে অন্যত্র যাইব। সাহেব দয়া পরবশ হইয়াই হউক কি নীতিশের অনেক মদ, মাংস উড়াইয়াছেন বলিয়াই হউক নীতিশের কথায় সম্মত হইলেন। নীতিশ এখন কোন কাজ না পাইয়া "দরখাস্ত লেখক (Petition writer) হইলেন। নীতিশ বেশ ইংরিজি বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। নীতিশের ইংরিজি বলাতেই ডেপুটী বাবুর প্রথম মনাকর্ষণ করিয়াছিল।

জেলের পর আজ প্রায় ৩ মাস কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু নীতিশ কোথাও কিছু যোগার করিতে পারেন নাই। নীতিশ আজ দরখাস্ত লিখিয়া মাত্র ।।০ আনা পাইয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে নীতিশ এক আনা দিয়া একখানা রুটী কিনিয়া, রুটীখানি বগলে করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। নীতিশের চেহারা দেখিলে সহজে চেনা যায় না। ময়লা, তালিদেওয়া প্যাণ্টালুন, ছিটের কোট, তাহাও শতছিদ্র পুরাতন কালিমাখা একটী সোলা টুপি, ময়লা ও পুরাতন জুতাপায় নিতান্ত গরীব অবস্থার চেহারা, দেখিলে দয়া হয়। গলা বন্ধনীটী আজ এমন ভাবে ছিড়িয়াছে যে কাল আর পরিবার উপায় নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় একখানি গাড়ীর সহিস চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "এ সামনাওয়ালা হট্ যাও"—

নীতিশ—তাড়াতাড়ি ফুট পথে উঠিলেন। গাড়ীর বাবুটী গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ী থামিল তিনি সহিসকে বলিলেন—"এই ও সাহেবটাকে ডাকত"—

সহিস যাইয়া সেলাম দিয়া বলিল "সাহেব আবকো বাবু বোলাতে বলিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া গাড়ীতে বাবুকে দেখাইল। নীতিশের মেজাজ গরম ছিল—সাহেবির গরমে না—অভাবে; তিনি বলিলেন—"কোন্‌বাদ' নাই মাংতা হ্যায় হামকো নেই"। "হা সাহেব আবকো"—এইবার নীতিশ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার বোধ হইল যে পৃথিবী যেন তাঁহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছে। "নীতিশ কি ভাবিতেছে, ভাই এদিকে এস"—

এবার গাড়ীর বাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জিতেন গাড়ী হইতে অবতরন

করিয়া ফুট পাথে আসিয়া নীতিশকে জড়াইয়া ধরিলেন। রুটীখানি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন। গরীব বেচারা সইস তাহা কুড়াইয়া লইল।

জিঃ নীতিশ এখানে কোথায় থাক এবং এরকম অবস্থা কেন?

নীঃ যাক সে সব কথায় আর দরকার নাই। আমি সম্মুখে এই কিন্‌ভার-ডাইন লেনে থাকি। আমি এখন যাই।

জিঃ আচ্ছা গাড়ীতে ওঠ। আমি সবই বুঝিয়াছি।

নীঃ না, ভাই—আমি যাইব না।

জিতেন শুনিলেন না। বাড়ী গেলে তাঁহার সোনারচাঁদের মত ক্ষীরে মোড়া দুটি ছেলে দৌড়াইয়া আসিল। "বাবা! গাড়ী"—বলিয়া ছোট ছেলেটি বায়না ধরিল—ছোটটীর বয়স এই দুই বৎসর। জিতেন নীতিশকে দেখাইয়া বলিল। "চুপকর তোদের জেঠামহাশয় এসেছেন তোর মাকে বল"—জীতেনের স্ত্রী জানালা দিয়া দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই, শেষে ঐ কথা শুনিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিলেন।

জিতেন নীতিশকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া স্নানের ঘরে যাইয়া নিজহাতে কোট, টুপি খুলিয়া ফেলিয়াদিলেন ও তাঁহার স্ত্রীকে কাপড় গেঞ্জি ও সার্ট আনিতে বলিলেন নীতিশ বাবু হইয়া ভদ্রলোক সাজিলেন।

জলখাবার খাইতে বসিলে জিতেন্দ্রের স্ত্রী আসিয়া নীতিশকে প্রণাম করিতে গেলে নীতিশ বলিল—"না বৌমা আমায় প্রণাম করিবেন না। আমি হিন্দুস্ত্রীর প্রণামের যোগ্য নহি। জিতেনের পুত্র দুটী প্রণাম করিল। নীতিশ ছোট ছেলেটীকে কোলে ও বড়টীকে কাছে টানিয়া লইয়া তাঁহাদের মুখচুম্বন করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে সমস্ত ঘটনা নীতিশ জিতেনকে বলিল। জিতেন এখন ৩০০৲ টাকা বেতন পায় ও একটা কারবার খুলিয়াছে।

নীতিশ জিতেন ও তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে ঐ কারবার চালাইতে লাগিলেন নীতিশ বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। জিতেন কিম্বা তাঁহার স্ত্রী নীতিশের বিনানুমতিতে কোন কার্য্য করেন না। জিতেন জানিতেন নীতিশের বড় গর্ব্ব এবং সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন যেন সে গর্ব্ব তাহার নিকট আঘাৎ না লাগে। নীতিশ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। জিতেন কিংবা তাঁহার স্ত্রী কিছুই বলিতেন না। নীতিশ এই অবস্থায় এইরূপে একবৎসর থাকিবার পরে মদ্যপানের আতিশয্য বশতঃ যকৃতের পীড়ায় সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইলেন। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ

জিতেনের যাহা সাধ্য তাহারও অনেক বেশী করিলেন কিন্তু নীতিশ রাত্রি ৯টায় জিতেনকে কাছে আসিতে বলিলেন, কথা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, জিতেনের স্ত্রী পুত্র দুইটী লইয়া আসিলেন। নীতিশ জিতেনের নিকটে আসিয়া আজ ছয় বৎসর পরে একটু চুম্বন করিলেন এবং হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন। কিন্তু হাত আর উঠিল না। নীতিশ সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা সব ভুলিয়া গেলেন। জিতেন বালকের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অর্ঘ্য

৭ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২৩। | ৫ম সংখ্যা

স্বপ্নতত্ত্ব।

(লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি, এ।)

স্বপ্নের কি মহিমা—চিরদুঃখি স্বপ্নের কল্যানে রাজ্যেশ্বর হইতেছে পুত্রহারা জননী ক্ষণিকের জন্য মৃত পুত্র ফিরিয়া পাইতেছেন, রোগী নষ্ট সাস্থ আবার লাভ করিতেছে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতেছে, যাহার কোন আশা নাই সেও স্বপনে সব সাধ মিটাইতেছে। কল্পনার আদিরূপ স্বপ্ন; আমরা স্বপ্ন দেখিয়া কল্পনা করিতে শিখি। কত কবির কত কল্পনা যে স্বপ্নলব্ধ তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

আবার অনেক পণ্ডিতের মত যে আমাদের 'আত্মা'র অনুভূতি স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উপনিষদেও ইহা দেখা যায় যথা

"বৎস! স্বপ্নে যাহাকে বুঝিতে পার, যে স্বপ্নে নানাবিধ ভোগ অনুভব করে, নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে তাহাই 'আত্মা' তাহাই 'ব্রহ্ম' তাহাই 'অমৃত অভয়।" (ছান্দোগ্য। ৩)

ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও প্রায় এই প্রকার মত। তাঁহারা বলেন আমাদের 'আত্মা' বা Soulএর জ্ঞান বহুপূর্ব্বে হইয়াছে আদিম অসভ্য অবস্থায় মানব স্বপ্নে নিজ দেহ ভিন্ন আত্মার কল্পনা করিয়াছিল। সে হয়ত স্বপ্নে দেখিল সে শিকার করিতে গিয়াছে তাহাকে বাঘে তাড়া করিল, সে প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিল। বাঘ তাহার পশ্চাতে আসিতেছে আর সে দৌড়াইতে পারিল না বাঘ তাহার ঘাড়ে পড়িল, এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে সে তাহার গুহায় শুইয়া আছে। কি হইল! বাঘ কোথায় গেল? তাহার বন্ধুগণ তাহাকে বলিল সে শিকার করিতে যায় নাই বরাবরই এইস্থানে নিদ্রা যাইতেছে কিন্তু তাহার বিশ্বাস সে শিকার করিতে গিয়াছিল। তখন সে কল্পনা করিল, যদিও তাহার দেহ গুহায় পড়িয়াছিল বটে তাহার 'আত্মা' শিকারে গিয়াছিল। এইরূপ 'আত্মার' উদ্ভব। যত অসভ্য অর্দ্ধসভ্য সাঁওতাল, কোল ভিল প্রভৃতি জাতির

'আত্মা'র বিশ্বাস আছে। ক্রমে এই 'আত্মা' জ্ঞান হইতে প্রেত আত্মা বা 'ভুত' জ্ঞান আসিয়াছে।

অনেকের মত আমরা জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ দেখি তাহার 'স্মৃতি' আমাদের মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়, নিদ্রিত অবস্থায় আবার তাহা স্পষ্ট হয় তাহাই 'স্বপ্ন'। তবে আমরা যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখি তাহাই যে স্বপ্নে দেখিব অন্য কিছু দেখিব না, তাহা নহে। অনেকেই বাল্যাবস্থায় ভুত প্রেতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সে সকল স্বপ্ন আসে কোথা হইতে? কে চর্ম্মচক্ষে ভূতপ্রেত দেখিয়াছেন? ইহারা যে এই পৃথিবীর জীব নহে তাহারা কল্পনা লোকের জীব। শৈশবে আমাদের জীবনের অল্পভাগই এই কঠিন ধরায় থাকে অধিকাংশই কল্পনা লোকে বিচরণ করে, সেই জন্যই ঐসব অশরীরী জীব যথায় তথায় দেখা দেয়।

বৈজ্ঞানিক একটি সূত্র আছে 'Individuals repeat the life-history of the race'. অর্থাৎ ব্যক্তি মাত্রেই তাহার জীবনে নিজ জাতির ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে। ইহার অর্থ আমরা যে কোন জীবের জীবন চরিত দেখিয়া তাহার জাতির অভিব্যক্তির ধারা ধরিতে পারি। মানব জাতির শৈশব কিরূপ ছিল তাহা মানব শিশু দেখিয়া বুঝা যায়। শৈশবে আমরা চঞ্চল সরল কল্পনাপ্রিয় থাকি মানব জাতিও আদিতে সেইরূপই ছিল। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিও জাতীয় জীবনের শৈশবে আছে, তাই তাহারা শিশুদের মত সরল আমোদ প্রিয় ও কল্পনাপ্রবন। তাহারাও যথায় তথায় ভুত প্রেত দেখিতে পায়। এখানে স্বপ্নের ক্ষমতা অপ্রতিহত।

কৈশোরেও স্বপ্নের ক্ষমতা কম থাকে না। তবে তখন ভুত প্রেতের পরিবর্ত্তে আকাশ কুসুম সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠে। জাতীয় জীবনেও কিশোরজাতি জাপান, জর্ম্মান কত আকাশ কুসুমের আশায় ধাবিত হইতেছে।

যৌবনে 'তরুণ স্তাবৎ তরুণীরক্ত', তখন জীবন বাস্তব ও প্রেমে বিভক্ত। তখনকার স্বপ্ন ভোগের স্বপ্ন, তখন 'দিবস কৈনু রাতি ও রজনী কৈনু দিন, অর্থাৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করাই স্বভাব। ইউরোপ জাতীয় জীবনে এখন যৌবন বলদর্পিত, স্বপ্নের বা কল্পনার আবেশ প্রায় ঘুচিয়াছে কেবল ভোগ খুঁজিতেছে। যৌবনই ব্যক্তির ও জাতির চরম অবস্থা, তাহার পরই পতন।

প্রৌঢ় বা বৃদ্ধাবস্থাকে আবার দ্বিতীয় শৈশব বলে। বাস্তব জীবন একেবারে লোপ পায়, থাকে সুধু মধুময় 'অতীত'। সেই অতীতের স্মৃতিকেই বৃদ্ধ কত কল্পনায়, কত মাধুরি ঢালিয়া সিক্ত করিয়া রাখে। 'বর্ত্তমান' তাহার নিকট গদ্যময়

'ভবিষ্যৎ' বীভৎস। কেবল-অতীত তাহার নিকট সুন্দর ও মধুর। বৃদ্ধের স্বপ্ন দিবা-স্বপ্ন কারণ রাত্রি তাহার প্রায় বিনিদ্রই কাটে। জাতীয় জীবনে ভারত, চীন ও মিশরের মত বার্দ্ধকে উপনীত। তাহারা অর্ব্বাচীন ইউরোপের লালসা ও কিশোর জাপানের আশা দেখিয়া হাসিতেছে। হে বৃদ্ধ! তোমার ইহকালে বল নাই আশা নাই বলিয়া পরকালের কল্পনায় বসিয়া আছ। ক্ষমতা নাই বলিয়া ভোগকে উপেক্ষা করিতেছ! কিন্তু তোমার বুড়া বয়সের কথা শুনিবে কে? যে কিশোর বা যুবা সে তোমার কথায় কান দিবেনা। সে বলে 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। যাহার তোমার মত কোনও আশা নাই তোমার কথা সে শুনিতে পারে। তুমি আপন মনকে প্রবোধ দাও যে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার পর উহাদের অনুতাপ আসিবে! হে বৃদ্ধ, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ তোমারও যখন যৌবন ছিল বাহুতে বল ছিল, হৃদয়ে আশা ছিল, প্রাণে আনন্দ ছিল, তুমিও ওমনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলে! নানা জাতি, শক হুনাদি, নানা ধর্ম্ম, অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় নানা আচার, নানা দেশাচার তোমার সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছ। আজ আশা নাই, ক্ষমতা নাই তাই এত অনুদার! তোমার অঙ্গের বিভিন্ন অংশ পরস্পরে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভেদ। তাই কেবল দিবা-স্বপ্ন দেখিতেছে।

কোন বিখ্যাত পণ্ডিত জরার প্রতিকার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে যদি যুবার উষ্ণ মস্তিস্ক পাওয়া যায় তিনি প্রতিসোধক ঔষধ তৈয়ারি করিতে পারেন। এখন যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক এরূপ মস্তিস্ক পাওয়া যায়, জানিনা তাঁহার ঔষধ আবিস্কৃত হইয়াছে কিনা। আমাদের জাতীয় মহাস্থবীরকে নবযৌবন দেওয়া যায় না? কোনও কিশোর বা যুবা জাতির আশা কি এই বৃদ্ধের ধমনীতে প্রবেশ করান যায় না? ইহা কি চিকিৎসার অতীত? কবি বলিয়াছেন?

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
  আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
  থাকি আধ জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
  করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
  ওগো মরণ, হে মোর মরণ!'

কোন শঙ্খে ডাকিলে আমাদের জাতির দিবা-স্বপ্ন টুটিবে?

মহাকবি কৃত্তিবাস।

(লেখক—শ্রী. জনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।)

"স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজমনে অভিলাষ॥" অরণ্যকাণ্ড।

আজ আমরা যে মহাত্মার জীবন চরিত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি বাঙ্গালাভাষার একজন অতি প্রাচীন মহাকবি। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণই তাঁহার সে গুণপনার অক্ষয় দেউল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তিনি স্বরচিত ভাষা রামায়ণে আত্মকথা যাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে বঙ্গবাসী মাত্রেই আনন্দে আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন ;—

কৃত্তিবাসের পণ্ডিত্য।

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে,
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥" (অরণ্যকাণ্ড)
"কৃত্তিবাস কবিবর, সর্ব্বশাস্ত্রে সুগোচর"।
"লঙ্কাকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।"

মহাকবি স্বীয় জন্মভূমি সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

"স্থানের প্রধান সে ফুলিয়া নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায় কবি 'ফুলিয়ায়' জন্মগ্রহণ করেন। এই ফুলিয়া আবার দুইটী ছোট ফুলিয়া ও ফুলিয়া। শেষোক্তটীই কবির বাসভূমি। ইহা

কৃত্তিবাসের জন্মভূমি।

নদীয়া (নবদ্বীপ) জিলার অন্তপাতী রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত, রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে অনূন্য ৭ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে গমনাগমনের পক্ষে কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়েই সুবিধা-জনক ও রাণাঘাট শান্তিপুর চেরিবন্দ রাস্তার দক্ষিনে অবস্থিত থাকিয়া রাণাঘাট হইতে পদব্রজে বা কোন যানের সাহায্যে পৌঁছাইবার সুযোগ প্রদান করে। এক সময় এই ফুলিয়ার দক্ষিণ দিক দিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। কবি তদীয় রামায়ণে ভগীরথকর্ত্তৃক গঙ্গানায়ন প্রসঙ্গে আকনা মহেশাদি স্থানের

উল্লেখ করিয়াছেন। এ স্থান হইতে গঙ্গা কোথায় যাত্রা করেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন ;—

*　　*　　*　　*

"আসিয়া মিলিল গঙ্গাতীর্থ যে নদীয়ায়।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥"*

কবির জন্মস্থান 'ফুলিয়া' আমরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি কিন্তু এ স্থানের নাম ফুলিয়া হওয়ার কারণ কি? কবি আত্ম উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

'ফুলিয়া' নামের কারণ

"মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে 'মালঞ্চ' এখানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥"

পূর্ব্বে এস্থানে মালঞ্চ ছিল। নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিত আর ইহার নিম্নদেশে কীর্ত্তিশালিনী ভাগীরথী রজত ধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির বিচিত্র লীলাক্ষেত্র এইস্থানে পূর্ণভাবে প্রকাশিত ছিল। এই বিচিত্র প্রকৃতসৌন্দর্য্যময় পুষ্প নিকেতন হইতেই এ স্থানের নাম 'ফুলিয়া' হইয়াছিল। কবি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন :-

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী॥"

ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ৭৩২ খৃঃ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করেন তন্মধ্যে অন্যতম ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ রাজা কে? ইনি স্বর্ণগ্রামের রাজা। অনুমান ১২৪৮ খৃঃ নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার মানসে ফুলিয়ায় আসিয়া উপনীত হন। এই রাষ্ট্রবিপ্লব ১৩৪৮ খৃঃ যাফরুদ্দিন কর্ত্তৃক

কবির আদিম নিবাস ও বংশ পরিচয়।

---

* "মলদ্বীপ-কুশদ্বীপ-নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত শিরোমণি অশীবিণঃ॥"
(১৫০০ খৃঃ রঘুনাথ শিরোমণি কর্ত্তৃক মৈথিলী প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষাধর মিশ্রকে উত্তর দান।)

সুবর্ণগ্রাম অধিকারকালেই সংঘটিত হয়। কবি আত্মবিবরণে তাহা প্রকাশ করিতেছেন :—

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজ।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে নদীকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
নদীকূলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে যায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা।
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী॥
ফুলিয়া ব্যাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন-ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ায় সন্ততি॥"

কবির পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ ও ফুলিয়া আগমন সম্বন্ধে বক্তব্য ইহাই যথেষ্ট। এই স্থানে আসিয়া ও তৎপূর্ব্বে কবির বংশাবলী যেরূপভাবে চলিতেছিল তাহা এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। এজন্য নিম্নে কবির একটী বংশাবলী প্রদত্ত হইল।
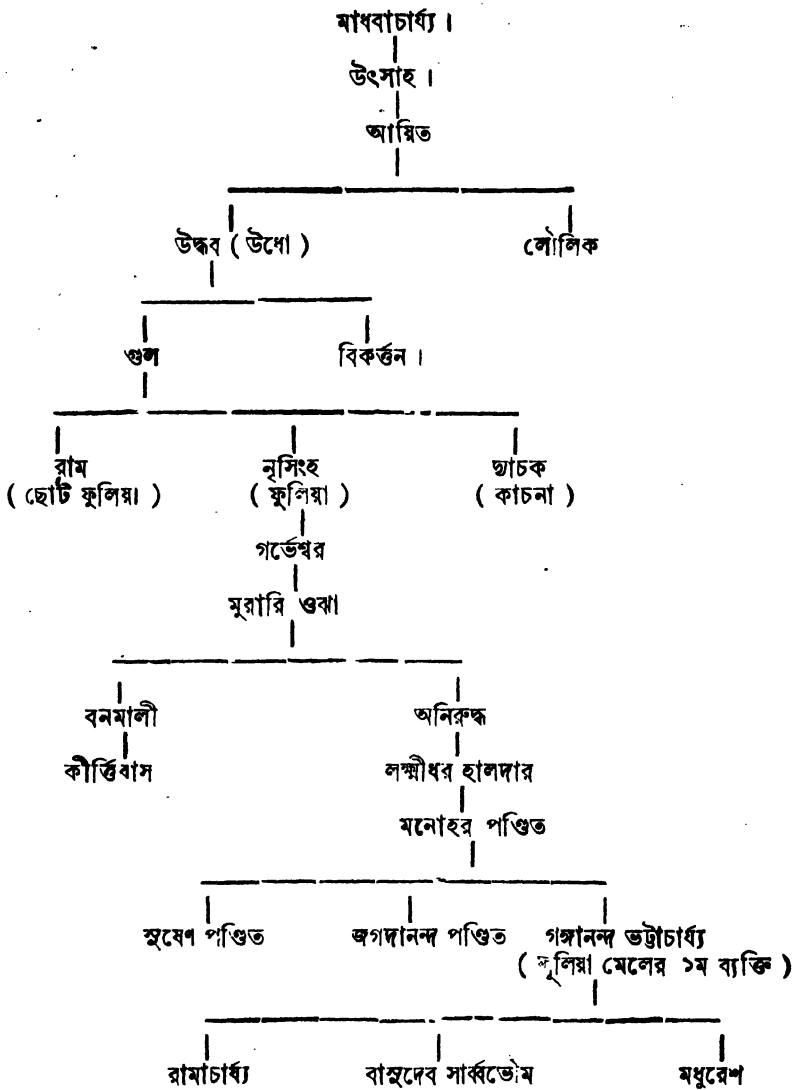
বর্ত্তমানে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের ফুলিয়ামেলের জন্য ফুলিয়া গ্রাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের 'কুলাচার্য্য কারিকা' পাঠে জানা যায়, মেল প্রবর্ত্তক দেবীবর, চৈতন্যদেবের এবং ফুলিয়া মেলের প্রথম ব্যক্তি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক। কুলপঞ্জিকা পাঠে

মেক-বন্দন।

দেখা যায়—গঙ্গানন্দের প্রপিতামহ অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পিতার নাম মুরারিওঝা ও ভ্রাতার নাম বনমালী। বনমালীর পুত্রই আমাদের মহাকবি কৃত্তিবাস, পূর্ব্বে যে বংশাবলী দেওয়া গেল উহাতে ভরদ্বাজগোত্রজ মনু সংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি হইতে ২৪শ পুরুষই উক্ত মাধবাচর্য্য। দেবীবর প্রতিষ্ঠিত ৩৬ মেলের মধ্যে ১ম খড়দহ, ২য় ফুলিয়া, ৩য় বল্লভী, ৪র্থ সর্ব্বানন্দ ইত্যাদি উৎসাহ মুখুটীর বংশজাত ফুলিয়া গ্রামবাসী গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল প্রবর্ত্তিত হয়। কবি এই মেল বন্ধন মধ্যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন :—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী ॥"

১৪৮০ খৃঃ কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খানকে লইয়া মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়।

কবি—আত্মজন্ম সময় এইরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ?—

কবির জন্মকাল।

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥"

জ্যোতির্গননা দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃঃ (৩০শে মাঘ) জন্মগ্রহণ করেন। "আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস এই ছাত্রটী ইহার অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। কবির ভাষাগ্রন্থ রামায়ণ পাঠে কবির নবদ্বীপের প্রতি একান্ত অনুরাগ লক্ষিত হয় কিন্তু নদীয়া গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গের নাম দেখা যায় না, খরদহের প্রভু নিত্যানন্দেরও নাম নাই ইহার কারণ কি? অধিকন্তু কবির নিজবাসভূমেতে অবস্থিত সাধক যবন হরিদাসের নামও না থাকিবার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয়? মনে হয়, ইনি চৈতন্যদেবের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হন তৎকালে নবদ্বীপ বিদগ্ধ জননীই ছিলেন। কুলপঞ্জিকানুসারে দেখা যায় যে মহারাজ লক্ষণসেন প্রতিষ্ঠিত ভারতের অধস্তন ৮মপুরুষ গঙ্গানন্দ ভট্টচার্য্যার ঊর্দ্ধতন ৩য় পুরুষ কৃত্তিবাস। এরূপস্থান লক্ষণসেনের (রাজত্বকাল ১১৬৯—১২০৫ খৃঃ) রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রায় ১১৮০ খৃঃ কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ আয়িত যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহারাজ লক্ষণসেনের ন্যূনাধিক ২৫০ বৎসর পরে এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গঙ্গানন্দের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব ঘটে। অতএব কৃত্তিবাস ১৪১৫ হইতে ১৪৩০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান

কবির ভাষাগ্রন্থ রামায়ণ

ছিলেন, কবি প্রণীত গ্রন্থে তিনি স্বীয় স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিলেই উহা অনুমিত হইবে।

কবি নিজের উক্তিতেই দেখাইয়াছেন যে তিনি বাল্যে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই বিদ্যাভ্যাসই তাঁহার সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সুযোগ প্রদান করে।

কবির পাঠ্যাবস্থা ও পরিচয়।

পাঠ সমাপনের পর তিনি তৎকালীন প্রথানুসারে আত্ম-গুণাবকাশেচ্ছায় গৌরেশ্বরের সভায় উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'রামায়ণ' রচনা করিতে আদেশ করিলেন। আমাদের মহাকবি "তথাস্তু" বলিয়া সগর্ব্বে রাজা সভা হইতে বহির্গত হইলেন। কবি তৎকালীন উৎফুল্লস্রোত স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এইভাবে স্থান দান করিয়াছেন :—

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥"

ইহার পর কবি রামায়ণ রচনা প্রবৃত্ত হইলেন। কবি লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন যে, তিনি জীর্ণশীর্ণ শরীরে রামায়ণ রচনা করেন। ইহাতে বোধ হয় তিনি

রামায়ণ প্রণয়ন কাল।

এইকার্য্য যৌবনাবস্থায় আরম্ভ করিলেও প্রায় বার্দ্ধক্যা-বস্থায় তাহার পরে সমাপ্তি ঘটে। ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে কবি কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন :—

কবির গবেষণা ও গ্রন্থপরিচয়।

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥ ১। (অরণ্যকাণ্ডে)
"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥ ২॥

ইহা হইতে কি বুঝা যায়? দেখা যায় যে, তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে নানা পুরাণ ও রামায়ণ বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে অনেক কবির রামায়ণ রচনা সম্বন্ধে তাঁহার সংস্কৃতে অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন, মূল বাল্মীকি

কৃত্তিবাসের সংস্কৃতজ্ঞান হীনতা সম্বন্ধে মতবাদ খণ্ডন।

রামায়ণে বা অদ্ভুত রামায়ণের তুলনায় ইহার অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য কেবল তাঁহার সংস্কৃতাভিজ্ঞতাই প্রধান কারণ। যেহেতু তিনি কথাযুগে রামায়ণগান শ্রবণ করিয়াই ইহা লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গ্রন্থমধ্যে কবি অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"পুরাণে অনেক মত কে পারে বর্ণিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥"

ইহাতে কি বোধ হয়? ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবি চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই খানেই তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানলাভ হয়। তবে গ্রন্থমধ্যে যে সকল পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা পুরাণ, অদ্ভুত রামায়ণ ও বাল্মীকি রামায়ণের সারসংগ্রহ কেবল তাহাই নহে, তৎকালীন জনগণের রুচিকর করিবার মানসে কবি উহার অনেক স্থান অতিরঞ্জিত করিয়া দেন মাত্র। ইহা একপক্ষে তৎকালীন পাঠকের বুদ্ধি ও অন্যদিকে কবির লিপি চাতুর্য্য কিরূপ মধুর ছিল তাহা জ্ঞাত হইবার অবসর প্রদান করে। অন্যদিকে আর একটী বিষয় দৃষ্ট হয়, তৎকালে এদেশে পাঁচালীগান প্রচলন ছিল। গ্রন্থকার এ উদ্দেশে ও রামায়ণকে এরূপভাবে রচনা করিতে পারেন।

কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় উপনীত হইয়া এ মহাব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনি তাহা স্বীয়পুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কবির অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে সে অনেক দিন; সে শোকে যেন সে গ্রামে শ্রীহীন, জঙ্গলাকীর্ণ, জাহ্নবী দূরে গমন করিয়াছেন—সে সব নষ্ট হইয়াছে! আর

উপসংহার।

কি বলিব? কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার তাহা বলিয়াছি কিন্তু তাহা অতি সামান্য বাক্যে। তাঁহার সরল, মধুর শব্দ মাধুর্য্য ও পরিহাস রসিকতার চিত্রই তাঁহার অন্তরস্থ গুণাবলী প্রস্ফুটিত করিবে! বাঙ্গালা ভাষার শৈশবাবস্থায় যাঁহার লেখনী হইতে এমন মনোমুগ্ধকর মধুর রচনা উদ্ভূত হয় তিনি যে একজন মহাকবি তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার এমন সুদিনে কে কাহাকে আপনার জিনিষ বিলাইয়া দিতে চায়? কেহই না। বাঙ্গালাভাষার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে, সাহিত্যের চর্চ্চা ও তৎপথগমনে সৎপথ প্রদর্শকের অভাব নাই সুতরাং এমন দিনের এমন মহাকবির

স্মৃতি মন্দিরে নিশ্চয়ই ভারতীর লীলাক্ষেত্রে প্রীতি ও ভক্তি পুর্ব্বে অলঙ্কৃত হইয়া বঙ্গ, বাঙ্গালীও ভারতের অন্তরম প্রদেশ চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে !

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime
And departing, leave behind us
Foot-prints no the sands of time.'

Longfellow *

ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ।

(লেখক—শ্রীবিষ্ণুচরণ তর্করত্ন)

অনতিপূর্ব্বকাল হইতে নব্য শিক্ষিত কোন কোন সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়কে অনুচিত তিরস্কার করিয়া স্বাভিমান চরিতার্থ করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' এই নীতিই অধিকাংশ হিন্দু অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে ঐ তিরস্কারের প্রতিফল প্রতিহাতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিআক্রমনের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নব্যশিক্ষিত কোন কোন জাতীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশীয় ব্যক্তিকে অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া লেখনী পরিচালনা করিতে দেখিয়া প্রত্যুত্তর ছলে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। ইহাঁরা হিন্দুসমাজের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ ; ইহাঁদের বিদ্বেষ ভাব হিন্দুসমাজের শুভপ্রদ নহে, তাই এই উদ্যম।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার কোন হিতৈষী ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণের 'অর্ঘ্য' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র পাঠার্থ প্রদান করেন। ঐ পত্রে 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' এই শিরোলিপি দ্বন্দ্ব কি অভেদ বিগ্রহে লিখিত হইয়াছে তাহা প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিয়া বুঝিলাম।

"প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু" এই অথর্ব্ব প্রার্থনাটী কিভাবে বা কি উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দুরধিগম হইলেও বোধ হয় স্বজাতীয়কে আর্য্য ও শূদ্রের প্রভেদ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ বিবেচনা সত্য হইলে উত্তরে বলিব শূদ্রও আর্য্য প্রভিন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সৎ শূদ্র অর্থাৎ মনুক্ত

দ্বিজাচার শূদ্র অনার্য্য নহেন্। "মহা কুল কুলীনার্য্য সভ্যসজ্জন সাধবঃ" এই কয়েকটী আর্য্যপর্য্যায় শব্দ, 'উশনঃ সংহিতোক্ত' সৎশূদ্রও সজ্জন ইহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বিরাট পুরুষ ব্রহ্মার চতুরবয়বের একাবয়ব রূপ মৌলিক-বর্ণ-সৎশূদ্রকে যাঁহারা অনার্য্যরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদিগের কূটবুদ্ধির ফল ভেদনীতির রঙ্গে উজ্জল হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই আবারও বলি 'শূদ্র ও আর্য্য' এক না হইলেও 'সৎ শূদ্র' যে আর্য্য জাতির অন্তর্নিবিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরেই আদি নিবাস নির্ণয় করিতে গিয়া ভিন্ন জাতীয় প্রত্নতত্ত্বীর আরাম কল্পিত ইতিহাস ধরিয়া সত্যপথে যাইবার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। আর্য্যনিবাস বা 'প্রত্নৌক' ভারতবর্ষের বাহিরে নহে উত্তর পশ্চিমান্তর্ব্বর্ত্তি সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের সমীপস্থ পবিত্র প্রদেশ। ইহা "পৃথিবীর ইতিহাস "প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঋক্‌বেদাদিশাস্ত্র ছয় হাজার বৎসরের ঐতিহাসিক কাব্য নহে, উহা সত্য-সনাতন শব্দ ব্রহ্ম। দর্শনাদি সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে সৃষ্টি প্রবাহকে যুক্তিতর্কদ্বারা নিশ্চিতরূপে অনাদি বলিয়া প্রমান করিয়াছেন সুতরাং অনাদি বিশ্বের অনন্ত নিয়ম বিধায়ক শাস্ত্র সমূহ ও যে অনাদিকাল হইতে শ্রুতি পরম্পারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছেন ইহা সুধী প্রবন্ধকার মহাশয় একটু বিশেষ যত্ন করিলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং ঐ প্রত্নতত্ত্বী ইতিহাস সম্বন্ধে "মৌনংহি শোভনং"। আর অপরের আপাতরমনীয় কল্পনায় মনপ্রাণ ভাসাইয়া স্বপ্নরাজ্যের সংগঠন বিয়ৎ গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় ভিত্তিহীন। প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন "আর্য্যগণ কার্য্য সৌকার্য্যার্থে আপনাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন, কালক্রমে প্রথমের নাম হইল ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়ের রাজন্য বা ক্ষত্রিয় ও তৃতীয়ের বিশ বা বৈশ্য, আর আর অনার্য্য প্রাতিবেশী যাহাদের দেশ তাঁহারা কড়িয়া লইয়াছেন, যাহাদিগকে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং সুযোগ পাইলে যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের সেবার পরিচর্য্যায় দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন তাহাদিগের নাম হইল দস্যুদাস পরে ইহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে।" উত্তরে জিজ্ঞাসা করি এই অপরূপ সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আমদানি করিলেন।

ইহা বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রের কোথায়ও নাই, কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি অন্য জাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থেও বোধ হয় নাই, ভারত দপ্তরখানায় নাই, সুশিক্ষেতের চিন্তায় নাই আছে কেবল পাণ্ডিত্যমন্য অনধীত ভাষাবিৎ কতিপয় ভিন্ন ধর্ম্মির অপ্রকৃত

কল্পনায়। যাঁহারা নিজের প্রকৃত ইতিহাস পর্য্যালোচনায় আত্ম ইতিহাসের অবধি পান না তাঁহারাই এইরূপ কল্পিত প্রত্নতত্ত্বের অবতারনাচ্ছলে অপরের প্রবীনতার বংশলোপ করিতে তীক্ষ্ণাস্ত্র লেখনীর পরিচালনা করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্য এই যে কোটী কোটী বিশিষ্ট চিন্তাশীল যে বর্ণ বা জাতিবিভাগকে যুক্তিতর্কদ্বারা সনাতন বলিয়া স্থিরীকৃত করিলেন, জগদ্‌গুরু শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি লোক পুজ্য সাধুগণ যাহাকে একবারও সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন না, বেদস্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, রামায়ণ, তন্ত্র প্রভৃতি ও সমস্ত দর্শন শাস্ত্র যাহাকে অবিসম্বাদি সত্যরূপে গ্রহণ করিলেন, সভ্য জগতের শিরোমুকুট রূপ শ্রীভগবদ্‌গীতা যাহাকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, চার্ব্বাক বা বৌদ্ধ সম্প্রদায় যে জাতি বিভাগ উচ্ছেদ করিতে গিয়া জাত্যন্তর বা বর্ণশঙ্কর জাতির রচনা করিয়া ধ্বংসোম্মুখ হইলেন, সেই সনাতন বর্ণ বিভাগ পূর্ব্বে ছিল না, ব্রাহ্মণ নিজে গড়িয়া লইয়াছিল; এইরূপ বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না! ইহাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও লেখনী চালনার ভঙ্গী দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহাঁরা মনে করেন যে আমরা যাহা বুঝি তাহা সত্য বলিয়া সাধারণে অবনত মস্তকে স্বীকার ও বিশ্বাস করুক; এইরূপ অনুচিত অভিমান পোষণ করিতে অনুমাত্র ও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন না—ধন্য আধুনিক শিক্ষার প্রভাব! অনার্য্যার আর্য্যোৎপন্ন আর্য্য হয়, আর্য্যার অনার্য্যোৎপন্ন অনার্য্য হয়, ইহাতে শূদ্র সংখ্যা অধিক দেখায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন—কিন্তু ইহা কি দেখিয়াছেন ভিখারিণীর কোলে কাঁকানিতে সন্মুখেও উদরে শিশুসন্তান আর শ্রীমন্তের গৃহে পুত্রেষ্টি যাগে ও সন্তান সুপ্রাপ্য ও পোষ্য পুত্রের হাট বসিয়া যায়। সাধু সজ্জনের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ অতি সুভাদৃষ্টেরই সম্ভব হয়। প্রবন্ধকার ঋক্‌বেদের প্রাচীন সূক্ত সমূহে জাতিভেদের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পান নাই স্থলে স্থলে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র বা রাজন্য এবং বিশশব্দ পাইয়াছেন কিন্তু তাহা কোনরূপেই কুল পরম্পরাগত বর্ণ বিশেষ প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। কি অদ্‌ভূত গবেষণা,—ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলেই "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ উরূতদস্যযৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ২ জায়ত "ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জাতি বিভাগের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এই ঋক্‌টীর প্রতিদৃষ্টি করিয়াও বোধ হয় প্রবন্ধ কার এস্থলে উদ্ধৃত করিতে সাবধান হইয়াছেন। ঋক্‌বেদের আদি মধ্য অন্তে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইয়াছেন ও ক্ষত্র বিশ্ দেখিতে পাইয়াছেন, আর ব্রাহ্মণ মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে বৈশ্য উরু হইতে, শূদ্র পাদ হইতে ইহাও অবশ্য দেখিয়াছেন তথাপি ঋক্‌বেদে বর্ণবিভাগের প্রমাণ দেখিতে পান নাই। ইহাঁদের

যেটী নিজের মনের মত না হইবে সেটী কোথায়ও দেখিতে পান না, পাইলেও তাহা প্রক্ষিপ্ত বা অর্থান্তরগ্রস্ত বলিয়া চিন্তার ভার কমাইতে প্রয়াসী হন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাঙ্গালা পড়িয়াই বোধ হয় এই সিদ্ধান্তে মনোযোগী হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষ্য টীকা টীপ্পনী যদি সম্যক বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে ঐরূপ অপ্রবিষ্ট সর্ব্বাধিকার বাদে তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। লিখিয়াছেন শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে সত্যযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল ইহা উক্ত হইয়াছে। তাহার অর্থ অন্য বর্ণ ছিল না তাহা নহে তত্তবর্ণ ই তখন ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন ইহাই অর্থ, অন্যথা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের অন্যত্র বহু স্থলে সত্যযুগেই তত্তবর্ণ সংবাদ বিবৃত হওয়া বিরুদ্ধ হইত। প্রবন্ধকার শূদ্রের উরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে হইল কে বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র ধর্ম্মি হইলে ব্রাহ্মণ কন্যাও শূদ্র ধর্ম্মিণী সুতরাং কূট দৃষ্টির আকর্ষণ অর্থহীন। বলিয়াছেন, 'জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা ম্লেচ্ছ হয় না' ইহার অর্থ জন্ম মাত্র যৌন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হইলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি লক্ষণাক্রান্ত হয় না, পরে গুণকর্ম্মদ্বারা লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণাদিরূপে ভেদ উপলব্ধ হয়, অন্যথা "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়া সংস্কারৎদ্বিজোচ্যতে" ইত্যাদি বচনের বিষয় বিচ্যুতি দোষঘটে। আরও দেখাইয়াছেন যে যযাতি প্রতিলোম বিবাহ করিয়াছিলেন ইহাতে প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয় না। আর একটী কথা নহুষ রাজা ব্রাহ্মণ বিদ্বেষপর হইয়া, ব্রাহ্মণদ্বারা শিবিকা বহনাদি করাইতে তপঃসম্পন্ন অগস্ত শাপে স্পর্শ হইয়াছিলেন। ঐ নহুষের পুত্র এবং কামোপভোগার্থ অন্য পুত্রের যৌবন লইয়া পুত্রান্তরের রাজ্যবিচ্যুতি ঘটাইয়াছিলেন—এইরূপ যযাতির অনুরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোম বিবাহ নিতান্ত অশাস্ত্রীয় হইলেও সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল। প্রবন্ধের অধিক স্থলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যাদি হইত এবং শূদ্রাদিও বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদি হইত এইরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, উত্তরে বলিব ইহা জাতিবিচারের বিরোধী নহে কারণ স্মৃত্যুক্ত "দেবোমুনিঃ দ্বিজোরাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশু ম্লেচ্ছোপি চণ্ডালো বিপ্রাদশবিধাঃ স্মৃতাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দেবদ্বিজাদি ধর্ম্মানুসারে চাণ্ডাল পর্য্যন্ত দশ প্রকারে বিভক্ত হয় এই বচনানুসারে শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ হওয়া বা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি হওয়া আর জাত্যন্তর হওয়া এক নহে। ব্রাহ্মণ চাণ্ডাল ধর্ম্মি হইলেই যৌন ব্রাহ্মণত্ব বিচ্যুত হয় না, তাই কালপ্রভাবে চণ্ডাল ধর্ম্মি রত্নাকার বাল্মিকী হইয়াছিলেন। বিষয়টী একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি ব্রাহ্মন হইতে সবর্ণাস্ত্রী গর্ভ জাত সন্তানই ব্রাহ্মণ, ঐ ব্রাহ্মণ যুগানুরূপ স্বধর্ম্ম পালন না

করিয়া অন্যবর্ণ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দেবব্রাহ্মণ বা দেব ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য শূদ্র ব্রাহ্মণ বা শূদ্র নিষাদ ম্লেচ্ছ চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ বা নিষাদ ম্লেচ্ছ৷ চাণ্ডাল নামে অভিহিত হইতেন। ইহাতে ক্ষত্রিয়াদি ব্রাহ্মণ হইল বা ব্রাহ্মণ জাতি ক্ষত্রিয়াদি জাতি হইলেন ইহা বুঝিবার প্রমান নাই। যে স্থলে ব্রাহ্মণ সন্তান ক্ষত্রিয় হইল উল্লিখিত হইয়াছে সে স্থলে ঐ ক্ষত্রিয় সন্তানকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মি ব্রাহ্মণ সন্তানরূপেই বুঝিতে হইবে। উপনিষদ ভাগেও ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মবিদ্যা গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায় সেস্থলেও ঐ উপনিষদ বক্তা ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। আর একটী কথা তপঃপ্রভাব সম্পন্ন ক্ষত্রিয়াদি হইতে ব্রাহ্মণ সন্তানোৎপত্তি বা কশ্যপাদি প্রজাপতি ব্রাহ্মণ হইতে দেব-দানব সর্প রাক্ষসাদি সন্তানোৎপত্তিতে বর্ণাশ্রমের ব্যতিক্রম সংঘটন হয় না। যে ব্রাহ্মণ হইতে মৃগীগর্ভে মানবঋষির জন্ম হয়, সদ্যঃ সদ্যঃই ধীবর পালিতা ক্ষত্রিয় কন্যায় বেদব্যাসের জন্ম হয় এবং সগর রাজ হইতে একস্ত্রীরগর্ভে যাট হাজার পুত্র জুগপৎ জন্মে তাঁহাদের অলৌকিক জন্ম কর্ম্ম লইয়া বিধিনিষেধের ব্যতিক্রম হয় না ; শাস্ত্রের যে স্থলেই দেখিবেন বর্ণাশ্রমের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেই স্থলেই অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে তন্মধ্যে অলৌলিকতাই তাহার মূল বীজ। "শূদ্রোব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং" এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া টিপ্পনীতে সাত জন্ম ঘুর পাকের কথা তুলিয়া শূদ্র যে সদ্যঃ সদ্যঃই ব্রাহ্মণ হয় না জন্মান্তরে হয় ইহা দেখিয়াও পরে নিরর্থক ঐরূপ অনেক কথা কহিয়াছেন। চণ্ডালের উচ্ছিষ্টে লোমশের লোমনাশ হইয়াছিল এই উপাখ্যান তুলিয়াছেন ইহাতে বর্ণাশ্রম ছিলনা বা তদানীং প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলনা ইহা অর্থ নহে। ঐ চণ্ডালের তপোলব্ধ শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনই আখ্যায়িকার মুখ্যার্থ তাহাও স্বয়ং ব্রহ্মার আদেশ সুতরাং লৌকিকের মধ্যে নহে।

"ব্রাহ্মণ বর্ণে অনার্য্য শোনিত সংমিশ্রণ হইয়াছে" ইহা তুষ্যতু ন্যায়ে স্বীকার করিলেও অনার্য্য শুক্র সংমিশ্রন হয় নাই যে স্থলে হইয়াছে সেইস্থলেই প্রতিলোম বর্ণশঙ্কর জাতির দল পুষ্টি করিয়াছে, প্রকৃত সমাজে স্থান পায় নাই। প্রবন্ধকার বলেন "বহুক্ষত্রিয় রাজা অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী-ছিলেন ইত্যাদি" ইহা আর বিচিত্র কি ? ক্ষত্রিয় রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার, ব্রাহ্মণের নিয়ত পূজ্য বলিয়া কি 'ছকুসিং' ও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবার দাবী করিবে। প্রবাহণ জৈবলি ক্ষত্রিয় গৌতমকে বলিয়াছিলেন—এবিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই। ইহাতে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন অতএব সর্ব্বত্র ক্ষত্রিয়

জাতিরই উপদেশ দিবার অধিকার কি অপূর্ব্ব গবেষণা। সমস্ত উপনিষদ আলোচনা করিলে কদাচিৎ দুই একটী সিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় আরও সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ। আরও একটী দ্রষ্টব্য ঐ প্রবাহন রাজাও ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় —ক্ষত্রিয় জাতি নহেন। প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন "এই সময় হইতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর গণের পোহা বারে, পড়িল, তাঁহারা আর্য্য ধর্ম্ম নূতন করিয়া গড়িয়া ফেলিলেন। সূত্র কার, স্মৃতিকার, ভাষ্যকার ধর্ম্মশাস্ত্র কার রূপে এই সময় হইতে তাঁহারা আপনাদের সর্ব্বগ্রাসী কূটবুদ্ধি জাল মনের সুখে প্রসারণ করিতে লাগিলেন।" আজ-কাল কালী কলম থাকিলে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের বার্ত্তাবহ হইতে পারা যায়; প্রবন্ধকার যে চক্ষুতে ব্রাহ্মণের ছবি দেখিয়াছেন উহা প্রকৃত দর্শন নহে। তিনি ভাবিয়া দেখুন যে ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সম্রাট্ পরিচালিত হইত; যাহার ভ্রুক্ষেপে ব্রাহ্মণাবমান না কারি নন্দবংশ সমূলে বিধ্বংস হইল, সেই চাণক্য ব্রাহ্মণ গৃহোদ্যানে, ধনরত্ন কিছুই সংগ্রহ করেন নাই, যাইবার সময় কুশাসনও কৌপীন ব্যতীত আর কিছুই লইয়া যান নাই। পরন্তু পৃথিবীর আদরনীয় মহার্য্যনীতিগ্রন্থ প্রদান করিয়া বোধ হয় প্রবন্ধকারেরও উপকার সাধন করিয়াছেন। এইরূপ চিরজীবন কুশপত্রভোজী চিরক্লিষ্ট পৃথিবীর জ্ঞান গুরু ব্রাহ্মণের চিত্র যাঁহারা বিদেশীয় গিল্টীস্বরা দৃষ্টিতে দেখিয়া অন্তঃ-করণের মলিনতাকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া "ত্যক্ত্যাপয়োরুধিরমত্তি যথা জলৌকা" তথাভূত হইয়া পড়েন তাঁহাদের নিকট অনুরোধ যে মনু সংহিতায় "ব্রাহ্মণস্যহিদেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায়ন্যতে কৃচ্ছায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্ত-সুখায়চ" এবং "সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব অমৃতস্যেবচাকাঙ্ক্ষেৎ অবমানস্য সর্ব্বদা" এই বচনগুলীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। প্রবন্ধকার একস্থলে লিখিয়াছেন শূদ্রের উপর প্রাধান্যের জন্য, পুরাণ উপপুরাণ ইত্যাদি রচিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র নামদিয়া ভারত সাহিত্য সমাছন্ন করিলেন, এই ধর্ম্ম জঙ্গলের ভিতর দিশাহারা হইয়া প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম যে কো'থায় চাপা পড়িলেন এখন আর কিনারা করা দায়।" "উত্তরে বলি প্রবন্ধকর্ত্তার মতে প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম কৃষকের গীতিমাত্র তাহা যাইয়া যদি জঙ্গলই হইয়া থাকে, তাহাতে দোষ কি? আর শিল্প বিজ্ঞান দর্শনাদি প্রকৃত বিদ্যা হইল, আর উপনিষদাদি আরণ্যক্ ভাষ্যাদি অপ্রকৃত বিদ্যা হইয়া গেল, ইহাতে বা দোষ কি? কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন জাতীই, ঐ প্রকৃত বিদ্যা বা অপ্রকৃত বিদ্যার গ্রন্থ নিচয় বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই, "দুর্ব্বাচর্ব্বণপটবোগাবো নহিজানন্তীক্ষু রসমাধুর্যং।" প্রবন্ধ শূদ্রের উপর

যে অত্যাচার হইতে ইহা দেখাইবার জন্য কত কি বলিয়াছেন তদুত্তরে বলি "ধৃতিঃ ক্ষমাদহোঽস্তেবঃ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহাদিরূপ ধর্ম্ম সর্ব্বজাতি সাধারণ এইরূপ বহু প্রমাণ সত্তেও শূদ্রগণের কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম ছিলনা কেবল দাসত্ব ভাবিয়া হতাশায় কারণ নাই। প্রবন্ধকার একস্থলে বলিয়াছেন গুণ কর্ম্মানুসারের বর্ণ বিভাগের সনাতন নিয়ম শ্রীভগবানের স্বমুখোচ্চারিত ব্যবস্থা স্মৃতি সর্ব্বস্ব স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধির পেষণ যন্ত্রে চূর্ণ হইয়া পাক চক্রে লুপ্ত হইয়া গেল।" এতদুত্তরে সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্বস্ব মহাশয়কে বলিব যে "চাতুর বর্ণংময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" গীতোক্ত এই শ্লোকটীর যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে ঐরূপ স্বার্থপর প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য ঘটিতনা; ঐ শ্লোকের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন ঈশ্বর কাহাকে ব্রাহ্মণ কাহাকেও বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র করিলেন কেন? তবে কি তাঁহার পক্ষপাত আছে? এই শঙ্কাপরিহারার্থ বলিলেন "গুণ কর্ম্ম-বিভাগশঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষপাত নাই, ইহারা পূর্ব্বার্থ কর্ম্মানুলব্ধ গুণ কর্ম্ম বিভাগদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি হইয়াছে। প্রবন্ধের একস্থলে শূদ্রের বেদাধিকার নাই, আবার টিপ্পনীতে আছেও বলিতেছেন। উত্তরে আমরা দেখাইব "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাংত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" বেদে শূদ্রের অধিকার নাই স্ত্রী শূদ্রকে বেদার্থ উপদেশ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বেদ পাঠের নাই। এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে শূদ্রের বেদপাঠ নিষেধ সত্বেও বর্ত্তমান সময়ে বর্ণপরিচয় হইলেই বেদ পড়িতে আরম্ভ করে, সর্ব্বশাস্ত্র প্রশংসিত বেদের সর্ব্বস্ব প্রণব এখন ফেরিওয়ালার মুখেও ফেরি হয়, ঐ প্রণবের সরহস্য অর্থ কয়জন জানেন? আমার বিশ্বাস যাঁহারা বেদ শ্রুতির অধিকার না পাইয়া ব্রাহ্মণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল বলিয়া চীৎকার রব তুলিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ প্রণবাদি পাইয়া কিঞ্চিদর্থও অবগত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বেদের রহস্যার্থ গুরু পরম্পরায় শান্তদান্ত অধিকারিই পাইয়া থাকেন; ভাষ্য বাঙ্গালা পড়িয়া কেবল সংস্কৃতার্থই কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারা যায় মাত্র। আর ব্রাহ্মণ স্বার্থপর হইলে মাতা ভগিনী স্ত্রীকে এবং স্বজাতি ব্রাহ্মণাধমকে বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেন না। ব্যাস সংহিতায় "বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার প্রভৃতিকে অন্ত'জস'ম বলিয়াছেন অন্তজ নহে। কায়স্থ ২য় শ্রেণী ১১ ও ১২ ঘর তন্মধ্যে কোনটীকে লক্ষ্য করিয়া বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকার ইত্যাদি বচন প্রযুক্ত হইয়াছে প্রবন্ধকার মহাশয় তাহা বিবৃত করেন নাই। আমরা বলিব ব্রাহ্মণ যেরূপ অন্তজি কর্ম্মে অন্তজ সময়ে হয় তদ্রূপ কায়স্থাদিও হয়। প্রবন্ধকর্ত্তা মহাশয়

ব্রাহ্মণকে পাচক হইতে মুটেমজুর পর্য্যন্ত দেখিয়া কলির ব্রাহ্মণের কথা তুলিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব বর্ত্তমান সময় যেরূপ অন্য বর্ণে খান্‌সামা, দাঁড়িমাঝি, ফেরিওয়ালা, ঘরামী, মুটেমজুর প্রভৃতি যেরূপ নীচ কর্ম্মাশক্ত ও ধর্ম্মাচারবিবর্জ্জিত হইয়াও, অনুপযুক্ত অভিমানী হইতেছে কুকার্য্যকারী ব্রাহ্মণও তদ্রূপ তাহাদিগের নিকট 'ক্ষমব্রাহ্মণ" ন্যায়' বলিতেছে কিন্তু হিন্দু দৃষ্টিতে ইহারা অনেক বিধি নিষেধ প্রতিপালন করে। যে শিক্ষায় অন্য সকলে গর্ব্বস্ফীত হয় সেই শিক্ষায়ই ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইয়াছে, ঐ শিক্ষায় জাত্যুৎকর্ষসাধিত হয় না, সংযম সদাচার নিরত হইয়া সৎশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে উৎকর্ষ সহজেই হইয়া থাকে। প্রবন্ধকার মহাশয় বলিয়াছেন যে বিদেশী বিধর্ম্মি যদি আমাদের রাজা না হইতেন শূদ্র জাতীর কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, ঐ স্বরে আমরাও বলিতেছি, আজ যদি ইংরেজ আমাদের রাজা না হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না ইহা স্বামী বিবেকানন্দের "এস মানুষ হও! প্রথমে দুষ্ট পুরুৎগুলোকে দূর করে দাও" এই ভাষাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ধন্য! গেড়ুয়া কৌপীন! প্রবন্ধকার আর একটা আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য দেখিয়া বিস্ময় রাখিবার স্থান পান নাই। সে বিষয়টী এই যে 'মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ এই বিরাট হিন্দু জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেছে' আমরা বলি ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা বুদ্ধ বিগ্রহ নহে যে লোক সংখ্যায় বিদূরিত হইবে। একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে জাতীর কুটীরে শ্রীশঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য এক রামমোহন, রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন সে জাতির ১জন এক কোটিরও অধিক। ছায়াবাজীর ন্যায় ঐ প্রভুত্বাদি অপসৃত হইতেছে বলিয়া প্রবন্ধ নিঃযেশ করিয়াছেন। ইহা শুধু প্রবন্ধকার মহাশয় নহে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রভৃতির অভ্যুদয় সময়েও ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব ছায়াবাজীর ন্যায় অপসৃত হইতেছে মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু কেমন সত্য সনাতন ব্যবস্থা ; তাঁহাদের মনের ভাব জলবুদ্‌বুদের মত জলেই মিশিয়া গেল। বিষয় সর্ব্বস্বজীব দুই একটী বিষয়জ্ঞানকে পাণ্ডিত্যের গৌরব বলিয়া মনে করে। তাহা প্রকৃত নহে, তাহাই প্রকৃত পাণ্ডিত্য যে সংযম সদাচার ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতি শিক্ষা দেয় এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় দেখাইয়া দেয়, এই পাণ্ডিত্যলাভেই মানবকৃতার্থ হয়, স্বজাতি পবিত্র হয়, সম্মানের উচ্চাসন তাহার অপ্রাপ্য হয় না।

(ক্রমশঃ)

———

রবীন্দ্রনাথ

(৩)

সৌন্দর্য্যের কবি

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম এ, বি এল,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য— রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন,—"সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে; সেই সৌন্দর্য্য অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে ; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি।" ফুল ও কবিহৃদয় বাস্তবিকই প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য। ফুল ও কবি এক পরিবারভুক্ত। কবি সেই জন্য বলিয়াছেন—

ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।" (স্রোত)

কবির হাসি সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ফুলের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

কবির কল্পনা ফুলের সন্ধানে কোথায় না গিয়াছে!

"কোথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।"

কোথায় "কেতকী জলের ধারে" আছে, "নূতন ফুলে কানন উঠে মেতে," অথবা কোথানে,

"শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে'—পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন, বেড়া দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।" (দিনশেষে)

জগতে সৌন্দর্য্যের মূলে আনন্দ। দ্রুম লতা আনন্দে অধীর হইয়া বৃন্তমুখে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করে। কবিহৃদয়ে যখন আনন্দ চাপিয়া রাখা যায় না তখন কাব্য-প্রসূনে তাহা বিকশিত হইয়া পড়ে।

"কুসুমকুল
কি অন্ধ আনন্দ ভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে"— (বসুন্ধরা)

"কাননের প্রস্ফুট ফুল" কবি-হৃদয়ের কেবল যে আনন্দের তরঙ্গ ছুটায় তাহা নহে।

"মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস,
প্রাণ যেন কেঁদে উঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি
উঠেরে নিশ্বাস!" ('নিশিথ জগৎ)

"ছিন্ন ফুল", "ঝরে'-পড়া বকুল", "শিশির মাখা ফুলের" স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অবস্থাভেদে বেদনার সঞ্চার করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-ফুলবনে মানব হৃদয়ের কত সুন্দর ভাব যে উঠিয়া, ভাসিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় তাহার সংখ্যা হয় না। কবি হৃদয়ের ভাব রাশি যেন শত সহস্র ফুল হইয়া বাঙ্গালা দেশময় ফুটিয়া রহিয়াছে। কবিত্বের এমন সৌন্দর্য্যময় স্বর্গ পৃথিবীর অপর কোন স্থানে নাই। সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালি বলিয়া ফুলের সহিত এতটা আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের ফুলও সেইজন্য তাঁহার অন্তরে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়াছে।

ফুলের বর্ণে, গন্ধে অনন্ত বৈচিত্র্য। "প্রভাতের ফুল," "সাঁজের ফুল," "ঊর্দ্ধমুখীন ফুল'" পূজার ফুল, "প্রসাদী কুসুম"—"বনের দুলাল" নানা শ্রেণীভুক্ত। কখন অরুণোদয়ে উষালোকের কবি গাহিতেছেন,—

"অরুণ আজি উঠেছে
অশোক আজি ফুটেছে"—

আবার কখন "চাঁপার শাখে চাঁদের আলো" দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন। পদ্ম, গোলাপ, বেল, মল্লিকা, যূথীর সুখ্যাতি করেন নাই এমন বাঙ্গালি কবি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু নিম্ব ফুলের সৌরভের কথা কেহ যে কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

"তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ

আমলা গাছের কচি পাতায় ;
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধ মাতায়।" (বৈশাখ)

ফুলেদের রাজা রাণী, ভাই ভগ্নী আছে।

"সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই ;
রাঙা বসন পারুল দিদি,
তুলনা তার নাই।"

এই সম্পর্ক নূতন নহে। সৌন্দর্য্যের বংশ পরিচয়ে ইহার কথা লেখা আছে। যাহারা ফুল-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিতে হয়। ফুলেরা কিন্তু সহজে নিজের পরিচয় দিতে চাহেনা।

"চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এমনি ভাগে
যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে !"

রবীন্দ্রনাথের পুষ্পোদ্যানে বিদেশী ফুল অনেক খুঁজিলে তবে দু'একটা মাত্র পাওয়া যায়।

"শুক্ল সন্ধ্যা চৈত্র মাসে
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে—"

"ভরা ভাদরে" "কামিনী ফুলের মেলা," "বরষার দিনে" "কুটীর প্রান্তে" প্রস্ফুটিত কদম্ব, রজনীগন্ধা প্রভৃতির কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। "অম্লান সুন্দর শ্বেত করবীর মালা," "যুথীর মালা," "পূজার জবামালা," "মালতী মালা," আরও কত প্রকার ফুলের মালা যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন বলা যায় না। "শিরীষ," "সূর্য্যমুখী" "কৃষ্ণকলি," "কুন্দ," "শিমুল," সেফালি" প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের ফুল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কলাপের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। "বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা" "বেল কুঁড়ি দুটি, করে ফুটি ফুটি," "বাব্‌লা ফুলের গন্ধ উঠে পল্লি পথের বাঁকে" ইত্যাদি বর্ণনা পাঠ করিলে কবির যে বাঙ্গালাদেশের ফুলরাণীর মালঞ্চের সবিশেষ তত্ত্ব রাখেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ফুলেদের যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহাও কবি মনযোগের সহিত শুনিয়াছেন

"তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফ‍ুল।
শুনিয়া নিরবে হাসি কহিল শিমুল—
যতক্ষণ নিন্দা করে আমি চুপে চুপে
ফ‍ুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে! (বিফল নিন্দা)
"সেফালি কহিল আমি ঝরিলাম তারা!
তারা কহে, আমারো ত হল কাজ সারা;—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের সেফালি।" (এক পরিণাম)

রবীন্দ্রনাথে ফ‍ুলেদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। যে অতিশয় দীনহীন তাহাকেও রবি ও কবি উভয়েই সাদর সম্ভাষন করেন।

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্র হীন
ফ‍ুটিয়াছে ছোট ফ‍ুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ ভাই?"
(উদার চরিতানাম্)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে ফ‍ুল ও ফলের বর্ণনায় যে অসংখ্য সৌন্দর্য্য কনিকা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন বঙ্গজননীর দ্রুম-পরিচ্ছদে সেগুলি শলমা চুমকির কারুকার্য্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে।

বঙ্গের নদী—বঙ্গের নদীকূল রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সুখের, শান্তির, আনন্দের সঙ্গীত প্রবাহিত করিয়াছে। আমরা কবিহৃদয়ের প্রতিধ্বনি তাঁহার কাব্যে পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাই।

"ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; হোথা ভাঙ্গা উচ্চতীর
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্র শীর্ণ পথ খানি দূরগ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত; গ্রামবধূগণ

অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জল কলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'
কর্ণে মোর ; বসি এক বাঁধা নৌকাপরি'
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি,
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারংবার
কলহাস্যে ; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ জ্বালাতন।"

(সুখ)

সৌন্দর্য্যকে কেমন সম্পূর্ণভাবে কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ! ছবিখানি রবীন্দ্রনাথের চিত্রশালার একখানি উৎকৃষ্ট রচনা। তারল্যের এমন ভাবময় চিত্র, কলহাস্যের এমন সরলতাপূর্ণ সুন্দর ছবি বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে দুর্লভ। পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রাণের কেমন একটা টান আছে।

"হে পদ্মা আমার !
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভ লগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য্য অস্তগামী
তোমারে আমার প্রাণ সঁপেছিনু আমি।"

(পদ্মা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের এরূপ অসংখ্য খণ্ড চিত্র আঁকিয়াছেন।

"কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর"— (বসুন্ধরা)

স্বল্পতোয়া ইচ্ছামতী নদীকে কবি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"অয়ি তন্বী ইচ্ছামতী ! তব তীরে তীরে
শান্ত চিরকাল থাক্ কুটীরে কুটীরে"— (ইচ্ছামতী নদী)

গঙ্গাতীরের স্নিগ্ধ সমীরণ কবির অন্তরে যে কি অপূর্ব্ব সৌরভ বহিয়া আনে তাহা বাঙ্গালি পাঠককে বুঝাইয়া বলিতে হয় না।

কবির মাতৃপূজা—রবীন্দ্রনাথের দেশচর্য্যার কথা ভাবিয়া দেখিলে তিনি যে বাঙ্গালা দেশকে কত ভালবাসেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যদিও তিনি এক দিন এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" দাঁড়াইয়া "উদার ছন্দে পরমানন্দে" তাঁহার জীবন দেবতার বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু সেথা,

"মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা

* * * * *

"কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয় হীন
পরগৃহ দ্বার হতে পথের মাঝারে,"—

রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে বাস্তবিক বাঙ্গালাদেশের ছায়া-আলোক ধীরে ধীরে সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদেশ ছাড়া আর কোথায়,

"কোমলা উর্ব্বরা ভূমি নব নবোৎসবে
নবীন বরণ বস্ত্রে যৌবন-গৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায়"—

সাজিয়া থাকে? আর কোথায় নদীর কলধ্বনি মাতৃকলকণ্ঠসন সঙ্গীত বর্ষণ করে?

"আমি ভালবাসি দেব এই বাঙ্গালার
দিগন্ত প্রসরক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য,—মুক্ত নীলাম্বরে
অছায়া আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জ্জন তটে বাজায় কিঙ্কিনী
তরল কল্লোল রোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লী গেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে;"—

(অশেষ)

রবীন্দ্রনাথের মত স্বদেশ-প্রেমিক বাঙ্গালি কবি কয় জন আছেন? বঙ্গমাতার শ্যামল অঙ্গের সৌন্দর্য্য কবির বিরাট কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

"আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে!
(শরৎ)

রবীন্দ্রনাথের বঙ্গের শরৎ বর্ণনা অতুলনীয়। আমাদের বোধ হয় বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা কেহ কখন রচনা করেন নাই। কবিতার সৌন্দর্য্য স্বদেশ প্রেমিক বাঙ্গালি ব্যতীত অপর কেহ উপভোগ করিতে পারে না।

বিশ্ব-সংসারে অলস, নিশ্চেষ্ট, বিশ্রামপ্রিয় বাঙ্গালীর কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলেও বঙ্গমাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি হাস্য মুখে অজস্র কাজ করিতেছেন—মাঠের মাঝে, নদীতীরে, আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে, দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবট তলে, গঙ্গার পাষাণ ঘাটে, দ্বাদশ দেউলে,

"তুমি শুধু, মা গো!
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো।
নিত্য কর্ম্মে বড় শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি'
রৌদ্র নিবারিছ,—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘোর ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে!" (বঙ্গলক্ষ্মী)

"জননী বঙ্গভূমির"-র এরূপ কয়েকখানি বিরাট চিত্র রবীন্দ্রনাথের চিত্রশালায় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ভাবের বিশালতায় এই চিত্রগুলি অসামান্য সৌন্দর্য্যের আধার। যথার্থ স্বদেশ প্রেমিক ব্যতীত অপর কেহ কবির চিত্রে মাতৃস্নেহের অসীমত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ মাতৃ-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যরাশি অসংখ্য খণ্ডচিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিশ্লেষণের যুগে তুলিকার সাহায্যে সৌন্দর্য্যের এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা আর কেহ করেন নাই। দেশমাতার অনন্তপ্রেমের চিত্রানুবাদ বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ

কবি-হৃদয়ের আলোকে মাতৃভূমির অন্তরে ও বাহিরে যে সৌন্দর্য্যে আছে তাহা পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত মাতৃ-স্তোত্রের মল্লিনাথ। সুজলা সুফলা মলয় শীতলা শস্য শ্যামলা বঙ্গমাতা প্রতিনিয়ত সৌন্দর্য্য রচনা করিতেছেন। সৌন্দর্য্যের মহাকাব্য রচয়িত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-হৃদয়ে যে স্বর্গীয় আলোক বর্ষণ করিয়াছিলেন সেই আলোক সৌন্দর্য্যের দেবী প্রতিমা প্রকাশ পাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃ-বন্দনায় সেইজন্য সৌন্দর্য্যের মৌলিক ভাব বর্ত্তমান। রবীন্দ্রনাথ মাতৃদেহের সৌন্দর্য্য শ্রী-ভাব-বৈচিত্র্যে বিকশিত করিয়া মাতৃ-পূজা সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

"নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে 'আনচান' চখে আসে জল ভরে'।"

(দুই বিঘা জমি)

রবীন্দ্রনাথের চক্ষে মাতৃভূমির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, —"যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই কেবল সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়। এমন মায়ের মত দেশ আছে? এত কোল ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমলহৃদয়া তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়? একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহাঁর কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেত ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না? সে ব্যক্তি যে প্রেমিক ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সে দেখেইনি— বাঙ্গালা দেশে সে কখনো যায়নি ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এতদেশে গিয়াছি, এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাঙ্গালার গঙ্গা যেমন এমন নদী কোথাও দেখি নাই।"—(স্বদেশ)

মানসিক সাম্য—সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূলগত মানসিক সাম্য বিদ্যমান নাই। সেই জন্য সকলে তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মতে কবির যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কবি সেই আদর্শে সৌন্দর্য্যের অসংখ্য ছবি তাঁহার নিজের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা নূতন নহে—বহু পুরাতন, "পুরাতন বিষয় বর্ণন করেন বলিয়াই কবিরা কবি।" সৌন্দর্য্য কাব্যের বহু পুরাতন বর্ণনীয় বিষয়। ফুল চিরকাল ফুটিয়াছে বা ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল রহিয়াছে ও ও রহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিয়াছে ও ডাকিবে, ঊষা ও সন্ধ্যা চিরকাল আসিয়াছে ও গিয়াছে, আবার আসিবে ও যাইবে, আলোক আঁধার বর্ণের বৈচিত্র্য পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে পরেও তেমনি থাকিবে! আমাদের হৃদয়ে প্রেম নাই, আমরা অন্ধ তাই ফল ফুল পত্র পুষ্প দ্রুমলতায় পরিশোভিতা, মলয়জশীলতা, জ্যোৎস্না-স্নাতা, সুজলা শ্যামলা বঙ্গমাতার অন্তর ও বাহিরে যে অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা উপভোগ করাত দূরের কথা, দেখিতেই পাই না, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব ও করি না। আমাদের হৃদয় অসাড় হইয়া গিয়াছে। আমরা নিজের দেশে যথার্থই প্রবাসী! প্রকৃতির নিরন্তর আহ্বানেও যখন আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেগ হইতেছে না তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সেই আহ্বানের প্রতিধ্বনি কিরূপে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবে? আমাদের বোধ হয় এখন বাঙ্গালি সমাজের যে অবস্থা শিক্ষিত সহৃদয় স্বদেশ প্রেমিক পাঠক ব্যতীত অপর কাহারও হৃদয় সৌন্দর্য্যের আহ্বানে পুলকিত হইতে পারে না। প্রেম-সাধনার জিনিষ—স্বদেশপ্রেম শ্রেষ্ঠতম সচেতন ধর্ম্ম। বাঙ্গালি পাঠক যতদিন না হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের প্রভাব অনুভব করিতে পারিবে ততদিন তাহাদের হৃদয় মাতৃভূমির সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না, ততদিন তাহারা স্বদেশপ্রেমিক সৌন্দর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে না।

"সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য"—কবির আদর্শ দেখিয়া সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াই পরিতুষ্ট হন নাই। সৌন্দর্য্য কিরূপে মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, হৃদয়ের অসাড়তা দূর করে, মানবকে জড়ের নিষ্ঠুরশাসন হইতে উদ্ধার করে, ইত্যাদি নানা নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি নিজে অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে সরল গদ্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতিশিক্ষিত সমালোচনার তীব্র কটাক্ষের ভীতি কবিকে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিজের অভিমত গোপন

রাখিতে শিক্ষা দেয় নাই। সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া মনে আসার সঞ্চার হয়।

"আর সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্যের কি অসমান্য ধৈর্য্য! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সন্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা দেখিত মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আর এক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আর এক কর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অস্ত্র। * * * * সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা মাত্রের পূজা করিবে না তখনই এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্মবিসর্জ্জন, এই মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য হৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে।"

(ক্রমশঃ)

রেণুর বর।

(লেখক—জনৈক মহিলা।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৫)

মানদাময়ী সাবিত্রীর ও রমেশের পত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি নিজের নয়নকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বার বার পড়িয়া দেখিলেন সত্যই ত রমেশের হাতের লেখা। রাগে দুঃখে অপমানে তাঁর মৃত্যু ইচ্ছা হইতে লাগিল। সকল কথা যত ভাবিতে লাগিলেন ততই তাঁর সাবিত্রীর উপর রাগ হইতে লাগিল। তিনি সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়া এক পত্র লিখিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন ও পুরাতন ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন "গাড়ী করিয়া এই

চিঠি লইয়া পদ্মপুকুরে যাও বৌমার মাকে গিয়া বলিবে বৌমাকে এখনি আসিতে হইবে। বৌমাকে লইয়া তুমি শীঘ্র চলিয়া আসিবে।" ঝি চলিয়া গেলে তিনি রমেশকে ডাকাইলেন।

রমেশ আসিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিয়া ভীতভাবে বলিল "আমায় ডাকিয়াছ।" জননী বলিলেন, "হ্যা।" কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিয়া জননী বলিলেন "তুমি ভবানীকে পত্র দিয়াছ ?" রমেশ জননীর এই কথা শুনিয়া যেন বিচলিত হইয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন "কে বলিল।" জননী রমেশের পত্রখানা ছুড়িয়া তাহার দিকে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ পত্রখানা কুড়াইয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। আবার উভয়েই অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া জননী বলিলেন "তুমি বিবাহ করিয়াছ একথা তোমার মনে আছে ?" রমেশ নীরব রহিলেন। জননী বলিলেন "বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিতে পার যাও, আমিও অমন পুত্রের প্রত্যাশা করি না। কিন্তু, নারায়ণ-সাক্ষী করে একটা বালিকাকে গ্রহণ করিয়াছ যখন, তখন তাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। যেখানেই যাও ফিরিতে হইবে যেখানেই থাক তাহাই থাকিবে, তাই বলিতেছি এখনও সাবধান হও। আর কলঙ্ক বাড়িও না। আর একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করিও না। ভদ্রলোকের মেয়েকে কুলভ্রষ্টা করিও না। ভগবানের কাছে অপরাধী হইও না।" রমেশ এবার বলিলেন "আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি, তুমি অত কথা বলিতেছ কেন ?" জননী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "মনে করিতেছ আমার সুখ এবং স্বার্থের জন্য এত কথা বলিতেছি। তাহা ভাবিও না। এক পুত্র গিয়াছে, নয় তুমিও যাইবে। তাহাতে আমার ক্ষোভ করিবার কারণ নাই। এমন বংশের কুলাঙ্গারের মুখ না দেখাই ভাল ; তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, কিজন্য এ জঘন্য পথে যাইতেছ ? এমন রূপে গুণে লক্ষ্মী প্রতিমা বৌ আনিয়া দিয়াছি তাহা একবার চোক দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়াছ কি ? তাহাকে ত্যাগ করিয়া কুৎসিত এঁদোপাতার লোভ হইল, তোর এ কলঙ্ক শুনিবার চেয়ে যদি তোর মৃত্যু সংবাদ শুনিতাম তাহা হইলেও বোধ হয় এত কষ্ট হইত না।"

রমেশ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "যদি আমার মুখ দেখাতে তোমার এতই কষ্টকর হয়, তবে আর তোমার এ মুখ দেখিতে হইবে না। ভাবিও আমি মরিয়া গিয়াছি।" পুত্রের কথা শুনিয়া জননী আরো ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "যদি চক্ষু ফুটিয়া থাকে যদি আত্মগ্লানি হইয়া থাকে, যদি মন ফিরাইতে পার, তবে মা বলিয়া কাছে আসিও, নচেৎ দূর হইয়া যাও। আমিও তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।

জানিও যতীশের মতন তুমিও আমার ত্যাজ্য পুত্র।" রমেশ জননীর সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "বেশ তাই হউক" বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। জননী পুত্রের ব্যবহারে রাগে, দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

(৩৬)

এই ঘটনার পর দুইদিন কাটিয়া গিয়াছে, রেণু আবার শশুর বাটী আসিয়াছে। রেণু এবার আসিয়া পর্য্যন্ত রমেশের শয্যায় শয়ন করিতেছে। ইহাতে রমেশও কোন আপত্তি করেন না, কিন্তু তাহার সহিত কোন কথাও কহেন না তাহাকে সযত্নে শয্যায় শোয়াইয়া, নিজে আরাম চেয়ারে শয়ন করেন। এদিকে তিনি ভবানীকে বাটির বাহির করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া, নূতন ঝিকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া, ভবানীর নিকট পত্র পাঠাইলেন, নূতন ঝি রেণুর পুতুল আনিবার অছিলা করিয়া, তাহাদের বাটীতে গিয়া ভবানীকে পত্র দিয়া আসিল এবং সেই রাত্রেই তাহার মাতার অসুখ হইয়াছে বলিয়া নিরুদ্দেশ হইল। রেণুর অনুপস্থিতে ঝি আসায় সাবিত্রীর মনে সন্দেহ হইল, তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যথা সময়ে ভবানী পত্র পড়িয়া ছিড়িয়া ফেলিল। পত্রে লেখা ছিল, যথা, "ভ্রমর, সব প্রস্তুত, আজ রাত্রি দশটার সময় তোমাদের বাটীর কাছে থাকিব, তুমি বাটী হইতে পাগড়ী মাথায় লোক দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিবে। খুব সাবধান। ইতি তোমার রমেশ।"

পত্র পড়িয়া ভবানীর বুক দুর দুর করিতে লাগিল, সে যথাসম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া, সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিতে লাগিল। সাবিত্রী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভবানীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে রমেশ রাত্রে আহারাদি করিয়া নিজ গৃহে গিয়া দেখিলেন, রেণু তাঁহার শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে, তাঁহার নিদ্রিত নিশ্বাসে নাসিকার মুক্তটী অল্প অল্প কাঁপিতেছে, রমেশ চেয়ারে বসিয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন—ইহাকে ছাড়িয়া যাইতেছি এ কথা ভাবিতে, যেন সে গৃহের প্রতি বস্তুটী তাহাকে তিরস্কার করিতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শৈশব—যৌবন কালের সকল স্মৃতি তখন তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। জীবনের সকল ঘটনা, স্মৃতিই যে এ বাটীতে মাখান রহিয়াছে আজ সেই বাটী ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, এ কথা তাঁহার যতই মনে হইতে লাগিল যেন সমস্ত স্মৃতিগুলিই জীবন্ত হইয়া তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল। রমেশ একটা দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলিয়া পোষাক পরিতে লাগিলেন। সজ্জিত হইয়া

দর্পনে কেশবিন্যাস করিয়া, আবার কিয়ৎক্ষণ রেণুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার অন্তর হইতে কে যেন তিরস্কার করিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তিনি জোর করিয়া সংযত হইয়া, গৃহের বাহিরে আসিয়া পুরান ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এ ঘরে থাক, আমি থিয়েটার দেখিতে যাইতেছি।" রমেশ বাটী হইতে বাহির হইয়া, আবার বাটীর দিকে চাহিয়া একটী নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে সকলের আহারাদি হইলে, সকলে শয়ন করিলে ভবানী চঞ্চল হৃদয়ে কান স্থির করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল, ভবানী অধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভবানী সভয়ে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সকলেই নিদ্রিত, সে আবার কিয়ৎক্ষণ শুইয়া রহিল পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দেখিল রাস্তায় একজন পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ভবানীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে সন্তর্পণে গৃহের বাহিরে আসিল, আবার সভয়ে গৃহের মধ্যে চাহিয়া দেখিল সকলেই নিদ্রিত, তখন সে ধীরে ধীরে খিড়্‌কির অপরিষ্কার দরজা খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া সেই চিহ্নিত ব্যক্তি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে ডাকিল, ভবানী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিল অদূরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখিল, এ ব্যক্তি রমেশ। দুজনে নীরবে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

(৩৭)

গাড়ী বরাবর হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল, রমেশ নামিয়া ভবানীর হাত ধরিয়া নামাইলেন। কুলীবৃন্দ আসিয়া মাল লইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলে রমেশের একটা চামড়ার ব্যাগ মাত্র মাল, তাহাই লইয়া একজন রমেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রমেশ ভবানীকে লইয়া ফার্ষ্টক্লাস গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। কুলী ব্যাগ রাখিয়া পয়সা লইয়া বিদায় হইল।

ভবানী ষ্টেশনের আলো এবং জনতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে, এখন গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ীর চাকচিক্যে আশ্চর্য্য হইয়া তাহাই দেখিতেছে, তাহার মুখে কথা বাহির হইতেছে না। রমেশ বলিলেন, "ভ্রমর, কথা কহিতেছ না যে! বাড়ী ছেড়ে আসাতে কষ্ট হইতেছে কি?" ভবানী মৃদুস্বরে বলিলেন "না"। রমেশ ব্যাগ খুলিয়া, রুমালে বাঁধা একটী ছোট বাক্স বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ী

এবং একটী নেকলেশ, ছুটী ইয়ারিং এবং আংটী বাহির করিয়া ভবানীকে পারাইয়া দিলেন আবার একখানি কালপেড়ে সিমলার সাড়ী এবং একটি সেমিজ ও বডী বাহির করিয়া বলিলেন, "এগুলি পর।" ভবানী যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় নীরবে সেগুলি পরিল তখন রমেশ চিরুণী বাহির করিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়া চুল পরিস্কার কর," ভবানী তাহাই করিল। রমেশ ভবানীর পরিত্যক্ত কাপড়খানি ব্যাগে পুরিয়া রাখিয়া, ভবানীর পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া তাহার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এখন কেমন দেখাইতেছে" ভবানি লজ্জিত হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "কি কর, "রমেশ বলিলেন, "সত্যি তুমি নিজে দেখ, কেমন দেখাইতেছে।" রমেশ ভবানীকে লইয়া গাড়ীর দর্শনের নিকট দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখ দেখি।" ভবানী আঁড় কটাক্ষে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "যাও, তোমার যত কাণ্ড।" একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আবার দুজনেই যেন গম্ভীর হইয়া পড়িলেন।

তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন আজ এক জগত ছাড়িয়া অন্য কোন জগতে যাইতেছি সেখানে সুখ কি দুঃখ আছে বুঝিতে পারিতেছি না, প্রাণ যেন অজানা কোন ব্যাথায় কাঁদিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ এইভাবে কাটিল।

রমেশ বলিলেন "ভ্রমর কথা কইছ না কেন?" ভবানী বলিল "কি কথা কহিব তুমি যে চুপ করে আছ।" রমেশ বলিলেন, "এস আমার কাছে এস," ভবানী সরিয়া আসিলে রমেশ ভবানীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "সত্য বল তুমি কি সুখী হইয়াছ?" ভবানী বলিল, "তোমা ছাড়া আর জগতে আমার কি আছে, তোমার কাছে এসে তোমাকে দেখে যে কি সুখী হইয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, এখন কোথায় যাচ্ছ জানিতে ইচ্ছা হচ্ছে।" রমেশ বলিল আমার দাদার বাসায়,—ভবানী শিহরিয়া বলিল, "তাঁহারা খ্রীষ্টান নয়," রমেশ বলিলেন "হ্যাঁ ভ্রমর।" কিন্তু তাহাতে কি, আমরা ত সমাজ সংসার ত্যাগ করে চলিয়াছি আমাদের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? আমরা ত সুখের প্রয়াসী সুখের আশায় সুখের সন্ধানে চলিয়াছি আমাদের ধর্ম্ম দেখিবার দরকার নাই। ভবানী নিরুত্তর রহিল। সে যেন ম্রিয়মান হইয়া পড়িল, সে কত নীচে নামিয়াছে তাহা বুঝিয়া ব্যথিত হইয়া পড়িল, রমেশ তাহা বুঝিয়া সাদরে বুকে ধরিয়া বলিল "ভয় কি ভ্রমর জগতে আমি তোমার, তুমি আমার, যেখানেই থাকি না কেন দুজনে থাকিলে ভয় কি, আমাদের বন্ধন আমরণ। ভবানী রমেশের বক্ষে মাথা রাখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য

৭ম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২৩। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

(৪)

প্রেমের কবি

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্ এ, বি এল,)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাব্য সাহিত্যে বন্যা—রবীন্দ্রনাথ কাব্য সাহিত্যে বন্যা উপস্থিত করিয়াছেন। এত অধিক কবিতা ও গান অন্য কোন আধুনিক বাঙ্গালি কবি রচনা করেন নাই। এক একটি নিবন্ধে এত কবিতা আছে যে সেগুলি একজন মধ্যবিধ শ্রেণীর কবি সারাজীবনে লিখিয়া উঠিতে পারে না। নিবন্ধের সংখ্যাই বা কত! সকল গুলির নাম মুখস্ত না করিলে মনে থাকে না। সোনার তরী, মানসী, কল্পনা, ক্ষনিকা, কথা, কড়ি ও কোমল, চিত্রা, কণিকা, চৈতালি, নৈবেদ্য, পদাবলী, শিশু, কাহিনী, খেয়া—গ্রন্থের পর গ্রন্থ চলিয়াছে। পুষ্পমালার বিচিত্র রচনা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কাব্য মন্দির কেবল ফুলের মালায় সুশোভিত করিয়া তৃপ্ত হন নাই। কাব্যামোদী ভাবুকের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সেখানে সঙ্গীতের যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। গান-গুলিকেও তিনি মালার মত করিয়া গাঁথিয়াছেন। গীতি-মাল্য, গীতাঞ্জলি, গীতালি, প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীত, মঙ্গল-গীত, ব্রহ্ম-সঙ্গীত—তা ছাড়া, গানের বহি, ছবি ও গান, আরও কত অপূর্ব্ব গীতি-গুচ্ছ কবির গানের সাজিতে আছে। যে গান মানুষের কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায়, যাহা গায়কগণ অভ্যাস করে সে গান ষড়্জাদি সপ্তস্বরের বিষয়ীভূত। এই প্রচার শব্দময় গান শ্রুতিসুখকর মাত্র। যে গান কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্পর্শ করে সেই ভাবময় গান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ঢালিয়া রাখিয়াছে।

বিষয় বৈভবেও রবীন্দ্রনাথের মত ঐশ্বর্য্যশালী কবি খুব কম দেখা যায়। মানব হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, বিলাপ, আশা, নৈরাশ্য; কল্পনা রাজ্যের আকাঙ্খা, মোহ, ছলনা, আশঙ্কা, সামাজিক উন্নতি অবনতি, রহস্য, কৌতুক, আদর অভ্যর্থনা, প্রশংসা নিন্দা, শিক্ষা, নিয়ম, রুচি, রীতি নীতি মিলন, বিদায়, বন্ধুত্ব, কুসংস্কার, খেলা-ধূলা, আমোদ—প্রমোদ; কবি ও কাব্য পৌরাণিক চিত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা; স্বদেশের তথ্য; যুবক-যুবতী; শিশুর কথা; জীবন মরণের সমস্যা; সর্ব্বোপরি প্রকৃতির অনন্তলীলা, সৌন্দর্য্যের অনন্ত বৈচিত্র্য, ভাবের অনন্ত বিকাশ, প্রেমের অনন্ত রহস্য বর্ণন, চিত্রন, স্ফুরণ— বিষয়ের সূচী প্রস্তুত করিলে বোধ হয় শত পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়। এক একটি বিষয় আবার কবি কত বিভিন্ন প্রকারে পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রেমের পসরা, উপহারের থলি আছে। মিলনে, বিদায়ে, চুম্বনে কতই না বৈচিত্র্য! এক একখানি চিত্রাধারে এত অধিক চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে যে বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একাধিক প্রতিভাশালী চিত্রকরের পক্ষেও সেগুলি চিত্রিত করা বহু সময় সাপেক্ষ।

অন্যান্য কারণ—সাহিত্য রথী বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "এক্ষণকার কবিগণ—জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ। নানাদেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্ত মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে।" ইংরাজি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর বহুবিষয়িনী জ্ঞান ও শিক্ষার স্রোত শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালি সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কখন বা ইংরাজি কখন বা সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। সাহিত্যের এমন এক অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যে তাহা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরের গূঢ় কথা টানিয়া বাহির করে। শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালির মনে অনেক কথা, হৃদয়ে অনেক উচ্চ ভাব জমিতেছিল। নূতন সত্য, নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন তথ্যের আলোকে পুরাতন ভাবগুলি নবজীবন লাভ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহার ফলে ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক পুরাতন বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। নূতনর সহিত পুরাতনের সংঘর্ষে নব-বলে দৃপ্ত নূতনেরই প্রথমটা জয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রীগণের স্বাধীনতা, এই দুইটি কার্য্যে বাঙ্গালির স্বাধীন চিন্তা নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া কিন্তু একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই। হেমচন্দ্র নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তখনও স্ত্রী-স্বাধীনতার

ভেরী বাজাইতেছিলেন। নবীনচন্দ্র মাঝে মাঝে নূতনের পক্ষ হইতে পুরাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু নূতন সম্প্রদায় যে ভাবরাশি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে আশা ও উৎসাহে বাঙ্গালি সমাজে ভাবের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতায় তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল না। কেশবচন্দ্র, প্রতাপ, শিবনাথ, আনন্দমোহন, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নব্য তন্ত্রের প্রতিভূগণ বাগ্মিতার অগ্নিস্রাবে নব স্বাধীনতার হৃদয়ে যে উন্মাদ তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহারই উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

বাঁধ ভাঙ্গিল—স্ত্রীশিক্ষার ফলে বঙ্গনারী স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। ইহাকেই বলে যথার্থ স্ত্রী-স্বাধীনতা। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাহার মনে যে উচ্চাভিলাষ জাগ্রত হইয়াছে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালি সমাজের নাই। স্বাধীন চিন্তা বঙ্গমাতার অন্তরে যে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালাইয়াছে তাহার উত্তাপ রবীন্দ্রনাথের কবি হৃদয়ে পঁহুছিয়াছিল। তাহার হৃদয়ের বেদনা রবীন্দ্রনাথ যতটা অনুভব করিয়াছিলেন অপর কোন বাঙ্গালি কবি ততটা করেন নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিতা রমনীর প্রাণের কথা বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাহার হৃদয়ের ভাব গীতি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বাধীনতাকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে বাঁধিয়া রাখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য শিক্ষিতা বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের হৃদয়ের লুকান ভাবগুলিকে মুখরা করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় বাঙ্গালি রাজনীতিকের মনের কথা যেমন সকলে জানিতে পারিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কৃপায় তেমনি শিক্ষিতা বঙ্গনারীর মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথ কাব্যসাহিত্যে যে বন্যা উপস্থিত করিয়াছেন তাহার ফলে বঙ্গীয় কাব্য জগতে মহিলা-কবির আবির্ভাব হইয়াছে—নারী হৃদয়ের অবরুদ্ধ ভাবরাশি বাঁধ ভাঙ্গিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে।

অলঙ্কারপ্রিয়তা—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমাদের দেশের অন্তঃপুরে চেতনার অভাব ছিল। সাহিত্য-সমাজে বঙ্গ-রমণীর স্থান ছিল না। কুমারী তরু দত্ত ফরাশি ও ইংরাজি ভাষায় যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন বাঙ্গালির নিকট তাহার গৌরব অপ্রকাশিত। যে দুই একটি মহিলা কবি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় দেখা দিয়াছিলেন তাঁহাদের কবিতার প্রাণ ছিল না। পুরাতন কথা, পুরাতন ভাব লইয়াই তাঁহারা অলঙ্কারসর্ব্বস্ব কবিতায় সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিলেন। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকগণ তখন আপাদ মস্তক গুরুভার অলঙ্কারের

পক্ষপাতী। পুরুষ কবিগণও অলঙ্কারপ্রিয় অবগুণ্ঠনবতী বঙ্গ-বধূর আদর্শে কাব্য সুন্দরীকে সাজাইতে ভালবাসিতেন। পাঠকের সমক্ষে তাহাকে সমাসবহুল উপমালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বাহির না করিলে কবিরা মনে করিতেন যে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল না। অলঙ্কারের ভারে ভাব চাপা পড়িয়া থাকিত। তখন সবে মাত্র প্রতীচ্য ভাবের সহিত স্ত্রীশিক্ষার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সেই কারণে বোধ হয় পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে কবিতা রচিত হইত। সরমা ও সীতার প্রাণের কথা অশোক বনের বাহিরে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। সীতার অন্তরের যত কথা রাক্ষস বধূ যে উপায়ে জানিয়া লইল তাহা কিন্তু প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়তা, সহজ ভাষা, সরল ভাব শিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীর হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া দিয়াছে।

"আমি শুধু বুঝি সখি সরল ভাষা!
সরল হৃদয় সরল ভালবাসা।"

নগ্ন সৌন্দর্য্য—রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার একটি প্রধান বিশেষত্ব —গুরুভার অলঙ্কারের অভাব। কবিতার নগ্ন সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বোধ হয় বর্ত্তমান যুগে অপর কোন বাঙ্গালি কবি দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি বৈষ্ণব কবিদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার আদর্শ—স্বাধীনতা প্রাপ্ত শিক্ষিতা বঙ্গ-রমনী। বসন-ভূষণ, সাজ-সহায় বঙ্গ-রমনী আতিশয্যের আদৌ পক্ষপাতী নহেন! সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অলঙ্কারের বাহাড়ম্বর না থাকিলেও ভাবের আধিক্য আছে। তাঁহার মানস-সুন্দরী প্রতীচ্য ভাবে শিক্ষিতা বঙ্গ-নারীর অন্তরঙ্গ। উভয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় অনুরাগ জমিয়াছে তাহার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য নূতন শিল্পসৌন্দর্য্য গরীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশের কাব্য-কলা মহিলা-কবিগণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতায় এক নব-যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের গর্ব্ব হয়ত সাহিত্যে নারী-শিল্পের প্রবেশাধিকার স্বীকার করিবে না, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কাব্যের অলঙ্কার বহুল দেহ হইতে নারীর সুকোমল হস্ত গুরুভার ভূষণ সকল অলক্ষিতভাবে খুলিয়া লইয়া তাহার কলেবরে নগ্ন-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব কমনীয়তা ঢালিয়া দিয়াছে।

এবং, আত্ম—রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের সহিত যে বিশুদ্ধ প্রেমের মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতীচ্য শিক্ষার দোষে আমাদের অন্তরে সে সৌন্দর্য্য, সে প্রেম জাগিয়া উঠিল না। শিক্ষিত বাঙ্গালি ও শিক্ষিতা বাঙ্গালিনীর

হৃদয়ে যে প্রেম জাগিয়াছে তাহা ইংরাজি ধরণের নবেলিয়ানা প্রেম। ইংরাজি উপন্যাস রহস্যাস প্রভৃতি পড়িয়া এই প্রেমের ছবি আঁকা হইয়াছে। ইংরাজি খবরের খাগজে কাঁচি-কাটা গল্পাংশ পাঠ করিয়া এই প্রেমের আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে জাতির জীবন অনেকটা ঔপন্যাসিক ঘটনায় পূর্ণ সে জাতির তৃতীয় শ্রেণীর নবেলে যে তীব্র জ্বালাময় প্রেমের চিত্র দেখান হয় তাহা অসত্য হইলেও কল্পনা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রেমিকের জীবন গঠিত করে। সেই কারণে, প্রতীচ্য সমাজে রমনীর প্রেমে এতটা মাতা-মাতি, একটা বিষাদ কালিমা, এতটা বাসনার ছটফটানি। এই উন্মাদ স্বাধীন প্রেম ইংরাজি সৎসাহিত্যে নাই বরং ইহার অস্বাভাবিকতা তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। এই প্রকার প্রেমের ভাবী ফল যে কি ভয়ঙ্কর সেই সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে প্রেমের গভীরতা চিঠির রচনায় প্রকাশ পায় তাহাতে শঠতা আছে, হৃদয়ের সরলতা নাই। মনের ভাব চাপিয়া রাখিব মুখে খুব বেশি রকমের কায়দা দেখান এই নবেলি প্রেমের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যের বিষয় এই অস্বাভাবিক প্রেম ভালবাসার বিকাশ বাঙ্গালি সমাজে, বিশেষতঃ বাঙ্গালি হিন্দু পরিবারের মধ্যে দেখা যায় না। বাঙ্গালির গদ্য ও পদ্য সাহিত্যই ইহার অদ্ভুত লীলাভূমি। যে কাল্পনিক প্রেম ভালবাসার আদর্শে বাঙ্গালি স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করিল বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কোথাও তাহার ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ভিত্তিহীন প্রেমের অভিনয় দেখাইতে যাইয়া আমরা বাস্তব জগত ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। ভারতের অতীত ইতিহাসের দৃশ্যাবলীর মধ্যে ইহার রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছি। ঔপন্যাসিক সাহিত্য কাননে ইহার যৌবন-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া অসংযত কল্পনার সহিত বিলাস ব্যভিচারে গা ঢালিয়া দিয়াছি।

আমাদের অধিকাংশ পাঠ্য-কাব্যে, খণ্ড-কাব্যে, গীতি-কবিতায়, উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার অতি উচ্ছাস জাতীয় চরিত্রের অসারতাই প্রমান করিয়া দিতেছে। কবিতায় লিখিয়া কবিতায় উত্তর প্রত্যুত্তর, কবি বিশেষের অনুকরণে বিপরীত ভাবজ্ঞাপক, কবিতা রচনা, পরিচিতা ও অপরিচিতা মহিলা-কবিকে কবিতা উপহার, সনেটের জবাব-সনেট, কাব্যের জবাব-কাব্য, রসহীন ব্যঙ্গ, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এবং এইপ্রকার আরও কত মানসিক বিকার উৎপাদক জিনিষ লইয়া যে আমাদের সাহিত্য-সংসার ব্যস্ত রহিয়াছে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার রাগিণী তাঁহার অনুকরণকারী অধিকাংশ কবি ধরিতে পারেন নাই বলিয়া এত গণ্ডগোল। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে

যে প্রেম জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা গদ্য-সাহিত্যের ঔপন্যাসিক প্রেম-ভালবাসায় দূষিত হওয়ায় বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে।

রমণী-প্রেম-সংস্কৃত কবি—পুরুষের আকুল প্রেমের কথা কালিদাস যক্ষের মুখ দিয়া মেঘদূতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যক্ষপত্নীর নারী-জাতি সুলভ ধৈর্য্যেরই বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে ভারতে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল তবু তাঁহার নায়িকার প্রেমে বাচালতা নাই। যক্ষ অপরিচিতের কাছে হৃদয়ের ভাব গোপন করে নাই। যক্ষ বাচাল কিন্তু তাহার কান্তা বিরহ জ্বালা ভাষায় প্রকাশ করিতে জানে না, তাহার যেন সে ক্ষমতাই নাই। বিরহিনীর মধুর প্রেমের নীরবতা কালিদাস সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। কালি-দাসের শকুন্তলাও নীরব প্রেমের চিত্র। যেখানে স্বাধীন প্রেমের মিলন গান্ধর্ব্ব বিবাহে, স্বয়ম্বর সভায়, বীরত্বের পরীক্ষা-মন্দিরে সেখানেও ত নীরবতা রমনীর প্রেমের ভাষা। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সহিত রমনী-প্রেমের চর্চ্চা করেন নাই। কালিদাসের প্রেমে পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ, প্রত্যাখ্যান আছে কিন্তু তাঁহার প্রণয়িনীর মুখে কথা নাই। রবীন্দ্রনাথ নারীর মুখ দিয়া তাহার হৃদয়ের কথা যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় সংস্কৃত কবিরা তাঁহাকে রমণী প্রেমের তত্ত্ব শিখান নাই। ভারতের প্রাচীন কবির প্রেমের আদর্শই বা তিনি বাঙ্গালি সমাজে কোথায় পাইবেন? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "সাহিত্য দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের, প্রতিবিম্ব মাত্র।" সেই কারণে উজ্জয়িনীর কবির সহিত বঙ্গের কবির ঐক্য না হওয়াই স্বাভাবিক। কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন, প্রাচীন ভারতের কোন কাব্য-প্রণেতার সহিত বঙ্গদেশের পুরাতন ও নূতন কোন কবির রমণী-প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে মিল পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই কথা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার মতে কোন কোন বিষয়ে রমণীর রমণীত্ব কবির চক্ষে চিরকাল সমান থাকে।

"এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্তলোকে,
মন্দ তাঁরা লাগ্‌তনা কেউ
কালিদাসের চোখে!
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,

বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীয় চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত,
কালিদাসের কালে!"

(সেকাল)

রমণী-প্রেম-বৈষ্ণব কবি—বৈষ্ণব কবির আদর্শ, কাল্পনিক রাধা—সামাজিক রাধা নহে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের লীলা পৌরাণিক আর্য্য সমাজের চিত্র নহে। পৌরাণিক সাহিত্যে তাহাদের আদর্শ মেলে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম মিশ্রিত হিন্দু সভ্যতার মুমূর্ষাবস্থায় সামাজিক শাসন যখন শিথিল হইয়া-গিয়াছিল সেই সময়ে অবৈধ প্রেম নিন্দনীয় অভিসারপ্রিয়তার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। ভারতীয় মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আমলেও যে বাঙ্গালাদেশের সীমান্তে ও বহির্ভাগে অভি-সারের কুঞ্জে গুপ্ত প্রণয়ের অভিনয় হইত, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। তাহা হইলেও, তখনকার বাঙ্গালি সমাজে যে এরূপ প্রণয় দূষনীয় ছিল আর রাধা-কৃষ্ণের গোপন প্রেম যে প্রাচীন বাঙ্গালি সমাজের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের আদর্শ নয় সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মানব-হৃদয়ের উচ্চ প্রেমভাবের যেমন বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় তেমনি আবার "কামগন্ধ" -যুক্ত অবৈধ প্রেমের নিন্দা শুনা যায়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের লীলা কবির কল্পনা-সম্ভূত ব্যাপার। তবে, কল্পনা যে বাস্তবকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া রমণী-প্রেমের মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে। প্রেমের কবির একটা মূল আদর্শ থাকা চাই। অনেকে বলেন, রজকিনী রামীর গভীর প্রেম চণ্ডীদাসের গুরু। রাজা শিবসিংহের মহিষী রাণী লখিমা দেবী বিদ্যাপতির রাধা। রাণী লখিমা হয়ত বিদ্যাপতির আদর্শ নহেন। চণ্ডীদাসেরও হয়ত রজকিনী রামী আদর্শ নহে। কিন্তু তাঁহাদের কল্পনা যে অভিসার-সাহিত্য হইতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

সাহিত্য সুধী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন,—"শিবসিংহ ও লখিমার নামযুক্ত যে সকল পদ আছে সেগুলি সম্বন্ধে মিথিলায় যে প্রবাদ আছে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। বিদ্যাপতি রাজা ও রাণীর ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ রচনা

করিতেন তাহা রাজান্তঃপুরে গীত হইত। শিবসিংহ ও লখিমার সমাজ অর্থে অন্দর মহল। রাজা রাণী অন্দরমহলে উপবেশন করিলে চারিদিকে পুরস্ত্রীগণ সমবেত হইত। তখন কেটী (চেড়ী) নামক গায়িকাশ্রেণী কবি বিদ্যাপতি রচিত শিব সিংহ লখিমা ভণিতাযুক্ত গীত গান করিত!" জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইতি পূর্ব্বেই কবি-সমাজে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার বার্ত্তা শুনাইয়াছিল। জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমাজিক ইতিহাস বাৎস্যায়নের কামসূত্র নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে ইহার রচনাকালে রাজাদের রুচি অতি জঘন্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল। অবরোধের মধ্যে ও তাহার বাহিরে যে সকল কদর্য্য ব্যাপার সংঘটীত হইত তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কবিতায় আদিরসের আধিক্যের কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। বিদ্যাপতি যদিও নিজে শৈব ছিলেন কিন্তু রাজাদেশে প্রেমের গীত রচনা করিতে বাধ্য হইয়া সেই সময়কার সামাজিক রুচির ও অভিসার-সাহিত্যের প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমেরলীলা এখানকার মার্জ্জিত রুচির পক্ষে অশ্লীল হইলেও তখনকার সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। বৈষ্ণব কবিগণ ধার্ম্মিক ছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা রাজার অন্তঃপুরে, ভদ্র সমাজে, দেব মন্দিরে গীত হইত। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সামাজিক অবনতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, কামপরায়ণ ধনীগণের নৈতিক উন্নতি সাধন-কল্পে স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ কিন্তু সামাজিক রাধা—কাল্পনিক রাধা নহে। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে ব্যক্তিগত মূল আদর্শের আভাস পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতে ভাবেরও অনেক পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব কবির প্রেমে নৈরাশ্য নাই, চিরবিচ্ছেদ নাই—মিলন আছে। সংস্কৃত কাব্যেও এই ভাব। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক প্রেমিকা নৈরাশ্যের ক্রীড়া পুত্তলিকা, বিষাদের চিরসহচর, বিরহের ইন্ধন। বৈষ্ণব কবির রমণী-প্রেমে কতকটা স্বাধীনতা আছে। রবীন্দ্রনাথের রমণী-প্রেম স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। অভিসার ও দূতীত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কেন, আধুনিক বঙ্গীয় বাক্য-সাহিত্যে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, মানসিক অভিসার ও দূতীত্ব কবির কল্পনায় জন্মলাভ করিয়া কখন কখন কাব্যের কুঞ্জভবনে দেখা দিয়া থাকে। রমণীপ্রেমে ভক্তির ভাব বৈষ্ণব কবিতার প্রধান অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্পষ্টতঃ এই ভাব খুব কম। বর্ত্তমান কাব্য

কলার যুগে আদিরসাত্মক কবিতার স্থান নাই। ইতরজনোচিত অশ্লীল রচনা আপাততঃ সমালোচকের সারথ্যে পদ্যের অধিকার হইতে গদ্যের খাস মহলে আসিয়া পড়িয়াছে। আদিরস সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির সহিত বর্ত্তমান যুগের কোন কবির ঐক্য হয় না। বাঙ্গালি সমাজ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কাব্য-সাহিত্যে এত নূতন নূতন ভাবের সমাবেশ দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের রুচি এমন পরিমার্জ্জিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান সময়ের প্রেমের কবির সহিত প্রাচীন কবিগণের অনেক বিষয়ে অনৈক্য না হইয়া যায় না। কিন্তু একথাও সত্য যে জাতীয় উদ্যমে মৌলিকতার অভাব প্রেমের কাব্যে অনুকরণপ্রিয়তার আশ্রয় লইয়া কতকটা ভাবের ও অনেকটা ভাষার দৈন্য দূর করিয়াছে।

রমণী-প্রেম-পাশ্চাত্য শিক্ষারযুগ—বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে রমণী-প্রেমের নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। মধুসূদন দত্তের কাব্যে এই নূতন আদর্শের আকস্মিক আবির্ভাব আমাদিগকে চমকাইয়া দেয়। বাঙ্গালি বীরাঙ্গনার প্রেম তখন প্রতীচ্য আদর্শে প্রেমিকের হৃদয়ের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রঙ্গলাল রমণী-প্রেমের নির্ব্বাক শক্তি পদ্মিনীর চিতার ধূমে পর্য্যুষিত করিয়াছিলেন। প্রেমের ইতিহাসে আত্মবলির অধ্যায় শেষ হইয়াছিল। আইনের বলে সতীদাহ নিবারিত হইয়া যেমন একদিকে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বহুবিবাহের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত হইয়া তেমনি অপর দিকে কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গদেশের নারীগণের ক্রমোন্নতিশীল অবস্থা শিক্ষার দ্রুত বিস্তৃতির সহিত এরূপ আকার ধারণ করিল যে ইহা সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বঙ্গবামার পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল অভিমত মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে লাগিলেন তাহার ফলে কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা সকলেরই হৃদয়ে নূতন আশার আলোক প্রবেশ করিল। আশা মানবকে বাঁচাইয়া রাখে। যে সুখের আশায় বঙ্গ-রমণী বাঁচিয়া রহিল তাহার কাল্পনিক চিত্র ঔপন্যাসিক গদ্য সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়া তাহার শূন্য হৃদয়ে প্রেমের মায়া-কানন সৃজন করিল।

বঙ্গদেশের আধুনিক ঔপন্যাসিক সাহিত্যের মত অলীক, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক সাহিত্য বোধ হয় জগতে অপর কোন জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যে জাতির পুরুষদিগকে আত্মরক্ষার্থে হিন্দুস্থানী শরীর

রক্ষকের সাহায্য লইতে হয় তাহাদের জীবনে রোমান্টিক্ প্রেম কিছুতেই সম্ভবে না। বাঙ্গালি সমাজ যে ভাবে গঠিত তাহাতেও নারী-হৃদয়ের কোন উচ্চ ভাব যে স্বাধীনতার অনুকুল বলিয়া বোধ হয় না। প্রেমে জাতিবিচার নাই কিন্তু আমাদের সমাজ জাতি বিভাগের কঠোর নিয়মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে এদেশে রমণী-প্রেমে স্বাধীনতা একেবারেই সম্ভবপর নহে। স্বাধীন প্রেমের সোণার তরী বাঙ্গালি সমাজের ঘূর্ণায় পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। যাহারা সমাজ মানিয়া চলে না কিম্বা যাহারা বিবাহ-আইনের আশ্রয় লইয়া স্বাধীন প্রেম বজায় রাখিতে চায় তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে তাহাদিগের আদর্শে গদ্য সাহিত্যে ঔপন্যাসিক প্রেম-ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

যে প্রেম-ভালবাসার আদর্শ লইয়া গদ্য সাহিত্য বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মূল বাঙ্গালি সমাজে নাই, কখনও ছিল না। এমন কি, বঙ্গ-দেশের সমাজ বিশেষে সাম্যনীতির আধিপত্যের মধ্যেও রমণী-প্রেম অবরোধের বাহিরে আসিয়াও আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানিতে পারে নাই। শিক্ষিতা বঙ্গরমণী স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিল বটে কিন্তু তাহার প্রেমভাব হৃদয়ের অন্ধকূপে রহিয়া গেল, বাহিরের উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিতে পারিল না। আদর্শ-ভ্রম হইলে যে অবস্থা হয় নারীগণের সেই অবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার ঔপন্যাসিক গদ্য সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রেম-ভালবাসার গল্পের বঙ্গানু-বাদ ব্যতীত আর কিছুই না। ইংরাজি নবেলের স্বদেশীকরণ করিতে যে সকল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই বাঙ্গালি লেখক চতুরতার সহিত সংশাধন করিয়া লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাহীন অনুকরণকারীদিগের হস্তে শিক্ষিতা বঙ্গ-রমণী এইরূপে অনেকদিন ধরিয়া প্রতারিতা হইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালি গল্পওয়ালা অপ্রকৃত অসম্ভব প্রেমের কাহিনী শুনাইয়া আমাদের দেশের নারী-গণের যে কি অনিষ্টসাধন করিয়াছে তাহা বলা যায় না। কুমারীর সংখ্যা ব্রাহ্ম-সমাজে এই কারণে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ইহার ফলে দিন দিন হ্রাস হইয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে ধ্বংশের দিকে লইয়া যাইতেছে।

যে নিজে বিবাহের বাজারে নিলামে বিক্রীত হয় সে কিনা আবার মুক্ত প্রেমের চিত্র আঁকিয়া মহিলা পাঠকের শিক্ষকতা করে! যদি বাঙ্গালা নবেল গল্প ইত্যাদি লিখিয়া প্রেমের গুরুমহাশয়গণ ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে শিক্ষিতা বঙ্গললনা হয়ত একদিন নিজের স্বপ্ন-ভ্রম বুঝিতে পারিত, কাল্পনিক প্রেমের বীজ

হৃদয়ের সাধন ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ফেলিত। কিন্তু অবলা বাঙ্গালিনীর শিক্ষকেরা বঙ্গীয় রঙ্গ-মঞ্চে কৃত্রিম প্রণয়ের অভিনয় দেখাইয়া আমাদের দেশের নারীকুলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বারাঙ্গনার সাহায্যে ভদ্রবংশীয়া শিক্ষিতা স্ত্রীগণের সমক্ষে প্রেমের অভিনয়ন যে নিতান্ত দূষনীয় তাহা আজ পর্য্যন্ত বিনামূল্যে অভিনয় দর্শনেচ্ছু সাহিত্য সমালোচকগণ বুঝিতে পারেন নাই। থিয়েটার দেখিয়া রমণী-প্রেমের গৌরব অনুভব করা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রেম শিক্ষার ন্যায় এক কিম্ভুত ব্যাপার। একজন বিদেশী আমাদের দেশের মাসিক-পত্রিকা সকল পাঠ করিয়া, থিয়েটারে অভিনয় দেখিয়া মনে করিবেন যে বঙ্গদেশে রমণী-প্রেমে স্বাধীনতা আছে। তাহা না হইলে প্রেমিক প্রেমিকার অসংখ্য চিত্র কিরূপে সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইল ? ' সাহিত্য ত দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। জাতীয় ভণ্ডামীর ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক প্রমান আবশ্যক হয় ? রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতায় পুরুষের কপট প্রণয়ের বিরুদ্ধে প্রতারিত নারীহৃদয়ের অভিযোগ অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

কৌতুক-কণা।

(শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ বিএ্ এল)

(১)

পল্লীগ্রামের রাসযাত্রা হইতেছে। পূজার সময় আটদিন ধরিয়া এই যাত্রা হয়। পূর্ব্বে তিনদিন যাত্রা হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র হনুমানকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়াছেন। আজ চতুর্থ দিন। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ দিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাত্রা বসিবার পূর্ব্বে হনুমানের পেট ছাড়িয়া দিয়াছে। সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। আজ সে ব্যক্তি আর কিছুতেই হনুমান সাজিতে পারিবে না। গ্রামে এ কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। অধিকারীর আর এমন অতিরিক্ত ব্যক্তি নাই যে হনুমান সাজে। হনুমানের অভাবে রাম-যাত্রা বন্ধ হইতে যাইতেছে শুনিয়া পাড়ার সবাই বিশেষতঃ বালকবৃন্দ বড়ই দুঃখিত

হইল। তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া প্রতিবেশী রমা বাগ্দীকে চার আনা পয়সা দিয়া হনুমান সাজিতে রাজি করাইল।

যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। রামচন্দ্র সীতাবিরহে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন ও বিষন্নবদনে হনুমানের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া, শিশুদিগের মনে ভয়ের আতঙ্ক করিয়া "হুপ" "হাপ" করিতে করিতে হনুমানে আসিয়া হাজির। বালকগণের আমোদ দেখে কে? হনুমান না হইলে কি রামযাত্রা হয়? হনুমানকে আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্রের পাণ্ডু ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বড় আশায় হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা হনুমান, সীতা উদ্ধারের কি করলে, বাবা? কোন সংবাদ পেলে?" রমা বাগ্দী ক্ষেতে চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে। পড়াশুনার ধার সে আদৌ ধারে না। অধিকারী হনুমানের পার্ট অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে গিলাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আসরে নামিয়া তাহার একটি কথাও মনে পড়িল না। সে অনেক চেষ্টা করিল, তবু এক অক্ষরও স্মরণ করিতে পারিল না। হনুমান চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামচন্দ্র তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন। সে তবুও নিশ্চল নির্ব্বাক! রামচন্দ্র তখন অতীব দুঃখিত হইয়া হনুমানকে বলিলেন,—"বাবা, বল না। তবে কি কোন সংবাদই পাও নাই।" হনুমানের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে ভাবিল এতলোকের সম্মুখে রামচন্দ্র তাহাকে অপমান করিল। সে তখন তাড়াতাড়ি হনুমানের পোষাক খুলিয়া বলিল,—"বাবা, চার আনার পয়সা পেয়েছি, হনুমান সেজেছি, সীতা উদ্ধারের কি জানি বল? এই নাও হনুমানের পোষাক, এই নাও লেজ, আমি চল্লাম।"

অধিকারী বেগতিক দেখিয়া যাত্রা সে রাত্রি স্থগিত রাখিলেন।

(২)

শিক্ষক মহাশয়, ক্লাসে ছাত্রদের অঙ্ক বুঝাইয়া দিতেছিলেন। নানারকমে, নানাভাবে, যাহাতে ছাত্রদের মাথায় অঙ্কের কুটিল তত্ত্ব প্রবেশ করে, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় এক ছাত্র বাহিরে যাইবার অনুমতি চাহিল। শিক্ষক মহাশয় রাগিয়া বলিলেন,—"যাও, আমি আঁক বুঝিয়ে দিচ্ছি, বাহিরে যাইবার এ সময় নয়, কখনও কিছু হইবে না।" ছাত্রের কর্ণে গুরু-মহাশয়ের এ উপদেশ প্রবেশ করিল কিনা বলিতে পারি না। সে নিশ্চিন্ত মনে ক্লাসের বাহির চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে ক্লাসে ফিরিয়া আসিলে, শিক্ষক

মহাশয় তাহাকে অঙ্কটি বোর্ডে কসিতে বলিলেন। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন শিক্ষক মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া,—"আধ ঘণ্টা একটা আঁক এত করে বুঝিতে দিলুম, তবু হলো না। খালি বাহিরে যাবার ফন্দি। আঁক ত বুঝে জল হয়ে যাবার কথা!" বুদ্ধিমান ছাত্র ভাবিয়া এবার উত্তর দিবার সুবিধা পাওয়া গিয়াছে। বলিল,—"আজ্ঞে, জল হয়ে যাবার কথা যখন বল্লেন, তখন নিশ্চয়ই জল হইয়া বেরিয়ে গেছে!"

ছাত্রের ইতিপূর্ব্বে বাহিরে যাবার কথা মনে পড়ায় মাষ্টার মহাশয় অবাক্।

(৩)

এক কাবুলিওয়ালা কোন খাবারের দোকানে গিয়া দোকানদারকে খাবরের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছে,—ওকে কি বলে? ওকে কি বলে? (অবশ্য সে তাহার ভাষাতেই কথা বলিতেছিল) দোকানদার উত্তর করিতেছে,—ওর নাম গজা, ওর নাম জিলিপি, ওর নাম পান্তুয়া। কাবুলিওয়ালা কেবল খাবারের নামই জিজ্ঞাসা করিতেছে, অথচ কিছুই কিনিতেছে না দেখিয়া দোকানদার বড়ই রাগিয়া গেল। দোকানে একটি বড় ঝুড়িতে এক ঝোড়া জামাইবাড়ী তত্ত্ব দিবার জন্য ফরমায়েস উত্তম খাজা সাজান ছিল। তাহা দেখিয়া কাবুলি-ওয়ালার জিহ্বায় জল আসিল। সে দোকানদারকে উহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। দোকানদার রাগিয়া বলিল—"খা-জা।" কাবুলিওয়ালা ভাবিল সে রাগিয়া এরূপ উত্তর করিয়াছে। সে বার বার তিনবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যি বল ভাই, ওর নাম কি?" "আরে খা-জা।" "ভাই, তবে আমার কোন দোষ নেই, তুমি খালি বলছ, খা-জা, আমি খাই।" এই বলিয়া কাবুলিওয়ালা আর সময় নষ্ট না করিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইল। দোকনদার ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কাবুলিওয়ালা এক একখানি খাজা ধরে আর মুখ ব্যাদন করিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। দোকানদারের চীৎকারে আশপাশের লোক আসিয়া হাজির হইল। তাহারা কাবুলিওয়ালার পিঠে চড় ঘুসি ইচ্ছামত বসাইতে লাগিল। কিন্তু তাতে কি হইবে? সেদিকে তাহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার সেই আলখাল্লা ভেদ করিয়া চড় ঘুসি পিঠে স্পর্শ করিল না। সে মনের আনন্দে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া যাইতেছে। সবাই তখন উহাকে টানিয়া কাজির কাছে লইয়া যাওয়াই স্থির করিল। কাজি সব শুনিয়া কাবুলিওয়ালাকে দুটাকা মূল্য ধরিয়া দিতে বলিল। কাবুলিওয়াল তাহার কোথায় দোষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বারংবার বলিতে লাগিল,

দোকানদার তাহাকে তিনবার "খা-জা" বলিয়াছে, তবে সে খাইয়াছে। কাজি তখন বলিলেন, উহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া পিছনে বাজানা বাজাইতে বাজাইতে দেশের বাহির করিয়া দাও। তাহার কথামত কাবুলিওয়ালাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া দেওয়া হইল। বাজানদার পশ্চাতে বাজানা বাজাইতে বাজাইতে চলিল। কাবুলিওয়াল ভাবিল, এ মজা মন্দ কি? (পেট পুরিয়া খাইলাম, আবার ঘোঁড়ায় চাপিয়া চলিয়াছি, পশ্চাতে বাজানদার বাজানা বাজাইতেছে। তাহার স্ফুর্ত্তি দেখে কে? সে গোঁফে তাঁ দিতে দিতে মনের আনন্দে চলিল।

"বেস্পতিবারের বারবেলা।"

প্রথম দৃশ্য।

Darjeeling.

Lewis Sanitarium Room No. 34.

(প্রিয় ও সরল দুই বন্ধুর প্রবেশ)

প্রিঃ। দেখ্ ভাই কার্ত্তিকটা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচে; ওকে একটু জব্দ ক'রে না দিলে ত চল্‌চে না।

সঃ। ঠিক বলেচিস্ প্রিয়; ওটার মাথাটাতা খারাপ হয়ে পাচে না কি। যা মুখে আসে বলে, মনে করে আমরা সবই বুঝি বিশ্বাস কচ্চি।

(ভুজঙ্গের প্রবেশ)

প্রিঃ। এই যে ভুজঙ্গ; কোথা ছিলে হে?

ভুঃ। কার্ত্তিকের সঙ্গে Botanical Gardenএ বেড়াতে গিছলাম'। কার্ত্তিক ত দেখলুম্ Botanisl, হেন ফুল নেই যার নাম সে জানে না, হেন Fern নেই যা তার বাড়ীর টবে জন্মায় নি। কার্ত্তিক বলে, সে আপেল ফলিয়েচে এক একটা বড় পাকা বেলের মত।

প্রিঃ। ঐ শুনলে? আমরাও তারি কথা কচ্চি।

ভুঃ। আমার মনে হয়, ও একটা বেশ innocent আমুদে লোক! ও যা গল্‌গল্ করে বলে যায় তার এক বিন্দুও কেউ সত্যি মনে করে না, তবু লম্বাই চওড়াই ছাড়ে না। Tall talk ওর ধাতের সঙ্গে মিশে গিয়াছে।

সঃ। পথে ঘাটে ইচ্ছে করে ইঁজ্রেজ্ পিঁজ্রজের সঙ্গে পায়ে পায়ে ঠোক্কর লাগিয়ে Beg your pardon করে আলাপ বাগিয়ে নেয় কেমন, শুনেচ ত ?

ভুঃ। শোনা ত দূরের কথা, নিজের চোখে দেখিচি।

প্রিঃ। ওর Kohat Treasury ব্যাপারটা শুনেছিলে ?

সঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়ল ; ভুজঙ্গ বোধ হয় সে রঙ্গ শোনে নি।

ভুঃ। না হে না, সে ব্যাপারটা কি ?

প্রিঃ। আরে ভাই সে এক ভারি মজা। বাবু ত চাকুরি চাকুরি করে, এর দোর ধরে, ও দোর ধরে হাকালন্তে, লোকের কাছে পরিচয় দেওয়া হয়, হ্যানো সাহেবের কাছে যাচ্চেন, ত্যানো সাহেবের বাড়ী গিছ্লেন ; Commissioner সাহেব এমন খাতির কল্লেন, Secretary সাহেব এই কথা বল্লেন, শুন্তে শুন্তে ত কান ঝালাফালা।

ভুঃ। হ্যাঁ তা ত জানি ওর যা মুরুব্বির জোর আর এলেমের কদর, তা ত আর কারো জান্তে বাকি নেই। ভাগ্যে বাপ কিছু পয়সা রেখে গিছলো, নইলে ওকে শ্যাল কুকুরে টেনে নিয়ে যেত। তার পর ? হয়েছিল কি ?

প্রিঃ। বহুকাল ধরে হত্যা দেবার পর একবার বুঝি বেরালের ভাগ্যে সিক্কে ছেঁড়বার মত হয়েছিলো। হয়ত কোন সাহেব সুবো তাকে একটা চাকুরি জুটিয়ে দেবার আশা টাসা দিয়েছিলেন। কোথায় সে ধাপধড়া গোবিন্দপুর, হিল্লি দিল্লীপার বেলুচিস্থানের কোন্ যায়গায় বুঝি গবর্ণমেণ্টের এক কুলী-ডিপো আছে, সেখানকার Paymastera আপিসে clerk পদে একটা Vacancy হয়েছিল।

সঃ। লোকটা যেমন সৃষ্টিছাড়া, চাকুরিটাও জুটছিলো ভারত ছাড়া।

ভুঃ। হতচ্ছাড়া বল, তা নইলে মানাবে কেন ? তার পর ?

প্রিঃ। বাবুর যাঁহাতক্ খবর পাওয়া চাকুরি পাবার যোগাড় হয়েচে, অম্নি আপনিই চারি দিকে রটিয়ে বেড়াতে লাগ্লেন—তাঁর মস্ত কম্ম জুটেচে কোহাটের Treasury officer.

ভুঃ। হাঃ হাঃ হাঃ বল কি ! সে যে একটা বড় সড় military officerর পদ।

প্রিঃ। তা নইলে আর মজা কি? সে আক্কেল ত নেই।

সঃ। আস্পর্দ্ধা দেখ্ না। হেলে ধর্তে পারেন না কেউটে ধর্তে চান্ !

ভুঃ। তার পর ? চাকরির হল কি ?

প্রিঃ। সে আবার আরও pathetic। এই আমাদের সরলই সব মাটি করে দিলে।

সঃ। বাঃ আমি কেন? ওর আপনার অতলস্পর্শ বুদ্ধিই সে গুড়ে বালি দিয়ে দিলে বল।

ভুঃ। কি রকম, কি রকম?

প্রিঃ। আরে ভাই সে কথা আর কও কেন? আপনি ত দাপিয়ে বেড়ালেন এত বড় Officer হচ্চেন। এর কাছে বলেন, তার কাছে বল্লেন; আমরা ত ব্যাপারখানা বুঝতেই পারি নি। মনে কল্লুম হবেও বা, কার ভাগ্যে কি আছে কে বল্‌তে পারে? একদিন কথায় কথায় ওর মেজদাদাই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌লেন, বলে ফেল্‌লেন বাবুজীর চাকরিটি কি। আমরা যখন টিটকিরি দিতে সুরু করলুম, বিশেষতঃ সরল যখন ওর মুখের সাম্‌নে আয়নাটি ধর্‌লে তখন ভায়া সে চাক্‌রির উপর বীতশ্রদ্ধা হ'য়ে পড়লেন। যা হোক্ সরলের কেরামতি আছে বটে।

ভুঃ। কেন, সরল কি করেছিলো?

প্রিঃ। যারে বলে মুখের মতন। বাবু ত Treasury Officer হয়ে, ছাতি ফুলিয়ে, গোঁফে চাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সরল কোন্ দিন রাসের মেলা দেখতে গিয়ে একটি মস্ত বড় জাম্বুবানের মূর্ত্তি কিনে এনেছিলো। তার গলায় লাল ফিতে দিয়ে "Kohat Treasure" লিখে এক কার্ড ঝুলিয়ে, বেশ করে সাহেব বাড়ীর মত প্যাক্ না করে সেটা মুটে মাফৎ কার্ত্তিকদের বাড়ী চালান দিলে। সেদিন ওদের বাড়ী কিসের একটা জপশি ছিল; মেলা লোকজন জুটেছিলো। না জানি কি এক সওগাদ এসেছে মনে করে, সকলের সাম্‌নে কার্ত্তিক নিজে সেই প্যাক্ খুলে ফ্যালে। যাঁহাতক্ খোলা, সকলেই হো হো করে হেসে উঠ্‌লো; কারুর আর ব্যাপারটা বুঝ্‌তে বাকি রইল না বাবু স্বয়ং ছাড়া।

ভুঃ। Oh হো হো, বেড়ে হয়েচে! তার পর?

সঃ। আমি মুটেকে আগাম্ পয়সা দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলুম, কেউ জিজ্ঞেস্ করলে বল্‌বি, Army Navy stores থেকে আস্‌চিস্। সে বেশ cleverly কাজ হাঁসিল করেছিল, সকলের মাঝখানে মাল পোঁছে দিয়ে বেমালুম্ সড়ে পড়েছিল।

ভুঃ। চমৎকার! অতঃপর বাবু কি কল্লেন?

প্রিঃ। বাবুর বুদ্ধিখানা সকলের চেয়ে ধারাল কি না, সবাই বুঝ্‌তে পেরে যখন হাসাহাসি কর্‌চে, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে ভাবচেন, কাণ্ডখানা কি; কিম্বা ইচ্ছা করেই ন্যাকা সাজলেন। তারপর তাঁর ভাগ্‌নে যখন জাম্বুবানের গলায় বাঁধা কার্ডখানা খুলে নিতে চেষ্টা কর্‌লে, তখন তাঁর হুঁস্ হল। তখন বাবু রেগে আগুন, সে মুখের ভঙ্গিমা যদি দেখতে! অকস্মাৎ একেবারে সভা পরিত্যাগ।

সঃ। নিরুদ্দেশ বল।

ভুঃ। হোঃ হোঃ হোঃ।

প্রিঃ। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। বাড়ীতে কাজ, এ ডাকে, ও ডাকে, তাকে ত পাওয়া গেল না।

ভুঃ। লোকটা বিবাগী হয়ে গেছলো নাকি?

প্রিঃ। সেই রকম। কে এমন কল্লে, কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারে নি। সরলেরই কাছে এসে ভেউ ভেউ কান্না।

ভুঃ। বাহবা, বাহবা। তারপর?

সঃ। আমি যেন কিছুই জানি নি। তাকে অনেক স্তোকবাক্যি দিলুম; যে এমন কাজ করেচে তার উদ্দেশে বহুত রাগ প্রকাশ করলুম, বিস্তর বচন ঝাঁড়লুম, তবে সে ঠাণ্ডা। সেদিন আর বেচারা বাড়ী যায় নি।

কুঃ। বাড়ীতেও তার জন্য মরা কান্না ওঠে নি নিশ্চয়।

প্রি। গা মাফিক হয়েছিল বটে; কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, তাতেও তার চৈতন্য হয় নি।

অ। কিছু মাত্র না। দিন কতক একটু মুস্‌ড়ে ছিল, বড় একটা কারো কাছে ভিড়্‌তো না। দুচার দিন পরেই আবার যে কে সেই। আজ Evening party, কাল ছুলিচাঁদের বাগান, পরশু গহরজান; রোজ বড় বড় লোকে তাঁর সাধ্যি সাধনা করে জ্বালা[illegible]ন।

প্রিঃ। "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন ন জহাতি মলিমনং।" স্বভাব না যায় ম'লে।

ভুঃ। তাঁর সে চাক্‌রির কি হল বল্‌লে?

প্রিঃ। হয় সেটা সর্ব্বৈব ভুয়া, নয়ত সরলের সেই জাম্বুবানের কোঁৎকায় উমেদার মশায়ের ল্যাজ গুটিয়ে গেল। Kohat Treasuryর আর কোন উচ্চ বাচ্য শোনা যায় নি।

ভুঃ। উপস্থিত উনি কচ্চেন কি?

সঃ। মহান্ আত্মত্যাগ স্বীকার করে পাঁয়তাল্লিশ মুদ্রার মাছিমারা কেরাণী গিরি ধরে জীবন ধন্য কচ্চেন।

ভুঃ। তাইত, ওটা এমন আহাম্মক্ আগে জানতুম্ না। আমাকে একটা বিষয়ে বড়ই পীড়াপীড়ি কর্‌চে, উপরোধটা রাখবো কি না ভাব্‌চি। যা শুন্‌লুম তাতে ত আর প্রবৃত্তি হয় না।

প্রিঃ ও সঃ। কি, কি ভাই, কিসের উপরোধ?

ভুঃ। জাত ত আমি একবার বরোদায় গেছ্‌লুম। মহারাজা Gaekwar আমাকে বড় স্নেহ করেন। তাঁর family শুদ্ধ সবাই আমাকে আপনার লোকের মত দেখেন। কার্ত্তিক কোত্থেকে সে কথা জান্‌তে পেরেচে। বরোদার বড় রাজকুমার সম্প্রতি Darjeelingএ বেড়াতে এসেচেন ; কার্ত্তিক আমায় বিশেষ করে ধরেছে, Princeর কাছে তাকে Introduce করে দিতে হবে।

সঃ। সত্যি না কি? Prime Minister এর পদ টদ খালি নেই ত?

ভুঃ। হাঃ হাঃ, কি জানি?

সঃ। ওরে ভাই প্রিয়, বেড়ে সুযোগ হয়েচে ; আয় ওকে আর একবার বাঁদর নাচানো যাক্।

প্রিঃ ও ভুঃ। কি প্রকার? (নেপথ্যে—ওহে সরল আছ?)

সঃ। Hash! কার্ত্তিক আস্‌চে।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কাঃ। এই যে সরল, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক্। বাঃ, প্রিয় ও আছ, ভুজঙ্গ ও যে এখানে! আমি বলি তোমরা জলাপাহাড় বেড়াতে গেছ। His Excellencyর Aid-de-camp এয়েছিল একটু আগে, দেখলে না?

প্রিঃ। তোমাকে নেমন্তন্নো কত্তে না কি?

সঃ। His Excellency ওঁর সঙ্গে শিগ্‌গির ত্থাখা করতে আস্‌চেন ভাই জানাতে বুঝি—

ভুঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ কার্ত্তিক বাবু?

কাঃ। ওই ত, সব তাতেই তোমাদের তামাসা ; ব্যাপারখানা যদি শুন্‌তে—

প্রিঃ। সখি, তবে প্রকাশ করে বল।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

সঃ। দোহাই তোমার ; Tiffin এর ঘণ্টা দিয়েচে ঐ। আমরা আদার ব্যাপারী, ও সব জাহাজের খবর ধীরে সুস্থে আর এক সময় গেলা যাবে। এখন চা টা জুরিয়ে যাবে, চল। (উঠিয়া) তোমার ও Excellencyর খবর শোনার চেয়ে মুচ্‌মুচে toost খান ছুই আমাদের বেশী ভাল লাগ্‌তে পারে।

ভুঃ। ঠিক বলেচ, উপস্থিত adjorun.

প্রিঃ। (উঠিয়া) নিতান্তই বেদব্যাসের বিশ্রাম। আহা!

কাঃ। (হতাশ ভাবে) শুন্‌লে না হে— (সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

The Mall.

(প্রিয় চলিয়া যাইতেছে—ভুজঙ্গের প্রবেশ)

ভুঃ। ওহে প্রিয়, প্রিয়, প্রিয় একটু দাঁড়িয়ে।

প্রিঃ। (ফিরিয়া আসিয়া) এই যে ভুজঙ্গ! আমি তোমারই সন্ধানে যাচছিলুম। ওদিক্ কার খবর কি? কত্দূর?

ভুঃ। All right. Lunch partyর বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

প্রিঃ। বাঃ, কিছু টের পায় নি?

ভুঃ। কিচ্ছু না। ভায়া আমার ভারি খুসি। যাকে বলে আহ্লাদে আটখানা। আমার সঙ্গে কোলাকুলির ধূম দেখে কে? বলে "ভাই আমার মাথা কিনে রাখলে। আর, যা খরচ লাগে কুচ্ পারোয়াই নেই।" বোধ করি শ খানেক টাকায় ঘা।

প্রিঃ। বল কি হে! বাপ্! এতদিন একসঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া যাচ্চে, কখন ত দেখলুম না মুখসাপট্ট ছাড়া কঞ্জুষটা একটি টাকার বেশী সতের আনা এক দমকে খরচ করেচে। এবার একেবারে আলি মেজাজ! তোমার বাহাদুরি আছে ভাই।

ভুঃ। সব কথা জানলে হাসি রাখা দায় হয়ে ওঠে। বাবু ফিট্‌ফাট্ হয়ে Princeর সঙ্গে meet করবার জন্যে Rankenর বাড়ী নিজের এক সুট পোষাক ফর্‌মাস দিয়েচেন। একেবারে সব নূতন বন্দোবস্ত!

প্রিঃ। ক্ষেপে গিয়েচে বল। Partyটা কোথায় হচ্চে?

ভুঃ। কোথায় আবার? একেবারে Woodlands হোটেলে A I Style। আমি ফুলটুল দিয়ে table decorate কর্‌বার order দিয়েচি। আর very best Champagne.

প্রিঃ। সে কি? ও বেল্লিক Champagne খাবে না কি! সে ত মদ ছোঁয় না শুনেচি।

ভুঃ। খবর জানি লুকিয়ে চুরিয়ে Beer পার করে। কিন্তু এদিন সব ছোঁবে এবং খাবে। আমি Guarantee হয়েচি তার নেশা না হয়, কেউ ধর্‌তে না পারে সেদিকে আমি দৃষ্টি রাখবো; তাকে বুঝিয়ে দিইচি Partyতে health drink না কল্লে বড় লোকের অপমান করা হবে।

প্রিঃ। Capital। দেখ্‌বো ভাই মাতাল করে ছেড়ে দিতে।

ভুঃ। না না, তা করা হবে না। বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল না। আমাদের শুধু একটু ওকে জব্দ করা মত্‌লব বই ত নয়। বাড়ীতে আবারও মুস্কিলে পড়ে, এখন কিছু কর্‌বার দরকার কি ?

(পাশে চাহিয়া) অই যে সরল যাচ্চে। সরল, সরল, এই দিকে—

(সরলের প্রবেশ)

প্রিঃ। ভাই তোর পায়ের ধুলা দে। কি মতলবই খাটিয়েচিস্! তারিফ দিতে হয়।

সঃ। কিন্তু ভাই আমরা বুঝি মজাটা উপভোগ করবার সুখ থেকে বঞ্চিত হলুম।

প্রিঃ। কেন, কেন ?

সঃ। আমি গেছলুম Woodlandsএ, ঐ Lunchএ আমাদের দুজনের table book কর্‌তে ; manager বুড়ো রাজি হলো না। একটু হেসে বল্‌লে Woodlandsএ "Natives are not allowed" আমি যখন বল্‌লুম ঐ lunch part ত Native নিয়েই ; সে এক চোখ টিপে জবাব দিলে, ওটা Princeর জন্যে special case.

ভুঃ। ওহে সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্দি থাক, সে ভার আমার ওপর। আমি private roomএ party বন্দোবস্ত করেচি। manager ভেতরকার খবর কতক কতক জানে ; সে খুব রসিক লোক ; ব্যাপার শুনে এই partyটা successful কর্‌বার জন্যে আহ্লাদের সঙ্গে উদ্যোগী হয়েচে, বলে very funny. তবে তোমাকে যে হাঁকিয়ে দিয়েচে, তার কারণ অন্য ; কার্ত্তিকতই তাদের বিশেষ করে বারণ করেচে, সে ঘরে যেন কারও table book করা না হয় !

প্রিঃ। এ নিষেধের কারণ ?

সঃ। বোধ হয় Princeর সঙ্গে খেয়ে আমরাও পাছে কার্ত্তিকের সমান পদবীগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তাই হিংসা।

ভুঃ। আমার মনে হয় তার ঢলাঢলি কাণ্ড তোমাদের চোখ থেকে এড়ানই' উদ্দেশ্য।

প্রিঃ। ভ্যালা মোর ভাই রে। কার্ত্তিকের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। যা হোক, তুমি কি করে managerকে বাগালে ?

ভুঃ। আমি তাকে বেশ করে হাত করে নিয়েচি ; শিখিয়ে দিইচি, কার্ত্তিকের

সব কথায় সায় দিয়ে যাবে, কিন্তু বন্দোবস্তের ভার আমার ওপর। Advance payment আমার হাত দিয়েই হয়েচে কি না।

সঃ। টাকা কড়ি অগ্রিম আদায় করে বুদ্ধির কাজ করেচ, নইলে চাইকি eleventh hourএ back out কর্ত্তে পার্‌ত। যে কাপ্তেন!

ভুঃ। ওকে আমি বিলক্ষণ চিনিচি। আমি ভাই এখন চল্‌লুম, এখনও গোছ গাছের কিছু কিছু বাকি আছে।

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) সরল, Prince ঠিক ত?

সঃ। তা আর বল্‌তে! (ভুজঙ্গের প্রস্থান)

প্রিঃ। দেখ সরল, আমি বলি কি, আমাদেরও Partyতে যোগ না দেওয়াই ভাল।

সঃ। আমারও তাই মত। একে কার্ত্তিকের ইচ্ছে নেই, ওজ্‌বুক্‌টা সহসা সেখানে আমাদের দেখ্‌তে পেলে হয় ত এমন কিছু ঘট্‌তে পারে, যাতে আসল কাজেই মাটি হয়ে যাবে। আমরা বরং পরে রঙ্গ জমাব।

প্রিঃ। ঐ যে কার্ত্তিক যাচ্চে না? ঐ ওধারে?

সঃ। রোস, একটু টোপ্‌ ফেলে দেখা যাক, কিন্তু সন্দেহ করেচে কি না। ওহে ও কার্ত্তিক বাবু, ও কার্ত্তিক কার্ত্তিক বাবু হে—

প্রিঃ। ওকে আর কেন? কি কথা থেকে কি বেরিয়ে পড়্‌বে, শেষে সব ফেঁসে যাবে।

সঃ। না না চুপ, আমি ঠিক manage করে নেব।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

প্রিঃ। বলি যাচ্চ কনে?

স। গরীব বন্ধুদের দিকে কি একবার ফিরেও চাইতে নেই।

কাঃ। এই যে দুইজনেই এখানে, ভুজঙ্গ কোথায় বল্‌তে পার? আমি ভাই এখন ভারি ব্যস্ত। His Highness Prince Gaekwar দার্‌জিলিঙ্গে হাওয়া খেতে এয়েচেন; আমাকে পত্তর লিখেচেন একবার দেখা কর্‌তে; আমার সময় কই? আমি তাকে একটা Lunch party দেবার বন্দোবস্তে আছি। বুঝ্‌তেই ত পার্‌চ, ভারি ব্যস্ত রইচি।

প্রিঃ। কবে হে কবে? কোথায়?

সঃ। বাঃ বাঃ, বল কি! আমরা old chums,. আমরাও নিশ্চয় সে partyর অন্তর্গত?

কাঃ। পরশু বেস্পতিবার বৈকালে Party। Partyটা হচ্চে Woodlandsএ। Woodlandsএ নেটিভদের খেতে দেয় না, তোমাদের ত ভাই এগুবার জো নেই; নইলে কি তোমাদের ছাড়ি; His Highness আছেন বলে, অনেক কাণ্ড করে, অনেক বড় বড় সাহেব সুবাদের সুপারিশ নিয়ে Special case করা গ্যাছে।

প্রিঃ। সে কি তোমার পুরাণো বন্ধু বলে আমরা কি এঁটোটা কাঁটাটাও পাব না?

সঃ। হা হতোঽস্মি!

কাঃ। কি কর্‌বে ভাই, এতে ত আর আমার হাত নেই। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম, হোটেলওয়ালারা কিছুতেই রাজি হল না।

সঃ। বলি, তোমার সঙ্গে গাইকোয়াড় টাইকোয়াড়ের এত ঘনিষ্ঠতা কোথা থেকে হে?

কাঃ। আরে দাদা সে অনেক কথা, বল্‌ব একদিন। বল কি, second Prince in India! ও আমাদের অনেক দিনের আলাপ। ওঁদের চেন না ত, আমার ঠেঁয়ে কেবল কাজ আদায় কর্‌বার ফিকির; সাধে কি আলাপ করে?

সঃ। বটেই ত, বটেই ত।

প্রিঃ। ভুজঙ্গের through দিয়ে নতুন আলাপ পরিচয়ের না কথা হচ্‌ছিল?

কাঃ। আরে শোন কেন ও সব কথা? কে বল্‌লে তোমায়? অত বড় লোকদের সঙ্গে ভুজঙ্গের আলাপ পরিচয় আছে না কি? His Excellencyর Foreign secretary একদিন Leveeতে আমায় introduce করে দ্যান। সে কি আজকের কথা! তখন আমি তোষাখানার দেওয়ানের—

সঃ। (অনুচ্চস্বরে) পা ঝাড়্‌তুম।

প্রিঃ। কোথায়? বরোদায় না কি?

কাঃ। এখন আমি আসি ভাই, বুঝ্‌তেই ত পার্‌চ ভারি ব্যস্ত আছি।

সঃ। কর্‌লে কর্‌লে ত partyটা বেস্পতিবারের বার্ বেলায় কর্‌তে গেলে কেন?

কাঃ। Damn superstition. (প্রস্থান)

প্রিঃ। লোকটার যোড়া মেলা দুষ্কর।

সঃ। কি বেইমান্! বাবা। (উভয়ের প্রস্থান)

———

তৃতীয় দৃশ্য।

Sanitarium Library.

(জনকতক Boarder গান গাহিতেছেন)

"আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাজি ভব-সিন্ধু খেয়ার॥
মোদেব দিও নাক কেউ গালি, মোদের করোনাক কেউ মানা।
আমরা খাব নাকো কারো চুরি করে দুগ্ধ ননি ছানা॥
শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার।
শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু, আমরা পাঁচটি এয়ার॥ •

(কার্ত্তিকের প্রবেশ, তাহাকে দেখিয়া গান চুপ)

কাঃ। চলুক না, মশাইরা, চলুক না, বেশ গাইতেছিলেন ত আপনারা।

কেহ কেহ—না মশাই আমরা গাইতে জানি নি, ও গানটা একটু মুখস্থ কর্‌ছিলাম।

কাঃ। ওটা D, L. Royর গান না? কেউ কেউ বলে লোকটা বেশ গান বাঁধ্‌তে পার্‌ত। "আমার কর্ম্মভূমি" তারই গান না?

বোর্ডারগণ। (ঈষৎ হাসিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন)

কাঃ। মশাই আপনারা His Highness Prince Gaekwarকে দেখেচেন

বোর্ডারগণ—আজ্ঞে না।

কাঃ। ওঃ Second Prince in India! কুমার সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এয়েচেন।

১ম বোঃ। বরোদার যুবরাজ?

কাঃ। হাঁ হাঁ; আপনারা শোনেননি, কাল তাঁকে আমি Party দিয়েছিলুম। অতি অমায়িক লোক।

২য় বোঃ। (জনান্তিক) এ লোকটা কে হে?

৩য় বোঃ। (জনান্তিক) কোন বড় লোক টক্লোক হবে, দেখা যাচ্চে।

৪র্থবোঃ। (জনান্তিক) ঠিক এই রকম একজনকে কিন্তু আমি রেলির গুদো-মের Despatch clerk দেখেচি।

৫ম বোঃ। কোথায় Party দিয়েছিলেন মশাই?

কাঃ। Woodlandsএ। এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল Woodlands.

ওখানে বাঙ্গালী বড় allow করে না ; তবে আমার সঙ্গে নাকি বহুত বড় সাহেব সুবার পোট্‌সোট্ আছে, তাই হোটেলওয়ালারা Special case করেছিলো। Reserved Table বন্দোবস্তের কেতাই আলাদা। বলেন কি, Second Prince in India !

১ম বোঃ। বটেই ত।

কাঃ। His Higness the Gaekwarর আড়াই ক্রোর টাকা income.

২য় বোঃ। ইস্! এত ?

ব্রঃ। উনিশ তোপ বরাদ্দ। ছত্রিশ হাজার সৈন্য, Imperial Service Corps—

(প্রিয়র প্রবেশ)

প্রিঃ। বাহবা কার্ত্তিক, congratulate you. তোমার Lunch Party নাকি খুব Success হয়েচে শুনলুম।

কাঃ। (স্মিতমুখে) এই দাদা তোমাদের আশীর্ব্বাদে। Prince বড় সজ্জন লোক ভাই ; যেমন চেহারা, সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, তেমন মেজাজ, তেমনি ব্যাভার একেবারে charming ! আমার যে খাতিরটা করলেন, কি আর বলব ; অমন লোক দেখিনি।

প্রিঃ। ভুজঙ্গ ও ছিল ?

কাঃ। হ্যাঁ, ভুজঙ্গ আমাকে বিস্তর সাধাসাধি করেছিলো, ভুজঙ্গকে Prince কাছে আমি introduce করে দিলুম। Second Prince of India.

প্রিঃ। এই পোষাক নতুন করালে নাকি ?

কাঃ। হ্যাঁ ভাই, অমন একটা Respectable Party তার উপযুক্ত সাজসোজ না হলে Etiquette বিরুদ্ধ হন্ ; এই Dressটা নতুন করিয়েছি Ranken বাড়ী থেকে, latest style newest fashion

প্রিঃ। বেড়ে মানিয়েচে তোমায় !

বোর্ডারগণ—চল ভাই আমরা যাই। (প্রস্থানোদ্যোগে)

কাঃ। না, না যাবেন কেন ? বসুন না মশাইরা, একটু আলাপ হচছিলো। বরোদার রাজকুমারের কথা যিনি আমার Partyতে কাল এসেছিলেন, ah Second Prince in India.

(একখানি গ্রন্থ হস্তে সরলের প্রবেশ)

সঃ। Hallo কার্ত্তিক I heartily Congratulate you। চতুর্দ্দিকে

আজ তোমার Partyর নাম বেরিয়ে গ্যাছে দেখ্‌চি। যেখানে সেখানে ঐ কথারই আলোচনা হচ্ছে শুন্‌লুম।

কাঃ। বল কি, বল কি, তা হবে না! Second Prince in India! যে সে ব্যক্তি? কি সুন্দর লোক ভাই! যেমন রূপ, তেমনি গুণ। সদাই হাসি হাসি ভাব! আমাকে যে খাতিরটা কল্লেন! যদি দেখ্‌তে একবার!

সঃ। আমাদের misfortune।

প্রিঃ। তা হলে তোমার টাকা খরচা সার্থক হয়েচে বল।

কাঃ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। আর একদিন His Highnessকে Dinnerএ নেমোতন্নো কর্‌বো মনে করেচি; সে দিন তোমরাও থাক্‌বে।

সঃ। ধন্যবাদ। তা' কত খরচ হল তোমার?

কাঃ। বেশী নয়, এই প্রায় এক শোটা টাকা!

সঃ। এক—শো—ও—টা—কা! আমাদের এক শোটা বাগান ভোজের চাঁদা বল!

কাঃ। এই দ্যাখ না বিল। ভুজঙ্গের হাতে এক শো টাকার নোট একখানা আগ্রিম দিয়েছিলুম; Woodlandsর বিল আর Ranken কোম্পানীর রশিদ সে পাঠিয়ে দিয়েছে; ৯ টাকা চার আনা মাত্র ফেরৎ পেয়েচি।

সঃ। খুব একটা কীর্ত্তি রাখ্‌লে, দাদা।

কাঃ। তোমার হাতে অত বড় ও চকচকে বইখানা কি হে?

সঃ। এ একখানা নতুন বই বেরিয়েচে;—"Chiefs and Princes of India (Illustrated)

কাঃ। Illustrated? আমাদের Princeর ছবি আছে ওতে?

সঃ। থাক্‌তে পারে।

কাঃ। নিশ্চয়ই আছে; বল কি? Second Prince in India! আহা আমাকে কত খাতির কল্লেন!

প্রিয়। নাওনা ভাই বইখানা, চেহারাটা একবার বার কর; সকলে দেখুক্‌, কি সুন্দর মূর্ত্তি একেবারে যেন Cupid কি Adonis কি চমৎকার প্রকৃতি!

প্রিঃ। (বহি লইয়া) বেশ ত দেখা যাক্। (পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) Gaekwar গাইকোয়ার, বরোদা বরোদা এই যে—না, এ স্বয়ং মহারাজা গাইকোয়াড়। এঁর বড় ছেলে বুঝি, না সরল?

সঃ। খান তিনেক পাত পরেই বুঝি তাঁর চেহারা আছে।

প্রিঃ। (পাতা উল্টাইয়া) এই—

বোর্ডারগণ কই দেখি মশাই, দেখি আমরা একবার। (সকলের ভিড় করিয়া)।

প্রিঃ। (ভাল করিয়া দেখিয়া) কই, এমন কি খুব্‌সুরৎ চেহারা ?

কাঃ। বটে ? তোমার পছন্দই নাই তা হলে। কই, দেখি আমি একবার। (দেখিয়া) একি ? দূ-ও-ৎ ! ভুল করেচে। ইনি ত তিনি নন।

প্রিঃ। তিনি নন কি রকম ? এই তলায় কি লেখা পড় দিকিন্‌।

কাঃ। (পাঠ) "His Highness Prince Yuvraj or eldest Kumar of Baroda" একি ! ভুল ছেপেছে দেখ্‌চি।

সঃ। ভুল ছেপেছে মানে ? চেহারাও ভুল, নাম টাম শুদ্ধ সবই ভুল ?

কাঃ। আমি যাঁকে Party দিলুম, তিনি ত ইনি নন।

সঃ। তিনি তবে কিনি ?

কাঃ। ইনি কহিল, তিনি বেশ দোহারা ; ইনি লম্বা, তিনি কিছু খাটো, এঁর গোফ উঠ্‌চে তিনি গোফ-কামনো ; তাঁর এ ধাতের চেহারাই নয় ; মুখের এ রকম cutই নয়। আচ্ছা, কদ্দিনের পূর্ব্বেকার এ চবি দেখ—(দেখিয়া) কই বেশী দিনও ত নয়। নিশ্চয় ভুল।

প্রিঃ। ভুল কার ? ভুল এ বইয়ে কি হতে পারে ? বইখানা ছেপেচে কারা, বের করেচে কারা, Dedicate করা হয়েচে কাকে, দেখ্‌চো ত ?

কাঃ। (দেখিয়া, বিমর্ষভাবে) তাইত ! তবে এ কি রকম হল ! আচ্ছা এই দেখ আমি তোমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করচি। কাল Party ভেঙ্গে যাবার পর বিদায় নেবার সময় His Highness আমাকে তাঁর Photo with autograph present করে গেচেন এই দেখ—

আমার পকেটেই রয়েচে (পকেট হইতে বহিস্করণ) দেখ দেখি সুন্দর চেহারা কি না।

প্রিঃ ও সঃ। দেখি দেখি—(ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কে ? বই এর তিনি ইনি ত ননই।

প্রিঃ। এই তোমার Prince ?

কাঃ। তা না তকি ? আর কেউ ঠাওরাও নাকি ? বোর্ডারগণ দেখি দেখি মশাই, আমরা একবার দেখি (সকলের অবলোকন।)

১ম কে—চেহারাটা বাঙ্গালা বাঙ্গালী ঠেক্‌চে, না ?

২য় কে—হুহুহু।

৩য় কে—ঠিক যেন আমাদের Mr রতীন্ বোস্।

৪র্থ কে—সন্দেহ নাস্তি।

৫ম কে—তাও কি হতে পারে? তার যে কার্ত্তিক ঠাকুরের মত গোফ আছে

৩য়। ইদানী কাসিয়েচে।

কাঃ। কে? কে? তোমরা কি ক্ষেপেচ? Prince নিজে হাতে করে আমাকে এ photo দিয়েচেন।

প্রিঃ। সাক্ষাৎ এই মূর্ত্তি?

কাঃ। কোন তক্কক নাই।

কেহ কেহ—এ ছবিত রতীন সাহেবের Photoই বটে।

অপর সকলে—নির্ঘাত।

কাঃ। আরে আমি কি পাগ্‌লা গারদে এসেচি নাকি? এতে Princeর autograph সই পর্য্যন্ত রয়েচে যে! এই ছাখো, চোখ আছে?

সঃ। হুঁ্যা বটেই ত, নামটা কি পড়ত।

কাঃ। এ যে নাগ্‌রি কি ফার্‌সি লেখা; মারহাট্টি অক্ষরও হইতে পারে; পড়বে্ কে

প্রিঃ। দেখি দেখি! তাই ত! ঠিক বটে ত, বাঙ্‌লায় "শ্রী-র-তী-ন্দ্র-নাথ ব-সু" ইত রয়েচে! Oriental Artর ছাঁদে লেখা, তাই নাগ্‌রি ফরাসির মত মনে হচ্চে।

কাঃ। বল কি! বল কি! তোমরা, তো-তো-ম-রা আমার সঙগে সে প-পরিহাস ক-চ্ছচ।

প্রিঃ। তুমি ভাই নিজেই ভাল করে ছাখনা; বুঝ্‌তে পারবে। (কার্ত্তিককে ঘার ধরিয়া প্রদর্শন।) এই ছাখ (আঙুল দিয়া) শ্রী-র-তী-ন্দ্র-না-থ-ব-সু অক্ষরের যা চিত্তির বিচিত্তির টান্ তাতে নামটা "মলহর রাও গাইকোয়াড়" কেউ পড়্‌লেও বড় তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সঃ। Oriental Artর ছাঁদই ঐ।

কাঃ। এঁ্যাঃ—(কার্ত্তিক কপালে হাত দিয়া অধোমুখ)।

সঃ। আহা কার্ত্তিকের হল কি? Banquoর ghost দেখে Macbeth এর যে এমন হয় নি!

প্রিঃ। কার্ত্তিক কার্ত্তিক কার্ত্তিক আরে হল কি? ঘাড় তোল, বসু আমাশ্বসিহি।

বোর্ডারগণ এনার সঙ্গে কেউ রহস্য করে থাক্‌বে। বাঃ—

কাঃ। (উঠিয়া) আমি যাই।

সঃ। (ধরিয়া) কোথায়? কোথায়?

কাঃ। (সরোষে) ভুজঙ্গের নামে আমি Crininal Breach of Trustর নালিশ কর্‌বো।

প্রিঃ। সে বেচারা কি কর্‌লে?

কাঃ। আমার টাকা ফাঁকি দিয়েচে—সাতানব্বই টাকা বারো আনা।

সঃ। Woodlandsএ তুমিও খেয়েচ, তুমিও নিমন্ত্রণ করেচ, Rankenর পোষাক তোমার গায়ে রয়েচে; দু জায়গারই বিল রশীদ সে তোমায় দিয়ে দিয়েচে। ফাঁকি কই?

কাঃ। False Personificaionর charge আন্‌বো। N. C. Bose এই আছেন, চল্লুম তাঁর কাছে, আমার সঙ্গে চালাকি? বুজরুকি?

সঃ। তা ভুজঙ্গের কি দোষ ভাই? তুমিই Princeর কাছে তাকে introduce করে দিয়েছিলে আমাদের বল্‌লে যে! ভুজঙ্গ তার জন্যে তোমাকে অনেক সাধাসাধি করেছিল না? Prince তোমাকে পরশু লিখেছিলেন বলেছিলে, মনে নাই?

কাঃ। অনেক কথা। দেখাচ্চি আমি মজা। আমার সঙ্গে জুচ্চুরী! এত গুলো টাকা সব জলে! শেষ জাল জালিয়াতি! আচ্ছা! Document আছে, Document আছে আমার কাছে! জাল লোক, জাল সই এই আমার হাতে; টেরটা পাওয়াচ্চি।

সঃ। ওর জাল কোন্‌খানটা ভাই?

কাঃ। Prince জাল।

সঃ। Princeত তুমিই টেনে হাজির কর্‌লে; তোমার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ, তোমার ঠেঁয়ে কাজ আদায়ের ফিকিরে তিনি এখানে এয়েচেন, তুমিই ত আমাদের বুঝিয়ে দিলে। ভুজঙ্গকে না তুমিই তাঁর কাছে introduce করে দিয়েছিলে? তার কি অত বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ আছে না থাক্‌তে পারে? এ সকল কথা তুমিইত স্পষ্ট করে বার বার বলেছ।

বোর্ডারগণ। আমাদের ও স্বমুখে বল্‌ছিলেন।

কাঃ। এই ছবিটা জাল।

সঃ। ও ত স্পষ্ট রতীন বোসের চেহারা।

কাঃ। autograph সইটা জাল।

প্রঃ। ওত রতীনেরই সহস্তে লেখা চিত্তির বিচিত্তির করা তার নিজ নাম।

বোর্ডারগণ। কোনটাইত আইনের আমাল আসে না।

কাঃ। (উত্তেজিত ভাবে) কি বল তোমরা? তবে কি আমি এ বেয়াদবির কিছু বিহিত না করে চুপটি করে বসে থাক্‌বো? আমার নিজের গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে কচ্চে যে!

প্রিঃ। কে তাতে বারণ কচ্চে?

সঃ। গোড়াতেই ত বলেছিলুম ভায়া, বেস্পতিবারের বারবেলা, তখন হেসেই উড়িয়ে দিলে, Superstition.

প্রিঃ। Second Prince of India, বস কি!

সঃ। দেখ কাত্তিক ভুজঙ্গকে জব্দ করবার এক সন্ধান বাতুলে দিতে পারি।

কাঃ। (আগ্রহে) কি কি, বল ত ভাই। দেখা যাক, আমি এখনি কর্‌বো। কুচ্‌ পারোয়া নেই যেত্তা রূপেয়া লাগে।

প্রিঃ। আরে বাস্‌ রে, নবাব এয়াজিদ্‌ আলি সা!

সঃ। তুমি ভুজঙ্গের নামে Seductionর charge আনো।

কাঃ। সে কি রকমে হবে?

সঃ। সে তোমাকে Seduce করেচে Rankenর বাড়ী থেকে পোষাক তৈরী করাতে, সে তোমাকে Seduce করেচে Woodlands হোটেলে খানা দিতে।

কাঃ। দেখি, যাই উকিল ব্যারিষ্টারের পরামর্শ নিই। B. C. Mitter আমার পিসে মশায়ের দাদার শ্যালীপতি ভাই হন; যাচ্চি তাঁর কাছে, দেখাচ্চি মজা। আমি অল্পে ছাড়বো? আমি Advocate Generalর opinion নেবো High Court করবো। (উত্থান)

প্রিঃ। দেখ কাত্তিক বন্ধুর উপদেশ শোন। ঢের হয়েচে আর ঢলিও না। যারা শুনে ফেলেছে, শুনেচে, চারা নাই। এ সব ব্যাপার আর পাঁচ কান না হয়। শুন্‌লে লোকে তোমার গালে চুণকালি দেওয়া ছাড়া আর কোন সাহায্যই কর্‌বে না।

কাঃ। (বিষণ্ণ ভাবে) তবে কি আমার কোন উপায়ই নেই?

সঃ। একখান উপায়, তোমার নিজের হাম্‌বড়াই স্বভাবটি বদ্‌লালো।

প্রিঃ। ঐ যে ভুজঙ্গ আস্‌চে!

কাঃ। আমি চল্লুম। (সত্বর প্রস্থান)

সঃ। আরে আরে কর কি? দাঁড়াও দাঁড়াও।

(ভুজঙ্গের প্রবেশ)

ভুঃ। সেলাম আলেকম্। যায় কোথায় ওকে ডাক ডাক, "so kind of you Highness" বলে সেলাম করবার কেতটা তোমাদের একবার দেখিয়ে যাক্।

প্রিঃ ও সঃ। Three cheers for Sriman Bhujanga এস ভাই সকলে, একবার সকলে মিলে গানটা গাওয়া যাক্—

আমরা পাঁচটি ইয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি ইয়ার।
আমরা পাচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু-খেয়ার ॥
শুধু লুটিব একটু মজা শুধু করিব একটু পেয়ার।
শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু, আমরা পাঁচটি ইয়ার ॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

পটক্ষেপন।

রেণুর বর।

(লেখক—জনৈক মহিলা।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩৮)

রমেশচন্দ্র এলাহাবাদে পৌছিয়া, ডেপুটি যতীশচন্দ্রের বাসা খুজিয়া লইতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। বিনা সংবাদে হঠাৎ রমেশকে কেহ প্রথম চিনিতে পারিল না। কারণ মনোরমা ত রমেশচন্দ্রকে দেখেন নাই আর যতীশচন্দ্র যখন বাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তখন রমেশ বালক ছিলেন। রমেশ যদিও যতীশ চন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই তথাপি অনুমানে চিনিয়া দাদা বলিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি রমেশ আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?" তখন যতীশচন্দ্র বহুকাল পরে ভ্রাতাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মনোরমা উভয়কে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পরে রমেশ ও ভবানীর সকল

ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন "কাজটা ভাল হয় নাই কারণ তুমি বিবাহিত, বালিকা স্ত্রী বর্ত্তমান, এক্ষেত্রে এরূপ কাজ করা খুব অন্যায় হইয়াছে, যাই হোক এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ?" রমেশ বলিলেন "আমি ভবানীকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি, যতীশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে এ বিবাহে ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান কেহ মত দিবেন না আর হিন্দুসমাজে এরূপ বিবাহ হইতে পারে কিন্তু ভবানী বিধবা। বিধবাবিবাহ দিবেন বলিয়া আমার ত বোধ হয় না। তাই বলিতেছিলাম পশ্চাৎ না ভাবিয়া এরূপ গুরুতর কাজ করা ভাল হয় নাই। সকল কথা শুনিয়া রমেশ ক্ষুণ্ন হইলেন এবং ভবানীকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া ভবানী বলিল, "যদি সমাজে বিবাহ না হয়, তবে ক্ষতি কি, আমরা ত জানি আমাদের বাধন ছিন্ন হইবার নয়, সুধু সমাজে মিশিবার জন্য, শুধু সমাজে দেখাইয়া বিবাহ করা, তাহা যদি না হয়, না হোক। আমরা সমাজ চাহি না, কোথাও দূরদেশে চলিয়া যাই। এমন স্থানে চলো, যেখানে আমাদের পরিচয় দিবার দরকার হইবে না, সমাজের সহিত মিশিবার দরকার হইবে না।" রমেশ ভবানীর কথা শুনিয়া অনেক আশ্বস্ত হইলেন। ভবানী আজীবন হিন্দুধর্ম্মে, হিন্দু আচার ব্যবহারে পালিতা হিন্দু কন্যা, তাহার এই ম্লেচ্ছার সংসারে মন টিকিতে ছিল না, তাহার সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে ঘৃণা বোধ হইতেছিল। এজন্য সে এবাটী ত্যাগ করিবার জন্য রমেশকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। একদিন রমেশচন্দ্র যতীশচন্দ্রকে বলিলেন, "দাদা আমায় একটা চাকরী জোগাড় করিয়া দিন।" এ কথা শুনিয়া যতীশচন্দ্র এবং মনোরমা উভয়েই আপত্তি করিলেন, তাহারা বলিলেন, "একাকী কোথায় যাইবে, চাকরী করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তোমরা আমার বাটীতেই থাক।" যতীশ-চন্দ্র মনে করিতেছিলেন, আমি ত সংসার ত্যাগ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি, আবার রমেশও তাই হবে, কিছুদিন থাক্ পরে উহাকে বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিব। রমেশচন্দ্র কিন্তু ভ্রাতার কথায় স্থির হইতে পারিলেন না, ভবানীর অসন্তুষ্ট ভাব দেখিয়া তিনি প্রত্যহ মনোরমার কাছে বলিতেন, "দাদাকে বলিবেন আমার এ জায়গা ভাল লাগিতেছে না, আর শুধু নিষ্কাম হইয়া থাকিলে মন আরও খারাপ হইয়া যায়। দাদাকে বলিবেন একটা চাকরী যেন ঠিক করিয়া দেন।" যতীশচন্দ্র যখন দেখিলেন রমেশের একান্ত ইচ্ছা এ স্থান হইতে সরিয়া যায়, তখন অগত্যা ৬০্ টাকা মাহিনার একটী রেজেষ্টারী কর্ম্মের সন্ধান পাইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া রমেশের জন্য স্থির করিলেন। চাকরি পাইয়া রমেশ হৃষ্টচিত্তে ভবানীকে লইয়া, কর্ম্মস্থান নাগপুরে রহনা হইলেন। সুবাসের মৃত্যুর পর তাহার সকল জিনিষই রমেশের

নিকট ছিল। পুত্র কোনরূপ কিছু মনে করেন এই ভাবিয়া জননী ও সকল বিষয় দেখিয়াও দেখিতেন না। রেণুকে তিনি সমস্তই নূতন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ গহনাগুলি রমেশের বড় উপকারে আসিল। ভবানীকে লইয়া আসিবার কালে, রমেশ সুবাসের গহনাগুলির মধ্যে কয়েকখানি রাখিয়া, আর সমস্তই বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে টাকা সংগ্রহ হইল, কেহ জানিল না, কাহারও কাছে চাহিতে হইল না। রমেশের যাইবার কালে যতীশচন্দ্র পথ খরচ বলিয়া কিছু টাকা দিতে আসিলে রমেশ তাহা লইলেন না, যদি দরকার হয় পরে জানাইবেন বলিয়া ভ্রাতাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য

৭ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২৩। | ৭ম সংখ্যা

সাময়িকী।

বাঙ্গালা দেশের জলবায়ু এমন যে, এদেশে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিও নিজের শক্তির ওজন বুঝিতে পারেন না। সেই জন্য শক্তির অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নহে। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার অসাধারণ কবি, অসামান্য লেখক। তাঁহার প্রতিভাও অলোকসামান্য। কিন্তু তিনিও পরিণত বয়সে আপনার শক্তির ওজন বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন। কাজেই তিনি ইদানীং আত্মশক্তির যথেষ্ট অপব্যবহার করিতেছেন। কলিকাতার চলিত ভাষায় তিনি সাহিত্য রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই নূতন রবীন্দ্রীয় ভাষার নমুনা দেখিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছে,—ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে না; উহা ভাঙ্গিতেই থাকিবে।

* *
*

সাহিত্যের হিতচিকীর্ষুগণের এইরূপ আশঙ্কা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁহারা সাহিত্যে ভাঙ্গন দেখিতে নিতান্তই 'নারাজ'! আমরা বলি, আশঙ্কার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথই হউন, আর যিনিই হউন, লোকমত ও যুগধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার শক্তি কাহারও নাই। বিগত শত বৎসরে বঙ্গ-ভাষার যে আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, যে ভাষা বাঙ্গালা দেশের সকল প্রদেশের লোকে পুরুষানুক্রমে বুঝিয়া আসিয়াছে এবং এখনও বিনা আয়াসে বুঝিতে পারিতেছে, ভাষার সে আদর্শ নষ্ট করিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের তেমন শক্তি নাই। তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা অক্ষমের "ভেংচানি" মাত্র।

* *
*

এই ভাষা সমগ্র বাঙ্গালার আদর্শ ভাষা: দেশের সমস্ত সংবাদপত্র এই ভাষাতে লিখিত-পঠিত হয়। মুদী-পশারী হইতে শিক্ষিত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনায়াসে এই

সকল সংবাদপত্রের লেখা বুঝিয়া থাকেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে ভাবের উচ্ছ্বাসে দেশের জনসাধারণের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই আদর্শ ভাষার সাহায্যেই হইয়াছিল। এ ভাষা দেশবাসীর নিতান্ত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত সাহিত্যের জন্ম, বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না।

* *
*

এ কথা আমাদের কথা নহে। বাঙ্গালার প্রায় সমগ্র জেলার লোক এ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতার কথ্য ভাষা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ ভাষা হইতে পারে না, তাহা দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। সুতরাং দেশের লোকমত যে এই আদর্শ ভাষারই পক্ষপাতী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে রঙ্গপুর জেলার সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

* *
*

"বহু সাধনা এবং অভিব্যক্তির ফলে বাঙ্গালার একটী সাধারণ লেখ্য ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। তাহা বিভাগবিশেষের নিজস্ব নহে, অথচ বাঙ্গালার যে কোনও বিভাগেই বোধগম্য এবং সকল বিভাগের লোকের দ্বারা সেবিত ও পুষ্ট। অল্প দিন হইল, এক মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র বঙ্গে প্রচলিত ভাষার মূলোচ্ছেদ করিয়া, তাহার স্থলে কলিকাতার উপভাষাকে প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। বিনাশ করা সহজ, কিন্তু গঠন করা দুরূহ। কলিকাতার উপভাষা বা উপশব্দের একটা লিখিত অভিধান নাই। এমন কি, রাজধানীর এক স্থানে প্রচলিত সমস্ত শব্দের অর্থ অন্য স্থানের অধিবাসী বুঝিতে নাও পারে। অন্য বিভাগের লোকের তাহা বুঝিতে না পারিবারই কথা। এমন অবস্থায় সুবোধ্য লেখ্য ভাষার পরিবর্ত্তে একটী দুর্ব্বোধ্য শক্তিশূন্য উপভাষার প্রচলন করিবার চেষ্টা শুধু স্থানীয় দাম্ভিকতাপ্রসূত নহে কি ?

"কথ্য ভাষা লইয়া কলিকাতাবাসী বঙ্গের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগকে ঠাট্টা উপহাস করিয়া থাকেন। তাহা যে মফঃস্বলবাসিগণ মর্ম্মতঃ অনুভব করেন না, তাহা অস্বীকার করা বৃথা। এরূপ বিদ্রূপজাত বিদ্বেষ-ভাব প্রকৃত সম্মেলনের অনেকটা পরিপন্থী। ফলে দাঁড়াইয়াছে, বঙ্গের সকল বিভাগের সাহিত্যিক চেষ্টা

একক্রেন্দ্রমুখী না হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠা হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাহাদের শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধ নাই। কথ্য ভাষাকেও লিখিত ভাষার ন্যায় জাতীয় ও সাধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালায় একই কথ্য ভাষা, একই লেখ্য ভাষা হওয়া উচিত। উভয়কেই জাতীয় এবং সাধারণ হইতে হইবে; অর্থাৎ তাহা কোনও বিভাগের উপভাষা নহে, অথচ সর্ব্ববিভাগের বোধ্য এবং আয়ত্ত। কোনও বিভাগের উপভাষাকে প্রাধান্য দিলে, শুধু যে তাহা দুর্বোধ্য হইবে তাহা নহে, তাহার দ্বারা অনৈক্য ও ঈর্ষার সৃষ্টি হইবে। আধুনিক শিক্ষিতসমাজ আলাপপ্রলাপে কলিকাতার উপভাষার অনুকরণ করেন। এই অনুকরণের সিদ্ধি-অসিদ্ধি অনুসারে বিভাগে বিভাগে পরস্পর মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইয়াছে। যদি লেখ্য ভাষাকে কলিকাতার উপভাষার অনুরূপ করিতে হয়, এ মনোমালিন্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। কোনও শুভই সাধিত হইবে না। বাঙ্গালা ভাষার সাধারণত্ব এবং একত্ব বিনষ্ট করা উচিত নয়।”

* * *

এই সঙ্গে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ-পথে জাগরূক রাখিতে হইবে যে, ভাষা ভাবের বাহন। ভাব যদি চটুল হয়, ভাষা তেমনই হইবে। ভাব লঘু হইলে ভাষার লঘুত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভাব গুরু হইলে ভাষাকেও গুর্ব্বী হইতে হইবে। কথ্য ভাষায় উদ্দীপনার বিকাশ হয় না; কোনও গভীর বিষয়ের আলোচনাও তাহাতে অসম্ভব। এই সে দিন রবীন্দ্রনাথ—কথ্য ভাষার প্রধান পাণ্ডা রবীন্দ্রনাথ সে কথার প্রমাণ নিজ হাতেই প্রদান করিয়াছেন। ‘সবুজ পত্রে’র ‘ছাত্রশাসনতন্ত্র’ নামক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ কোন্ ভাষায় লিখিয়াছিলেন? প্রচলিত সাহিত্যের ভাষায় নহে কি? তখন কলিকাতার ‘কথ্য’ ভাষা তিনি চালাইতে পারিলেন কৈ? ‘কথ্য’ ভাষায় এরূপ উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে না।

* * *

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত কলিকাতার ভাষাই যে ভবিষ্যতের সাহিত্যের আদর্শ ও অবলম্বনীয় ভাষা হইবে, ইহা কোনও সহজবুদ্ধিশালী ব্যক্তিও স্বীকার করিতে পারিবেন না। ভাষা সম্বন্ধে একথা কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবেন না

যে, এই পর্য্যন্তই ভাষার সীমা; তাহার বাহিরে নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুসরণকারীরা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আদর্শ করিবার জন্য যে লড়াই করিতেছেন, তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইবে। এরূপ ভাবে আত্মশক্তিক্ষয় বাতুল ভিন্ন আর কেহ করে না।

* *
*

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান রূপ ও প্রকৃতি যে কালে পরিবর্ত্তিত হইবে না, এমন কথা আমরা বলি না। প্রয়োজন বুঝিয়া ভাষার রূপ ও প্রকৃতি লোকের অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হইবে; এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা এক দিনে বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করে নাই। এই রূপ ও প্রকৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে অনেকবার সাজ-পোষাক বদল করিতে হইয়াছে। কিন্তু যতই ইহার পরিবর্ত্তন ও ওলট-পালট হউক, একটী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে এই ভাষা কখনও বিচ্যুত হয় নাই। উহা হইতেছে সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা-বর্জ্জন। বাঙ্গালা ভাষাকে অখণ্ড বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীদের বোধগম্য করিবার জন্য বাঙ্গালার সাহিত্য-রথগণ বরাবর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিম পর্য্যন্ত সকলেই এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই বাঙ্গালা ভাষার গতিও এই উদ্দেশ্য-সাধনের পথেই হইতেছে। এ গতি, এ স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

* *
*

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার কথিত ভাষা সাহিত্যে চালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে এ কথা না বুঝিয়াছেন, এমন ত মনে হয় না। তবে একটা কথা আছে, অনেক সময় শক্তিশালী লোক ভ্রম করিলেও তাহা স্বীকার করিতে চান না। রবীন্দ্রনাথেরও এই অবস্থা হইয়াছে। এখন 'prestige' বা নিজের মুখ-রক্ষার জন্য তিনি এই ভাষায় লিখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ভাষার গতি-প্রকৃতির তত্ত্বটুকু যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রম-সমর্থনের নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া করুণা প্রকাশ করিতেছেন; আর মনে মনে হাসিতেছেন তাঁহার চেলা-চামুণ্ডাদের হুড়াহুড়ি দেখিয়া। হায়! ইহারা স্তাবকতা ভিন্ন কিছু জানে না। ভাষার গতি ও প্রকৃতির ইতিহাস ইহারা বুঝে না; জগতে এক স্তাবকতা করিবার

সামর্থ্যই ইহারা অর্জ্জন করিয়াছে। তাই সাহিত্যিক-স্তাবকদের 'ছিচকাঁদুনী' ছাড়া আজকাল এ সম্বন্ধে দুইটী আলোচনার যোগ্য কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। অর্ব্বাচীনের দল কি এই সার কথাটাও জানে না যে, নিছক মোসাহেবীর জন্য কলম ধরিলে সাহিত্যের সেবা হয় না?

সাহিত্য-গুরুদিগের সাধনা।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রতিভার বরপুত্র ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিভাদেবীর অনুকম্পায় তিনি যে হঠাৎ মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া উঠেন, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। পোষাকে বিদেশী সাজিলেও মাইকেলের হৃদয় ষোল আনা স্বদেশী ছিল। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ যে কত গভীর ও তীব্র ছিল তাহা বলা যায় না। বিদেশে থাকিয়াও মহাকবি মাতৃভাষার উন্নতিসাধনের জন্য কিরূপে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে বুঝা যায়:—

"My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6—8 Hebrew; 8—12 School; 12—2 Greek; 2—5 Telegu and Sanskrit; 5—7 Latin; 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?"

ইহার মর্ম্মার্থ এই—"আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রের অপেক্ষা কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ; ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু; ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক্; ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন ও ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ইংরেজী। আমি কি আমার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য—মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?"

মাতৃভাষার সৌষ্ঠব-সাধনের এই কঠোর প্রয়াসের ফল—মেঘনাদবধ কাব্য,—বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন। প্রতিভার সহিত এমন জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনার সমাবেশ না হইলে মাইকেল বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মাইকেল

হইতে পারিতেন না। মাতৃভাষায় কাব্য লিখিবার আগে অতুলপ্রতিভাবান্ মধুসূদনকেও কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আর এখনকার তথাকথিত বালখিল্যের দল সাহিত্যের উঠানে ভাল করিয়া হামাগুড়ি দিতে না শিখিয়াই আচার্য্য হইতে চায়। আবার এই সকল অপোগণ্ডের অত্যাচারও এদেশে সকলকে সহিতে হইতেছে। আশ্চর্য্য বিধির বিধান বটে।

* *
*

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় 'আনন্দমঠ' রচিত হয়। তাঁহার বাসা গঙ্গার ধারে ছিল। প্রতি শনি ও রবিবারে কলিকাতা হইতে কবি হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি সাহিত্যরথগণ এইখানে আসিতেন।

চুঁচুড়ার সঙ্গীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার একরূপ তাঁহার প্রায় নিত্য সহচর ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচিত হইতেছিল। এক নব্য উকিল ও এক নবীন ডেপুটী এই সময়ে প্রত্যহ বঙ্কিমবাবুর কাছে থাকিতেন। বঙ্কিম ইহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। 'আনন্দমঠ' রচনার সময় বঙ্কিম স্বহস্তে লেখনী-চালনা প্রায়ই করিতেন না; অধিকাংশ সময়ে তিনি বলিয়া যাইতেন উঁহাদের মধ্যে যাঁহার সুবিধা হইত, তিনিই লিখিয়া যাইতেন।

"বন্দে মাতরম্" গীতটী হঠাৎ রচিত হয় নাই। তারকাখচিত গগনতলে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে, উন্মুক্ত সৌধশীর্ষে কত নিশা গভীর চিন্তায় যাপিত হইয়াছে। কিন্তু গীতটী আর রচিত হয় না। কবি ভাবসমুদ্রে ডুব দিয়াছেন, তিনি আর উঠিতেছে না। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ জাতীয়-সঙ্গীত-রচনায় এইরূপ বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কবির যুবক সঙ্গিদ্বয় একটু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই এজন্য কবিকে 'তাগিদ' করিতেন।

অবশেষে সঙ্গীতরচনার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল। কবিরভাব-তরঙ্গ হৃদয়-বেলায় আছাড়িয়া পড়িতেছে; সে ভাব আর ধরিয়া রাখা চলে না। কবি উঠিলেন। রাত্রি তখন চারিটা। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষীর কণ্ঠস্বর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র—ভাবোন্মত্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সেই যুবক সঙ্গী দুইজনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহারা বিস্মিত হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়াই দেখিল,—সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্র; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ডাকিলেন,—তোমরা এস; বাঙ্গালার জাতীয়-সঙ্গীত লিখিয়া লইবে, অবিলম্বে এস।

যুবকদ্বয় বঙ্কিমবাবুর অনুগমন করিল। বাড়ীতে আসিয়া একখণ্ড কাগজ তুলিয়া লইল। বঙ্কিম বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিও লিখিতে আরম্ভ করিলেন যখন বঙ্কিমচন্দ্র

"কেবলে মা তুমি অবলে"—

এই ছত্রটী বলিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদ্বয় সসম্মানে বলিল, এত উৎকৃষ্ট ও সুমধুর সংস্কৃত শব্দের পর এই কথাগুলি কেমন কেমন ঠেকে। বঙ্কিম বলিলেন,—"তোমাদের জীবদ্দশায় এক দিন ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারিবে। এ ছত্রটী তোমাদের পছন্দ হইবে না, তাহা আমি জানি। আগামী শনিবারে হেমচন্দ্র আসিবেন; তিনি এ ছত্রটী দেখিলে কোনও আপত্তি করিবেন না।" হেমচন্দ্র আসিলে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত তাঁহাকে পড়িতে দেওয়া হইল। তিনি পড়িয়া বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা মধুরতর, মহত্তর রচনা প্রাচীন ও আধুনিক কোনও ভাষায় রচিত হয় নাই।"

কোন বাঙ্গালী হেমচন্দ্রের এই অভিমতের পোষকতা না করিবে?

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত-রচনার এই বিবরণটুকু আমরা "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রের ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যিনি এ বিবরণ লিখিয়াছেন, রচনার নীচে তাঁহার নাম নাই। 'One who knew him' স্বাক্ষরে তিনি আত্মনাম গোপন করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা যে কিরূপ কঠোর এবং তাঁহার অধ্যবসায় যে কত দূর দৃঢ় ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সাধনা ও একাগ্রতা এবং তাহার সহিত অপূর্ব্ব প্রতিভার সংমিশ্রণ ছিল বলিয়াই বঙ্গসাহিত্যকে তিনি এমন সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ।

(৪)

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবি।

(লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গীতিকাব্য হইতে রমণী-প্রেমের আদর্শ সংগ্রহ করেন নাই সত্য এবং রাধা-চরিত্রও তাঁহার কাব্যের মূল নহে, কিন্তু শিক্ষিতা বাঙ্গালিনীর হৃদয়ের ভাব সংগ্রহ করিতে এবং সংগৃহীত ভাবরাশি উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বৈষ্ণব কবিদিগের পাঠশালায় পড়িতে হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথকে প্রেমের যে ভাষা শিখাইয়াছেন, প্রতীচ্যভাবে শিক্ষিতা বাঙ্গালিনীর মুক্তহৃদয়ের কাহিনী তিনি সেই ভাষায় অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ণনা ও রচনার ভঙ্গী যাহা কাব্য কলার অঙ্গ তাহারও কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গীতি-কবিতা হইতে ধার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি-মিশ্রিত মৈথিলের অনুকরণে 'ভানুসিংহ' নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুই একটী সুন্দর পদ ব্যতীত অন্য পদগুলি কদর্য্য না হইলেও সেগুলি যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুজ্জ্বল চিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে পরিপাটী পদাবলী রচনা করিয়া যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ সে সময়কার বাঙ্গালীর কবি-হৃদয় রাধা-কৃষ্ণের মধুর প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই প্রেমের রসোদ্ঘাটনের উপযোগী ভাষা বৃন্দাবনবাসী রাধা-কৃষ্ণের তথাকথিত ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেবল চণ্ডীদাস অতি সামান্য ব্রজবুলি বা মৈথিল-মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার পদাবলী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত প্রতিভাবান প্রেমের কবি বঙ্গদেশে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, একথা স্মরণ রাখা উচিত। জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস লোচনদাস বলরামদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের লীলা—বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলীর মাঝে কল্পনা করিয়া তথাকথিত ব্রজবাসীদের ভাষাই যে নায়ক-নায়িকার ভাষা ইহা স্থির করিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে পদ রচনা করিয়াছিলেন। নরোত্তম দাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্গদেশবাসী

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করিবার জন্য বাঙ্গালীর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তখন তাঁহারা বৃন্দাবন-লীলা বিদ্যাপতির ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। ভানুসিংহ বৈষ্ণব হইলে হয় ত তাঁহার পদাবলীও ব্রহ্ম-সঙ্গীতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইত। সে যাহা হউক ভানুসিংহ বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ রচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণব কবির প্রেম যখন তাঁহার আদর্শ নয়, তখন বাঙ্গালা ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করাই সঙ্গত। সেই কারণে তিনি বৈষ্ণব কবির প্রেমের অনুভাব বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কবিতায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ভানুসিংহের পদাবলীর কথা ছাড়িয়া দিলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈষ্ণব কবিগণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এমন অনেক শব্দ ও বাক্য তাঁহার বাঙ্গালা কবিতায় পাওয়া যায়, যেগুলি তিনি বৈষ্ণব কবির অভিধান হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বৈচিত্র্যময় কাব্যে নিপুণতার সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণকারী পুরুষ ও স্ত্রী কবিগণ ইতিমধ্যেই অনেকগুলি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া সেগুলিকে আধুনিক কাব্যের ভাষার মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন। এই মুষ্টিমেয় নূতন শব্দ লাভ করিয়া বঙ্গভাষার যে দৈন্য দূর হইয়াছে ইহা আমরা মনে করি না, তবে মৈথিল কবিতা-রচনার পক্ষে যে সেই কথাগুলি অনেকটা সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনুকরণের বশবর্ত্তী না হইয়া যখন স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বনে বিদ্যাপতি-প্রমুখ প্রাচীন কবিগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া কাব্য-রচনার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিল, তখন হইতে বঙ্গভাষার শব্দ-ভাণ্ডার দিন দিন পূর্ণতর হইতে লাগিল। সরল ভাষায়, সহজ কথায় যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইতে পারে, এ সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পুরাতন কবিদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছন্দের সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনেকটা আভাস যে তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট পান নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। গীতি-কবিতায় বিশেষতঃ গানের ভাষাকে কোমল করিতে হইলে যে ছন্দের উপযোগী শব্দ কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আবশ্যক হইলে শব্দবিশেষের যুক্ত অক্ষর টানিয়া গ্রন্থিশূন্য করা যায় কিম্বা দুইটী শব্দ জুড়িয়া এক করিয়া দেওয়া যায়, এই সকল ও শব্দপ্রয়োগের অন্যান্য নিয়ম বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণব কবির আড়ম্বরশূন্য ভাষা যে দুর্ব্বল নহে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। যে ভাষা প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎপাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সে ভাষা দুর্ব্বল হইতেই পারে না। তবে ইহাও সত্য যে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি মৃতপ্রায় বাঙ্গালী জাতির ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রেমের অভিব্যক্তির কথা ভাবিলে মনে হয় যে, কোমল প্রাঞ্জল মধুর-ঝঙ্কারযুক্ত ভাষা ব্যতীত কাব্যে তাহার পূর্ণবিকাশ সম্ভবে না। মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষা বৈষ্ণব কবির আদর্শে শিক্ষিতা বঙ্গরমণীর হৃদয়গত ভাবের অনুসরণ করিয়া সঙ্গীতাকারে সাহিত্যের প্রণয়-কুঞ্জেও ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবির হাতে পড়িয়া রাধাকে চিরদুঃখিনী হইতে হয় নাই। বৈষ্ণব কবি প্রেমের 'ট্রেজেডি' লেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রেমিক উন্মাদ না হইলে সংযত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করে। নব্য বাঙ্গালী প্রেমিক কিন্তু ভয়ানক বাক্যপটু। বক্তৃতা ও কবিতাগুলির দেশে যেরূপ প্রেমিক-প্রেমিকা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার অবিকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রমণী-প্রেমের পরিণাম সম্বন্ধে বলিবার যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালী বাবু প্রেমের পবিত্র মন্দিরে দেবতা সাজিয়া বসিয়া আছেন, আর দারুণ বুভুক্ষায় পীড়িত বাঙ্গালিনী ক্ষুধাতুর হৃদয় লইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন। ঔপন্যাসিক গল্পসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া কত শত শিক্ষিতা বঙ্গরমণী যে এইরূপে প্রতারিত লাঞ্ছিত পদদলিত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের 'ট্রেজেডি' সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত।

(ভৈরবী—আড়াঠেমটা)

কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয় রে চলে আয়,
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে—
হৃদয়-কুসুম দলে যায়।
হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয়।

এই ভাবের বিস্তর গীতি-কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবির রাধার মান-অভিমান আছে। কৃত্রিম হউক বা অকৃত্রিম হউক, রাধার কোন্দলের কথা আমরা বৈষ্ণব কবির অনেক পদে শুনিতে পাই। বাঙ্গালীর মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কেবল হায় হায় করিয়া কাঁদিয়াই সারা।

(আসোয়ারি)

না সজনি না, আমি জানি জানি, সে আসিবে না।
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী ; বাসনা তবু পূরিবে না ;
জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল না!
যদি বা সে আসে সখি, কি হবে আমার তায়,
সে ত মোরে, সজনি লো, ভাল কভু বাসে না, জানি লো!
ভাল ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা ক'রে শেষে পূরিবে না কামনা।

(মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি)

সখা হে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জরজর হৃদয় আমার মর্ম্মবেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়।

নারীর মুখ দিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী প্রেমিকের চরিত্র অনেক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন।

(ললিত—আড়াঠেকা)

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে।
তোরা শুধু করিস্ দান, তারা শুধু করে মান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা আর ত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে, প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে,
পরাণ ভেঙে মধু দিবি অশ্রুঢাকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বোলে, শুকায়ে পড়িবি শেষে।

"অভাগিনী" নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত রমণী-প্রেমের নিখুঁত ফটো দিয়াছেন। "অভাগিনী ললিতা" নয়নের জলে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া শেষে ভিক্ষুকের মত পায়ে ধরিয়া বিনয়-বচনে বলিল—

সর্ব্বস্ব দিয়েছি ওগো পরাণ হৃদয়—
হৃদয় দিয়েছি খোলে   হৃদয় চাহি না ভুলে,
একটু ভালবাসিও—আর কিছু নয়।

এ হেন ভালবাসার যে কি প্রতিদান তাহার কথাও কবি অনেক স্থানে বলিয়াছেন।

পড়েছিনু চরণ-তলে, দলে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ গেছ ভাল; ভাল, তাহে দুখ কিবা।

বৈষ্ণব কবিরা প্রেমিক বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহারা রমণী-প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিতেন। তাঁহাদের সহিত ভীরু বাঙ্গালী প্রণয়ীর তুলনা হইতে পারে না।

যে জন আপনি ভীত, কাতর দুর্ব্বল,
ম্লান ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে?

(বিফল কামনা)

রেণুর বর।

[শ্রীমতী——লিখিত]

(৩৯)

অর্দ্ধরাত্রে সাবিত্রীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি উঠিয়া দেখিলেন, ভবানী বিছানায় নাই, তিনি ভাবিলেন, ভবানী বোধ হয় বাহিরে গিয়াছে। আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া তিনি ভবানীকে ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। তখন আলো লইয়া কল-ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন, "ভবানী"। কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তাহার মনে কোন অজ্ঞাত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল, তিনি দ্রুতপদে আলো লইয়া ছাদে উঠিয়া ডাকিলেন, "ভবানী"! কোন উত্তর

পাইলেন না, তাঁহার কণ্ঠস্বর শূন্যে মিশাইয়া গেল; দেখিলেন ছাদ শূন্য। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, চোখের দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিল। কতক ক্ষণ এইরূপ স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া তিনি আবার নীচে নামিয়া সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ, এবং পূর্ব্বমত চাবি বন্ধ আছে। তিনি আবার আলো লইয়া, রান্নাঘর, কলতলা এবং পাইখানা পর্য্যন্ত দেখিয়া হতাশ হইয়া নিস্পন্দ ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার দৃষ্টি অপরিষ্কার খিড়কির দরজার দিকে পড়িল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সে দরজা খোলা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার সকল সংশয় কাটিয়া গেল। তখন সকলই বুঝিতে পারিয়া দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া মণিলালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে দ্রুত বাহিরে আসিয়া একাকী সাবিত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং ভীতস্বরে বলিল, "কি হয়েছে মামী মা?" মণিলালকে দেখিয়া সাবিত্রী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন। মণিলাল, কি হইয়াছে কিছু বলিতে না পারিয়া, গৃহমধ্যে গিয়া নিদ্রিত বলরাম বাবুকে ডাকিয়া বলিল, "মামা বাবু শীঘ্র উঠুন।" বলরাম বাবু উঠিয়া এবং সাবিত্রীর কান্না শুনিয়া ব্যস্তভাবে মণিলালের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে?" স্বামীকে দেখিয়া সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভবানী সর্ব্বনাশ করেছে।" বলরাম বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কৈ ভবানী, কি করেছে?" সাবিত্রী বলিলেন, "সে বাড়ীতে নাই, খিড়কীর দরজা খোলা, সে কপাল পুড়িয়ে চলে গিয়েছে।" সকল কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরে মণিলাল আলো লইয়া ছাদের দিকে অগ্রসর হইল। ইহা দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন "ওরে হতভাগা আমি সব দেখেছি, সব জায়গা দু'বার করে দেখেছি।" মণিলাল আর অগ্রসর হইল না, আলো হাতে সেই খানেই নত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরবে সেইভাবে থাকিবার পর সাবিত্রী বলিলেন, "এখন একটা উপায় কর।" বলরাম বাবু বলিলেন, "এখন তাহার উপায় মৃত্যু, মনে কর ভবানী মরিয়া গিয়াছে, তাহার নাম পর্য্যন্ত যেন আমাকে শুনিতে না হয়, তুমি আর চীৎকার করিও না, আর কলঙ্ক বাড়াইও না, ঘরের ভিতর যাও, মনে কষ্ট হয়, মনে মনে কাঁদ। আর কাঁদিয়াই বা লাভ কি, তার চেয়ে এখন ভগবানকে ডাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন ভবানী শীঘ্র মরিয়া যায়।" ইহা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া নিজ শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

সাবিত্রী ও মণিলাল অনেক ক্ষণ সেই স্থানে সেই ভাবে থাকিয়া, পরে গৃহে আসিয়া শয়ন করিলেন। সকলে শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কেহই নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, সকলেই নীরবে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী যদিও স্থির জানিতেছিলেন, ভবানী রমেশের কথামত, তাহারই উদ্দেশে গিয়াছে; তথাপি তাহার আর একবার ভবানীকে ফিরাইবার জন্য হৃদয় ছুটিতে লাগিল। তিনি পরদিন সকল ঘটনা খুলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া মানদাময়ীর নিকট পাঠাইলেন। বাটীতে কোন ঝি কিম্বা চাকর ছিল না, সেজন্য ভবানীর পলায়ন-বার্ত্তাটী পাড়ায় টেলিগ্রাম হইতে পারিল না, এ সকল ঘটনা একরূপ চাপা পড়িয়া গেল, ভবানীর কথা কোন মজলিসে উঠিতে পারিল না। পাশের বাটীর একজন কয়েক দিন পরে সাবিত্রীকে ছাদে দেখিয়া বলিল, "হাঁগা রেণুর মা, ভবানীকে কয়েক দিন হ'তে দেখিতেছি না কেন?" সাবিত্রী বলিলেন "শ্বশুরবাড়ী গেছে"। প্রতিবেশী বলিল "তারা নিতে এসেছিল বুঝি"। সাবিত্রী "হুঁ" বলিয়া নামিয়া আসিলেন।

(৪০)

থিয়েটারে যাই বলিয়া রাত্রে রমেশ চলিয়া গিয়াছে। পরদিন অধিক বেলা পর্য্যন্ত বাটী ফিরিল না দেখিয়া মানদাময়ী তাহার পলায়নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া স্থিরভাবে রহিলেন। পুত্রের সন্ধানের কোন চেষ্টা করিলেন না, পরে যখন সাবিত্রীর পত্র পাইলেন, তখন তাঁহার সকল সংশয় কাটিয়া গেল। পুত্রের চরিত্র দেখিয়া ক্রোধে ঘৃণায় আজ তাঁহার হৃদয় মাতৃস্নেহের পরিবর্ত্তে পুত্রের প্রতি নির্ম্মম দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রের নাম পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সাবিত্রীর পত্রের উত্তর দিলেন না। কয়েক দিন পরে মণিলাল যখন রেণুকে লইয়া যাইবার কথা বলিতে আসিল, তখন মানদাময়ী বলিয়াছিলেন, "তোমার মামীমাকে বলিও রেণুকে শুধু আজ কেন আর কোনও দিন তাঁহার বাটীতে পাঠাইব না। যখন তাঁর ইচ্ছা হইবে তখন যেন তিনি এখানে আসিয়া দেখিয়া যান, আর বলিও না পাঠাইবার কারণ তিনি কন্যা রাখিবার উপযুক্ত নহেন।" সকল কথা শুনিয়া মণিলাল মুখ ম্লান করিয়া গেল। কয়েক দিন পরে যখন সরকার আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন "দাদাবাবুর সন্ধান কিরূপ হইবে, সংবাদপত্রে লিখিয়া দিব কি?" গৃহিণী গম্ভীরস্বরে বলিলেন "না, কোন দরকার নাই, সে ছোট ছেলে নয়, কোন ভাবিবার দরকার নাই, যখন ইচ্ছা

হইবে, তখন আপনি আসিবে। যান অন্য কাজে মন দিন, ও সব কথা আর আমায় বলিবেন না।" সরকার ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, মায়ে পুত্রে বোধ হয় কোন কারণে রাগারাগি হইয়াছে, তাই ছেলে রাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে। তিনি গৃহিণীর প্রকৃতি জানিতেন। মানদাময়ী একধারে যেমন দয়াশীলা এবং স্নেহময়ী, আবার অপর দিকে তাঁহার কর্ত্তব্য-পালনেও তেমনি দৃঢ়তা, তাঁহার চিত্তের বিরুদ্ধে কেহ বাধা দিতে পারিত না, করিলেও তাহা টিকিত না। এ ক্ষেত্রে আর কোন কথা না তোলাই ভাল, ইহাই তিনি বিবেচনা করিলেন। রেণুর প্রতি মানদাময়ী এখন বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা তাহাকে নিজের কাছে কাছে রাখিতেন, দুপুর বেলা রেণুকে কাছে বসাইয়া পুরাণ ইত্যাদি পড়িতেন, এবং উহার মর্ম্ম গল্প করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যদিও তিনি বুঝিতেন রেণুর মনে একথাগুলি কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তাহার মন এখন পুতুল খেলার দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে শাস্ত্রের জটিল নীতি-কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এত দিন তিনি রেণুর খেলা করা ভিন্ন আর কিছু কাজ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না, কিন্তু এখন নানারূপ ভাবিয়া তাহাকে কাজে লিপ্ত করিবার জন্য তাঁহার নিত্য পূজার আয়োজন করিবার ভার রেণুর উপর দিলেন। এই কাজ লইয়া রেণুকে সকালে অনেক সময় পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয়, আবার আহারাদির পর গৃহিণী পুরাণ পড়িতে বসিলে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। বৈকালে একটু খেলা করিয়া আবার সন্ধ্যাকালে সকল গৃহে সন্ধ্যাজল দেওয়া, তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া, শাঁক বাজান—এই সব নিত্যকর্ম্ম এখন রেণুই করিয়া থাকে। এইরূপে অনিচ্ছা সত্ত্বে সংসারের কার্য্যের সহিত মিশিতে মিশিতে রেণুর মন ক্রমশঃ সংসার ও দেবতা-পূজার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে রেণুর পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিত, কিন্তু সে শুনিয়াছিল মানদাময়ী বলিয়াছিলেন, আর তাহাকে যাইতে দিবেন না, কারণ কিছু না বুঝিলেও, এই বুঝিয়াছিল, তিনি তার মার উপর রাগ করিয়াছেন, এজন্য সে কিছু বলিত না, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া থাকি , মানদাময়ী ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইতেন, এবং গাড়ী করিয়া তাহাকে পিতা মাতাকে দেখাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ লইয়া আসিতেন। সেখানে রেণু যখন দেখিল, ভবানী নাই, তখন সে জননীকে বলিল, "মা দিদি কোথায়?" জননী বলিলেন, "মরিয়া গিয়াছে।" শুনিয়া রেণু আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু সকলের মুখের ভাব দেখিয়া

মরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। সে ভাবিল, কি হইল, এখানে দিদি নাই, সেখানে "সে" নাই, যেন কি একটা হইয়াছে। অনেক ভাবিল বটে, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

(৪১)

আজ পাঁচ বৎসর হইল, রমেশ বাটী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গৃহিণী মানদাময়ীকে ইহার মধ্যে কেহ একটী বার পুত্রের নাম পর্য্যন্ত করিতে শুনে নাই। রমেশ যাইবার দুই মাস পরে যতীশচন্দ্র সরকারের কাছে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে লেখা ছিল, রমেশ ভবানী নামে একটী স্ত্রীলোককে লইয়া আমার বাসায় আসিয়াছিল, এক্ষণে সে নাগপুরে রেজিষ্টারী আফিসে কর্ম্ম পাইয়া সেই স্থানে গিয়াছে। সরকার মহাশয় রমেশের সন্ধান পাইয়া, যখন মানদাময়ীকে শুনাইলেন, তখন তিনি প্রথমে নিস্পন্দ হইয়া শুনিয়া, পরে বলিলেন, "আমি বলিতেছি ও পত্রখানা এখনি ছিঁড়িয়া ফেলুন, আর কখনও তাহার নাম পর্য্যন্ত আমাকে শুনাইবেন না।" সরকার বলিলেন, "ছেলের উপর অভিমান করে কি করবে মা, তার চেয়ে হুকুম দাও আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসি?" একথা শুনিয়া মানদাময়ী তীব্রস্বরে বলিলেন "কখনই নয়, আমি হিন্দু, হিন্দুর পরিবার, ম্লেচ্ছদের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। আমি মনে স্থির জানিয়াছি আমার পুত্র নাই, তাহারা মরিয়া গিয়াছে। যদি কেহ পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার বাড়ীতে আসে তবে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব।" গৃহিণীর ভাব দেখিয়া এবং তাঁহার প্রকৃতি জানিয়া বৃদ্ধ সরকার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। এ সকল ঘটনা বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। মনে হয়, রমেশের নাম পর্য্যন্ত বুঝি সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায়, একটী প্রাণে যেন দিন দিন রমেশের স্মৃতি, রমেশের অভাব জাগিয়া উঠিতেছে।

রেণু আজ আর বালিকা নাই। আজ আর সে পুতুল-খেলার আগ্রহে সংসার ভুলিয়া থাকিতে পারে না, এখন তাহার সাধের খেলনা ঝুড়ি-পূর্ণ হইয়া গৃহের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। সে এখন ক্রমে ক্রমে সকলি বুঝিয়াছে, সমস্তই জানিয়াছে; কিন্তু সে রমেশের প্রতি রাগ বা ঘৃণা করিতে পারিল না। যখন মনে পড়িত আমি পরিত্যক্তা, তখন অতি দুঃখে মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত আমার অদৃষ্ট। সে মনে মনে ভাবিত যে কয়দিন অদৃষ্টে ছিল, তখন যদি প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, তখন যদি যথাসাধ্য সেবা করিতাম, তাহা হইলে ত এ জীবন

সার্থক হইত, কিন্তু আর বুঝি এ জীবনে তাহা হইবে না। সে মানদাময়ীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িত। যখন তার প্রাণ একবার দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত তখন সে চুপে চুপে রমেশের ঘরে গিয়া তাহার জিনিষ-পত্রগুলি প্রাণ ভরিয়া দেখিত, তাহাতে সে যেন কত শান্তি, কত তৃপ্তি পাইত। সকল সময়েই তাহার মন যেন কোন স্মৃতির পথে ভাসিয়া বেড়াইত, এজন্য সে সর্ব্বদাই অন্যমনা হইয়া পড়িত এবং যথাসাধ্য আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইল, এ ভাবনা করিবার যেন তার অধিকার নাই, সে যাহাকে ভাবে, যাহাকে ভালবাসে, যাহাকে চায়, সে যেন ইহাদের কোন শত্রুর মত হইয়া গিয়াছে, কেহ ভুলিয়াও তাহার নামটা পর্য্যন্ত করে না। এজন্য তাহার মনে হইত, রমেশের কথা মনে করা তাহার পক্ষে যেন বিপক্ষ শত্রুকে গোপনে সম্মান করা হইতেছে। কিন্তু সে কি করিবে, সে যে তাহারই স্মৃতির দাসী হইয়া আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। যদি কোন সময়ে গৃহিণীর সম্মুখে অন্যমনা হইয়া পড়িত, তখন সে বড়ই ভীত হইত। মানদাময়ী সকলই বুঝিতেন, এবং গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। তিনি পুত্রের জন্য দুঃখিত হইতেন না, শুধু তিনিই যে রেণুর দুঃখের কারণ, এই ভাবিয়া মনে মনে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেন এবং দেবতার স্থানে নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া একান্ত-মনে প্রার্থনা করিতেন, "ভগবান, আমার এ শুভ্র ফুলটাকে তুমি গ্রহণ কর, আমি বড় সাধ করে তুলেছিলাম, তুমি গ্রহণ ক'রে উহাকে উজ্জ্বল-মধুর কর।"

(৪২)

সাংসারিক নানা যন্ত্রণায় পড়িয়া পুত্রদের ব্যবহারে প্রাণে নিদারুণ ব্যথা পাইয়া এবং অন্তরে সে ব্যথা গোপন করিয়া শেষে মানদাময়ী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জননীর অসুখের সংবাদ পাইয়া কন্যাদ্বয় দেখিতে আসিলেন এবং উভয়েই মাসাবধি মাতার নিকটে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বেশী দিন পিত্রালয়ে থাকিলে চলে না, কাজেই দুঃখিত-অন্তঃকরণে শ্বশুর-বাটীতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহারা জননীকে বলিলেন, "মা রমেশকে সংবাদ দি, সে যেখানেই থাক্ তোমার অসুখ শুনিলে ছুটিয়া আসিবে"। জননী বলিলেন, "উহাদের নাম আর আমার সম্মুখে করিও না।" পঙ্কজিনী বলিলেন, "তুমি না পার, আমি উহাকে পত্র লিখি"। ইহা শুনিয়া জননী অধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে নিশ্চন্ত হইয়া মরিতেও দিবে না?" জননীর একান্ত বিরক্তি দেখিয়া কন্যারা আর কিছু বলিতে

পারিলেন না, বা তাহার মতের বিরুদ্ধে গোপনে রমেশকে সংবাদ দিতেও সাহসী হইলেন না। কেন না মাতার প্রকৃতি তাঁহাদের বিলক্ষণ জানা ছিল। কন্যারা চলিয়া গিয়াছেন। এখন রেণুই গৃহিণীর সর্ব্বস্ব হইয়াছে। রেণু আর চঞ্চলা বালিকা নাই। সে এখন একাই গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মই দেখিতেছে এবং মাতৃরূপা হইয়া মানদাময়ীর শুশ্রূষা করিতেছে। আবার সঙ্গিনী হইয়া নানা কথা-বার্ত্তায় তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আবার পুত্রস্থানীয় হইয়া চিকিৎসা করিতেছে। রেণু এখন আর পিত্রালয়ে যায় না, মণিলাল প্রায়ই মানদা-ময়ীর সংবাদ লইতে আসে। সাবিত্রীও মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন। তিনি কন্যাকে এমন ধীরভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তাহার বালিকা বয়সে গাম্ভীর্য্য মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত এবং বিস্মিত হইয়া ভাবেন, এই কি আমার সেই রেণু! সত্য কি আমার মেয়ের গুণ, না শিক্ষার গুণ! এখন তিনি ভাবেন, সত্যই মানদাময়ী বলিয়াছিলেন আমি মেয়ে মানুষ করিতে জানি না। দিন দিন মানদাময়ী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, বড় বড় কবি-রাজেরা কেহই রোগ স্থির করিয়া উপযুক্ত ঔষধ দিতে পারিতেছে না, ক্রমে ক্রমে তিনি একেবারে শয্যা গ্রহণ করিলেন। গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ সরকার অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং এ সময়ে যতীশচন্দ্রকে সংবাদ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। ইদানীং তিনি রেণুর সহিত কথা কহিতেন, এক দিন তিনি রেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ মা, কবিরাজেরা এখনও কিছু স্থির করিতে পারি-তেছে না, অবস্থা দেখিয়া আমার ভাল বোধ হইতেছে না। আমি মনে করিতেছি, যতীশকে সংবাদ দি, সে যেন রমেশকে সংবাদ দেয়, ইহাতে তুমি কি বল, মা?" রেণু মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি তার কি বলিব, আপনি যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করুন। সরকার বলিলেন তবে লিখেই দি কি বল মা? রেণু সেই ভাবে বলিল, তবে লিখেই দিন। সরকার চলিয়া গেলে রেণুর বুক যেন কাঁপিতে লাগিল, তাহার মনে কে যেন কত আশার কথা শুনাইয়া দিল। তাহার মনে হইতেছে, যদি আসেন তবে কি আমাকে চিনিতে পারিবেন, আর আমি কি চিনিতে পারিব? কত দিন কত বৎসর দেখা হয় নাই, হয়ত এখন অন্য রকম হইয়া গিয়াছেন। সেই দিন হইতে রেণুর হৃদয় যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, রোজ একবার বাহির বাটীতে সংবাদ লইত কাহারও পত্রাদি আসিল কিনা। রাস্তায় গাড়ী চলিয়া গেলে সে কর্ণ স্থির করিয়া শুনিত, গাড়ী থামিল কি না। মানদাময়ীর হৃদয়ে পুত্রবিরহ যতই প্রবল হইতে লাগিল, তিনি নীরবে মনোভাব দমন করিয়া সেই স্থানে রেণুকে টানিয়া লইতে লাগিলেন।

তিনি প্রায় বৎসরাবধি শয্যাগত থাকিয়া, রেণুর ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, এবং রোগীর শুশ্রূষার নিপুণতা যতই দেখিতে লাগিলেন, তিনি ততই ব্যথিত হইতে পড়িতেন এবং ভাবিতেন, এমন রেণুকে কাহার হাতে দিয়া যাইব। এমন লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করিলাম, দেখিল না হায় রে হতভাগ্য!

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন ও উত্তর।

আমাদের জনৈক পাঠক আমাদিগকে দুইটী প্রশ্ন করিয়াছেন। যথাসাধ্য সে দুইটীর উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। প্রশ্ন।

প্রসিদ্ধ পাঁচালী-রচয়িতা দাশরথি রায়ের সমসাময়িক দুই একজন কবির নামোল্লেখ করিবেন কি? কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল কি?

১। উত্তর।

দাশরথির সম-সময়ে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ কবির প্রাদুর্ভাব তেমন হয় নাই। কারণ তখন খাঁটি বাঙ্গালা কবিতার যুগ শেষ হইয়া আসিতেছিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফল-জাত কাব্য-যুগের আগমন সূচিত হইতেছিল। "বঙ্গবাসী"র প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়,— "দাশরথির সমসাময়িক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রসিকচন্দ্র রায় ও ব্রজনাথ রায়; ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। অধিক কি, স্বভাব-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এক সময় পীড়িতাবস্থায় জলপথে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে পীলায় (দাশরথির মাতুলালয় ও নিবাসস্থান) উপস্থিত হন। তথায় তিনি দাশরথির সহিত রহস্য-আলাপে এক দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গুপ্ত মহাশয় দাশরথির সহিত কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'রায় মহাশয়ের

শক্তি আমার হিংসার বস্তু।' ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটী দাশরথির হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা ছিল।"

২। প্রশ্ন।

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ ধারণা ছিল?

২। উত্তর।

বাঙ্গালা ১২৮১ সালে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কল্পতরু" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই সালের পৌষ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র উহার বিস্তৃত সমালোচনা করেন। উহার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিলেই ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণ কিরূপ ছিল বুঝা যাইবে:—"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায় ও লিপিচাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথবাবু পরদুঃখকাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুনীতির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য তাহা 'আলালের ঘরের দুলালে' নাই—সে বাকশক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শন-প্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা-প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চহাসি হাসেন না, হুতোমের মত 'বেলেল্লাগিরি'তে' প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়।"

———

অকারণ ক্রোধ।

—*:•—

[লেখক—শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়, বি-এ]

(১)

জোড়াসাঁকোর মোড়ে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মশাই, নীরদ ডাক্তারের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পারেন?" নীরদ ডাক্তার আমাদের পাড়ার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, তাঁর বাড়ী এ লোকটা চেনে না, এই ভাবিয়া মনে মনে খুব একটা রসিকতা-পূর্ণ উত্তর দিব ঠাউরাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনের কথা মনেই রহিয়া গেল! লোকটার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, চোখ দুটো যেন বাহির হইয়া আসিতেছে, ওষ্ঠপ্রান্ত একেবারে বিশুষ্ক, মনে হইল তাহার জিহ্বামূল পর্য্যন্ত বুঝি উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি আর কোনও কথা না বলিয়া তাহাকে ডাক্তার বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিলাম। ভদ্রলোক কোনও দিকে না চাহিয়া একেবারে ভিতরে ঢুকিয়া গেল, আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিবারও তাহার অবকাশ ছিল না।

নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(২)

তার পর রেলপথে তাহার সহিত আমার দেখা হয়। এখন আর তাহার সে ভাব নাই; চেহারা বেশ পরিষ্কার বটে, কিন্তু একটু যেন অন্যমনস্ক দেখিলাম। গাড়ীশুদ্ধ লোক চেঁচাচেঁচি করিতেছে, কিন্তু তাহার সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। বোধ হয়, তাহার মনের মধ্যে কিসের একটা হিসাব কিছুতেই মিলিতে ছিল না—তাহার শূন্য দৃষ্টিতে মনে হইল যে, তাহার মন কোনও অতীত বিষয়ের উপরেই পড়িয়া আছে। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারেন কি?"

লোকটী চটকভাঙ্গার মত চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "অ্যাঁ—না—কি বল্‌লেন আপনি?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে আগে আমি এক জায়গায় দেখেছি। সেই জোড়া-সাঁকোর মোড়ে—আপনি নীরদ ডাক্তারের"—

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তার কথা আর বল্‌বেন না মশাই! সে লোকটা খুনে, বদ্‌মাস্—মহাপাষণ্ড।" তার পর হঠাৎ মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "হায় হায় তার জন্যই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, তিনি আপনার কি ক'রেছেন? তাঁর নামে তো এ পর্য্যন্ত আমি কোন ও অপবাদ শুনিনি!"

"না শুনে থাকেন, বেশ ক'রেছেন"—বলিয়াই লোকটা আমার হাত ছাড়িয়া দিল ও আরও একটু সরিয়া বসিল। আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সে ক্ষণকাল শূন্যদৃষ্টিতে গাড়ীর ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল, ক্রমে বিরক্তির পরিবর্ত্তে তাহার মুখে গভীর বেদনার ছায়া দেখিলাম—তাহার চোখ দুটীও ছল ছল করিয়া আসিল। তার পর হঠাৎ আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া বলিল, "মহাশয়, বিপদে প'ড়ে আমার মাথা খারাপ্ হ'য়ে গিয়েছে—কিছু মনে কর্‌বেন না।"

আমি বলিলাম, "না না, সেজন্য চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই। আপনার মন যে এক বিশেষ বিপদে অবসন্ন হ'য়ে আছে, তা' আপনি না বল্‌তেই বুঝেছিলাম। শুনেছি, এক জনের কাছে খুলে বল্‌লে মনের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হ'য়ে যায়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, স্বচ্ছন্দে নিজের কথা বল্‌তে পারেন।"

(৫)

লোকটী আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল। তখন ট্রেণ খোলা মাঠের মধ্য দিয়া চলিতেছে। বেলা দুপুর হইলেও চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। কোথাও একটু নীল জমির চিহ্নমাত্র নাই। কয় দিনই এরূপ মেঘ করিয়া আছে, অথচ না রোদ, না বৃষ্টি। যা দু চার ফোঁটা জল ছিড়্ ছিড়্ করিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে শুধু পাঁকের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের ভাবও তেমনি পঙ্কিল। বিশ্রী ধোঁয়ার মত মেঘ—তাতে একটু বিদ্যুতের রেখা পর্য্যন্ত নাই। গাছগুলো পর্য্যন্ত উদাসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বর্ষার নূতন জলে সদ্যস্নাত হইলে তাহাদের যে শোভাবৃদ্ধি হয়, তাহার কিছুই হয় নাই। বাহিরের দিকে আর তাকাইতে ইচ্ছা হয় না। তবু এক ছোকরা, কবি কি না জানি না, মাথা বাড়াইয়া সেই দৃশ্যই গিলিবার মত করিয়া দেখিতেছে। বোধ হয়, সে আগে কখনও রেলে চড়ে নাই।

বাকী লোকগুলি তিনটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক দল যুদ্ধ সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতেছিলেন—আর এক দল জিনিস-পত্র কিরকম মহার্ঘ হইয়াছে তাহার কথাই বারম্বার বিচার করিয়া দেখিতেছিল ও তৃতীয় দল আলুর চাষ করিলে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহারই হিসাব নিকাশ করিতেছিল। আর আমার পার্শ্বস্থিত এক বৃদ্ধ তাঁহার আয়ত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে অতি ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট এক হাসির রেখা চাপিয়া রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে তিন দলের কথাই শুনিয়া যাইতেছিলেন।

কিন্তু এত গোলমালের মধ্যেও একেবারে নির্লিপ্তভাবে বসিয়াছিল—আমার পূর্ব্ব-পরিচিত লোকটী। তাহাকে দেখিয়া আমার কেমন দয়া হইল। আমি তাহাকে কথা কহিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ মশাই, আপনি সে দিন কার জন্য ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছিলেন?" লোকটীর মুখ যেন উন্মুক্ত প্রস্রবণের মত খুলিয়া গেল। সে বলিল—"আমার মেয়ের জন্য। আমার মেয়ের কথা আপনি শোনেন নি? সে জন্মাবার পর হইতেই আমাদের দিন ফিরিয়া যায়—আমরা তার নাম রেখেছিলাম—লক্ষ্মী।

অবশ্য সে নেহাৎ লক্ষ্মীটীর মত হইয়া উঠে নাই। পাড়ার সবাই তাকে ভীষণ দুরন্ত বলিয়া জানিত। কিন্তু তাহার কারণ ছিল। জ্ঞান হইয়া অবধি সে তার গর্ভধারিণীর মুখ দেখে নাই। আমাকেই তাহার মা-বাপ দুয়ের স্থানই পূরণ করিতে হইয়াছিল। লোকে বলিত, আমি তাকে অত্যধিক আদর দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু যতই আদর দিই না কেন,—মাতৃস্নেহ! ওঃ সে অভাব কি পূরণ করিতে পারিয়াছিলাম? আমারও তো মা ছিল!

যখন আমার স্ত্রী বাঁচিয়াছিল, তখনও আমি লক্ষ্মীকে কাঁধে করিয়া ফিরিতাম। লোকে আঙ্গুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিত—লোকটা কি বেহায়া, একেবারে অন্তঃসারশূন্য! কিন্তু তাহারা জব্দ হইয়া গিয়াছিল—আমার লক্ষ্মী মাতৃহীন হইয়া যাইবার পর আর এ কথা বলিতে কেহ সাহস করে নাই।

তবু তাহার জন্য আমায় অনেক গালাগালি সহিতে হইয়াছে। আমি দরিদ্র, চাঁদ চাহিলে চাঁদ দিতে পারিতাম না, কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস, লক্ষ্মিমাণ এমন কিছু চাহে নাই যাহা আমি জোগাইতে পারি নাই। আহা মা আমার বুঝ্‌তে পেরেছিল। সেই জন্যই বোধ হয়—যাক। শেষাশেষি সে সত্য সত্যই একটু আব-দেরে হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তার আবদার রক্ষা ছাড়া আমার যে আর কিছু কাজ ছিল না। বুঝতে পারছ না, সে মাতৃহীন শিশু। পৌষমাসের দারুণ

শীতে আমি যখন রাত দশটার সময় কম্বল মুড়ি দিয়া ঠোঙ্গা হাতে করিয়া বাড়ী ঢুকিতাম, শ্যামা খুড়ো হাঁক দিয়া বলিতেন, "কি হে বাপু, এত রাত্তিরে সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে শুলো, তুমি আবার বেরিয়েছিলে কোথা? ওঃ, লক্ষ্মীমণির বুঝি শোবার সময় কুমড়োর বরফি খাবার সাধ হয়েছে?" আমি তখন তাড়াতাড়ি ঠোঙ্গা চাপা দিয়া সরিয়া পড়িতাম; কিন্তু দেখা হইলেই খুড়ো আমায় বলিতেন, "মেয়েকে একটু শাসন ক'রো, বাবা, এর পরে শ্বশুরঘর করতে হবে তো! তখন তো আর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না।" আমি তাহার কোনও উত্তর দিতাম না, কারণ, আমি জানিতাম, আমি তাকে এখনও যথেষ্ট আদর করিতে পারি নাই।"

লোকটি বকিয়া যাইতে লাগিল। সে তাহার মেয়েকে কি কি খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল, কবে তাহাকে ঘাড়ে চড়াইয়া চড়ক দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল, কবে তাহার মেয়ে কাছে ছিল না বলিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, এই সব কথা হুড় হুড় করিয়া সে বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার এই অত্যন্ত সাধারণ, ঘরের কথায় যে বাহিরের কাহারও কোন কৌতুহল থাকিতে পারে না—এ কথা তাহার মাথায় মোটেই আসে নাই। অন্য সময় হইলে আমিও বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। কিন্তু সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল—আর, বাহিরের প্রভাব নাকি মনকে বড়ই বিষণ্ণ করিয়া দেয়, তাই তাহার সে ঘরোয়া কথাগুলি মন্দ লাগিতেছিল না। আর আমার পার্শ্বে যে বৃদ্ধটি এত ক্ষণ তিন দলের কথা শুনিতেছিলেন, তিনিও তাহার এ গল্পে বেশ মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল।

(৪)

তখন ট্রেণ শ্রীরামপুরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যুদ্ধের কথা যাঁহারা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায় সকলেই পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন; এ দিকে মহার্ঘ জিনিষপত্র সস্তা করিবারও কোনও উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তৃতীয় দলের আলুর চাষওয়ালারাও মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চালনা হইতেছে দেখিয়া বিশ্রামের জন্য নিদ্রার চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দু'একজন আমাদের কথায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গল্পটী তেমন মজাদার হইতেছে না দেখিয়া একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া অভিনিবেশ-সহকারে বিড়ি ধরাইতে আরম্ভ করিলেন।

প্লাটফর্ম্মে বহু লোক ছুটাছুটী করিতেছিল। আমি দেখিয়াছি, রেলগাড়ী দেখিলেই সকলের মনে কেমন এক চাঞ্চল্যের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সবাই

বোঁচকা-বুঁচ্‌কি লইয়া এ গাড়ী ও গাড়ী চড়াও করিতেছে। সকলেরই মুখে চোখে বিপুল উৎসাহ! কিন্তু ওখানে ঐ মেয়েদের গাড়ীর সাম্‌নে, ও কি? মেয়েটি বুঝি এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে, তাই তার বাপ পঁহুছাইয়া দিতে আসিয়াছে। বার বছরের সম্বন্ধ কাটাইয়া এক দিনের পাতা নূতন সংসারে যাইতে হইবে, তাই সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছে। বাপ তাঁর বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া মেয়ের চোখ মুছাইতে চাহেন, কিন্তু তাঁর নিজের চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিয়াছে; অনেক আশ্বাসবাক্য দিলেন; কিন্তু সেগুলির অর্দ্ধেক গলার মধ্যেই রহিয়া গেল, চোখের জল ঠেলিয়া কেমন করিয়া তাহা বাহির হইবে? মেয়েকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াও বাপ নড়িতে চাহেন না। তাঁহার ইচ্ছা সেইখানে দাঁড়াইয়াই সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দেন। কিন্তু হায়! রেল কোম্পানীর কড়া নিয়ম, সেখানে ছয় মিনিটের অধিক ট্রেণ থামিবে না। গাড়ী ছাড়িয়া; দিল তখন তাঁহার কন্যার অশ্রুসিক্ত সেই কোঁচার খুঁটেই নিজের চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন!

(৫)

এরূপ দৃশ্য কত দিন দেখিয়াছি। কিন্তু সেদিন বোধ হয় ঐ বিষন্ন লোকটার সংসর্গে থাকার, আমার মত পাষাণহৃদয় লোকেরও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। আমার পাশের বৃদ্ধটীও এত ক্ষণ ছলছল-নেত্রে ইহা দেখিতেছিলেন। হঠাৎ আমায় তাঁহার দিকে তাকাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশে শ্বশুরবাড়ী মেয়ে পাঠানো এক দুরূহ ব্যাপার! মেয়েরা যদি শ্বশুরঘরই চিরকাল করিবে, তা হ'লে ভগবান তাদের একেবারেই সেইখানে পাঠান না কেন? কিন্তু বাপের বাড়ীর সবাইকে কাঁদানোই বুঝি তাঁর অভিপ্রেত!" এই অবধি শুনিয়াই যে লোকটী গল্প করিতেছিল, হঠাৎ একটু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তবুও আমার চেয়ে ভাল। ও এর পরের ট্রেণে গিয়েই মেয়েকে দেখে আস্‌বে, কিন্তু আমি—হায় মা, তুমি আমায় কোথায় রেখে গেলে?"

আমি বলিলাম, "কেন মহাশয়, আপনার মেয়ের কি হইয়াছে?"

সে বলিল, "তাহার অসুখেই আমি নীরদ ডাক্তারকে ডাকিতে গিয়াছিলাম। সবাই বলিত বাচাল মেয়ে, কিন্তু তখন আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সবাইকে ডেকে একবার দেখাই। আট দিন একাদিক্রমে জ্বর, সেই কচি শরীরে 'বয়লারে'র মত উত্তাপ, তবু বাছার আমার একটু টু শব্দ কেউ শুনিতে পায় নাই। ঐটুকু মেয়ের কত জ্ঞান! রাত্রে তার বড় তৃষ্ণা পাইত, এক দিন তাহার ডাকে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া

খাওয়ায় বিরক্ত হইয়াছিলাম, বোধ হয়, সে তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিল। সে বলিল, "বাবা, তুমি জলের ঘটিটা আমার মাথার কাছে রাখিয়া দাও না, আমি আপনিই লইয়া খাইব।" সে রাত্রে আর আমার ঘুম হইল না; আমি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া কাটাইয়া দিলাম—কেমন করিয়া এই অভাগার রত্নটুকু বাঁচাইয়া রাখিব?

নীরদ ডাক্তার আসিয়া আশ্বাস দিয়া ঔষধপত্র ব্যবস্থা করিয়া গেল। দু'দিন সে বেশ ভাল ছিল। সে দু'দিন তাহার আনন্দ দেখে কে? বোধ হয়, সে আমার দারুণ দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই আমাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, পাঁচ শ রকম করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিন তাহার কত গল্প, কত আবদার, অসুখের পর সে কি কি জিনিষ লইবে তার কত বড় তালিকা! কিন্তু হায় দু'দিন না যাইতে যাইতেই আবার জ্বর। পুনরায় নীরদ ডাক্তারকে আনাইলাম, এবার সেও একটু শঙ্কিত হইল।

সেদিন আমার এক মাসী দেখিতে আসিয়া অনেক দৈব আরোগ্যের কথা বলিয়া গেলেন। রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম যেন বাবা তারকনাথ আমায় পূজা দিতে আহ্বান করিতেছেন। আমি সংকল্প করিলাম, এইবার হত্যা দিতে যাইব, কিন্তু সকালে নীরদ ডাক্তার শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বলিল, "কোনও চিন্তা নাই, আমি ইহাকে সারাইয়া দিব; কিন্তু আপনি এ সময়ে ছাড়িয়া গেলে বিপদ ঘটিতে পারে।" এদিকে লক্ষ্মীর জ্বর বাড়িয়া চলিল। রাত্রে তাহার আগুনের মত গরম গায়ে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে আবার স্বপ্ন পাইলাম। কিন্তু নীরদ ডাক্তার এবারেও আসিয়া বাধা দিল। "সে কি মহাশয়, আপনি বিংশ শতাব্দীর লোক হইয়া এ সমস্ত প্রত্যয় করেন? আর যদি বলেন, বিশ্বাসে অনেক সময় অসুখ সারিয়া যায়, এ সাত বৎসরের রোগীর আবার বিশ্বাস কি? দেখুন, অনেক সময় আমরা ওষুধ দিয়ে সারাই, কিন্তু লোকে একটা মাদুলী-ফাদুলী পরিয়া বলে যে মাদুলীর গুণেই সারিয়া উঠিলাম। আপনি সত্যই যদি তারকেশ্বর যান, তাহা হইলে আমার আশা ছাড়িয়া দিন।" লক্ষ্মী চুপ করিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, সেও বলিল, "বাবা ডাক্তার বাবুর ওষুধে আমার খুব উপকার হচ্ছে, তুমি আর কোথাও যেও না। ডাক্তার বাবু, তুমি বাবাকে কোথাও যেতে দিও না।" আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার গা দিয়ে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। এইটুকু শরীরকে ভগবান এমন করিয়া দগ্ধাইয়া মারিতেছেন! আমি আমার শীতল বক্ষে তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম; বুকের

ভিতরের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল—কিন্তু তাহার উত্তাপের হ্রাস নাই। তখন সে ভুল বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে মাকে সে কখনও চিনিত না, তাহার উদ্দেশে কত প্রাণের কথা বলিতেছে! কি করিয়া যে রাত্রি কাটাইলাম, তাহা মনে নাই। ভোরের বেলায় তাহাকে একটু শান্ত দেখিলাম। সেটা নিদ্রা কি জ্বরের ঘোর জানি না; কিন্তু তখনই একেবারে হাওড়ায় গিয়া তারকেশ্বরের গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম।

বাবা তারকেশ্বরের কাছে হত্যা দিতে চলিয়াছি। দোহাই বাবা অপরাধ লইও না, মোহে পড়িয়া তোমার কথা আগে শুনি নাই। মন্দিরের উঠানে পড়িয়া ভগবান্‌কে একমনে ডাকিতে লাগিলাম—এমন বুঝি আগে কখনও ডাকি নাই। ভগবান্‌ দয়া করিলেন। আনন্দে হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। দু'দিনের মধ্যে বাঞ্ছিত ধন পাইলাম। সেই ক্ষুদ্র শিকড় লইয়া উন্মত্তের মত ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। যাইতে যাইতে দেখি আমার ছোট ভাই যোগেশ আমারই যাইবার পথে আসিতেছে। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, বলিলাম, "আর কোনও চিন্তা নাই, ভাই ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়াছেন, এই দেখ মহৌষধি পাইয়াছি!" আমার হাতে সেই শিকড় দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, "বড় দেরী হইয়া গেল, দাদা—ঔষধ আর কাহার জন্য? লক্ষ্মী আজ সকালে আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে।" দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় ছিলাম, একবিন্দু জলস্পর্শও করি নাই। যোগেশের মুখে এই কথা শুনিবার পর কি হইল, তাহা আমার কিছুমাত্র মনে নাই।

তার পর কতদিন ইচ্ছা হইয়াছে—নীরদ ডাক্তারের গলার টুঁটাটা গিয়া টিপিয়া ধরি; কিন্তু সে শক্তিও আমার নাই—লক্ষ্মী যে আমাকে অক্ষম পঙ্গু করিয়া রাখিয়া গিয়াছে!

এত ক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, আমাদের গাড়ী তখন হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমের মধ্যে ঢুকিয়াছে। আমি দেখিলাম, লোকটীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নীরদ ডাক্তারের প্রতি এ অকারণ ক্রোধের কোনও রূপ প্রতিবাদ করিয়া কোনও লাভ নাই। ট্রেণ থামিলে বলিলাম, "আসুন নামি, কলিকাতায় তো এসে পড়া গেল।" সে বলিল, "মাপ কর ভাই, তোমাদের ধোঁয়ার মধ্যে আর যাইব না। আমি এখানেই বসিয়া থাকি—এ গাড়ী এখনি আবার বর্দ্ধমানে ফিরিয়া যাইবে। আমি আমার লক্ষ্মীমণিকে ভাবিতে ভাবিতে আর একটু ঘুরে আসি।"

———

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনি !"

সম্প্রতি 'সাহিত্যে' শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় 'সাহিত্যে রুচি ও নীতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন ;—

"দেশমাতার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াও কবি (রবীন্দ্রনাথ) নিজের বিকৃত রুচি ঢাকিতে পারেন নাই। বলিতেছেন—

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনি !'

জননীর রূপের কথা কি এমন করিয়া বলিতে আছে ?"

দেখিতেছি, আনাড়ির দল অমরেন্দ্র বাবুর এ মন্তব্য একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। যদিও এদেশে প্রবাদ আছে—

'অবুঝকে বুঝাব কত বোঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥'

তথাপি এই সকল 'অবুঝ'কে বুঝাইতে হয়। কারণ, অবুঝেরা কাগজে কলমে যাহা মনে আসে, তাহাই লিখিয়া পাঠককে প্রতারিত করে।

অমরেন্দ্র বাবুর এই মন্তব্য-সম্বন্ধে একখানা পাক্ষিকে নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্র বাহির হইয়াছে :—

"রবীন্দ্রনাথের বিকৃত রুচির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয়ের (অর্থাৎ অমরেন্দ্র বাবুর) হৃদয় যে নিতান্তই শুষ্ক ও অগভীর তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মা যে আমার সত্যই ভুবনমোহিনী। এ কথা যে তন্ত্রে লেখা আছে। এ কি রবীন্দ্রনাথের কথা ? উপরন্তু মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধ রামপ্রসাদ কি বলিয়াছেন শোন—

'কে রে ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎপুঞ্জ, মণিমরকত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা দৈত্য দলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী।

এই লেখক-পুঙ্গবকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি রামপ্রসাদের এই গানটী পুরা উদ্ধৃত করিলেন না কেন ? গানটীর অর্থ কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন ? উহার ভাব কি তিনি ধরিতে পারিয়াছেন ? পারিলে মূর্খের মত এমন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে এই গানটী সম্পূর্ণ তুলিয়া দিলাম। তাহা হইলে রামপ্রসাদ জননীকে কেন 'মনোমোহিনী' বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"ও কে রে মনোমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্তছলনা, দৈত্যদলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ নয়নী।
শশীখণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে অলকা ঝলকে, নাসা নলকে, বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা রসকূপ, বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুরে দরদা, নিকটে প্রমোদা,
প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে
বল জননী॥"

চণ্ডীতে যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের কাহিনী আছে, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া এই গীতটী রচিত হইয়াছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহাবল দৈত্য। তাহারা একযোগে যুদ্ধ করিলে দেবগণের রক্ষা নাই বুঝিয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার জন্য জননী মহেশ্বরী মায়া করিয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এ মূর্ত্তি মায়া-মূর্ত্তি; জননীর প্রকৃত স্বরূপ নহে। এই মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া অবশ্য শুম্ভ-নিশুম্ভের মাতৃমূর্ত্তির কথা মনে আসে নাই; আসিতে পারে না। এই চিত্ত-ছলনা 'প্রমোদা'কে দেখিয়া, ইঁহার 'সুধারসকূপ' 'বদনখানি' দেখিয়া উহারা রূপ-মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। রামপ্রসাদ সাধকশ্রেষ্ঠ, কবি-শিরোমণি; তাই দৈত্যেরা যে দৃষ্টিতে জননীর মোহিনী মায়ামূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভক্তগণকে বলিতেছেন,—এই মূর্ত্তি দেখিয়া তোমরা বিচলিত হইও না। এ মূর্ত্তি—মায়ামূর্ত্তি; প্রকৃত স্বরূপ নহে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিও না। আমি ইঁহার স্বরূপ চিনিয়াছি। ইনি ব্রহ্মময়ী, করুণাময়ী, ইঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন কর।

রামপ্রসাদ 'মনোমোহিনী' লিখিয়াছেন বলিয়া জননীকে 'মনোমোহিনী' সম্বোধন করিতে হইবে,—এমন কোনও আইন নাই। আনাড়িদের ঘটে এ সহজ বুদ্ধিটুকুরও অভাব। আগে গানের অর্থ ভেদ কর, উহার উদ্দেশ্য বুঝ, তাহার পর বলিও,—কেন রামপ্রসাদ জননীকে 'মনোমোহিনী' লিখিয়াছেন? মায়ারূপধারিণী মনোমোহিনী রামপ্রসাদের জননী—তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভের কে? তাহারা দৈত্য বৈ ত নয়।

জগন্মাতাকে যদি বা ভুবন মনোমোহিনী বলা যায়, দেশমাতাকে কিছুতেই তাহা বলা চলে না। ঘরের মাতাকে এ কথা বলিতে যেমন আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয়, দেশমাতার সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণ প্রয়োজন করিতেও তেমনই বাধে; কারণ যিনি জগন্মাত, তিনি বিশ্বের সকল প্রাণীরই জননী; কিন্তু যিনি দেশমাতৃকা, তিনি কেবল আমার দেশবাসীর জননী। তিনি চীন-হুন-দাদ্-জাপের জননী হইতে পারেন না। কাজেই দেশমাতাকে 'ভুবনমনোমোহিনী' বলিলে বিকৃত রুচির পরিচয় দেওয়া হয় বৈ কি।

একটা সহজ উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি। 'দেবী চৌধুরাণী'র এক স্থলে আছে,—

"ব্রজেশ্বর।—আমার যাইবার ইচ্ছা হইতেছে, তোমাদের রাজরাণী একটা দেখিবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না যুবতী?

রঙ্গরাজ। তিনি আমাদের মা, সন্তান মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্রজেশ্বর। শুনিয়াছি, বড় রূপবতী।

রঙ্গরাজ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।"

কৈ রঙ্গরাজ ত এখানে ব্রজেশ্বরের কথার উত্তরে বলিতে পারিল না—"মা আমার ভুবনমনোমোহিনী"। কিন্তু এ সব কথা বুঝাইব কাহাকে? যাহারা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হয়, তাহাদের মস্তিষ্ক বলিয়া জিনিষ ত নাই।

পল্লী-ইতিহাস।

'কেশিয়াড়ি।'*

বাঙ্গালা সাহিত্যে পল্লী-ইতিহাসের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু কিছুদিন হইতে পল্লী-ইতিহাসের রচনার দিকে শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পল্লীর ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহা যে শুভ লক্ষণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পল্লীই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব। কাজেই বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে পল্লীর দিকেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। নিভৃত বঙ্গ-পল্লীর ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত শিলালিপি ও চিত্রাদি হইতে, ভগ্ন দেউল, মসজেদ ও সমাধিস্তম্ভ হইতে আমাদিগকে দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক পল্লীর কিম্বদন্তীতে উহার সমাজ, শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। এ সকল কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিতে হইবে। পল্লীর পুরাতন বনিয়াদী সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের গৃহে প্রাচীন পল্লী-শিল্পের পরিচায়ক বহু দ্রব্য এখনও বিদ্যমান। কাহারও গৃহে বলির খড়্গ আছে, সেকালের ব্যবহৃত তৈজসপত্র আছে, সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড আছে, লাঙ্গলের ফলা আছে, চরকা আছে—এ সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য অভিনিবেশ-সহ পরিদর্শন করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্প—কর্ম্মকার, কাংস্যকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীদিগের কারু-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেশিয়াড়ি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এক সময়ে এই অঞ্চল বয়ন-শিল্পে প্রখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এখানে উৎকৃষ্ট তসর ও পট্টবস্ত্র তৈয়ারী হইত। আলোচ্য পুস্তকের এক স্থল হইতে আমরা এই শিল্পের পরিচয় পাঠকগণকে প্রদান করিলাম :—

"বহুকাল হইতেই কেশিয়াড়ি তসর ও পট্টবস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ডবলিউ ক্লেভল্ নামক ইংরেজ বণিক্ তাঁহার বাণিজ্য-সম্পর্কীয় কাগজে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—"বালেশ্বরে ইংরাজের একটী কুঠী ছিল। সেই কুঠীর সহিত

---

* কেশিয়াড়ি—শ্রীরাধানাথ পতি বি এল প্রণীত। মেদিনীপুর জজকোর্ট হইতে শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র দাশ বি এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কেশিয়াড়ির তসর মহাজনগণের বাণিজ্য চলিত।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, কেশিয়াড়ির জল তসর কাপড় রং করিবার উপযোগী এবং ঐ জলে রং দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এখানে আটশত হইতে নয়শত তন্তুবায় পরিবার বস্ত্র-বয়নে নিযুক্ত ছিল। এখানকার তসর পণ্য, এমন কি, পূর্ব্বে চীন, জাপান ও পশ্চিমে ইউরোপখণ্ডেও পরম সমাদরে গৃহীত হইত। এখানকার তসর বিক্রয়ের বিস্তৃত বিপণিতে দূরবর্ত্তী মান্দ্রাজ, কোইম্বাটুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের, এমন কি, সুদূর ফরাসী তুরস্ক দেশের বণিকগণও সর্ব্বদা তসর রেশম ক্রয়ার্থ আসিয়া বাস করিতেন।

লেখকের বাল্যকালে তাহাদের বাটীতে ইদৃশ খাঁ নামক মান্দ্রাজের এক মহাজন আসিতেন। তিনি প্রতি মাসে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একগজ চওড়া পাতলা তসরের থান, মান্দ্রাজী পাগড়ীর জন্য চালান দিতেন। তাঁহার সহিত কোইম্বাটুরের একজন মহাজন অংশীদার ছিলেন। বহরামপুরে পদ্মনাভ চৌধুরী নামে একজন মহাজন ঐ সময় প্রায় কুড়ি হাজার টাকার তসর কাপড়ের কারবার এইখানে থাকিয়া চালাইতেন।"

এখন আর সে দিন নাই, তন্তুবায়ের সংখ্যা এখন কমিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"হাসিমপুর গ্রামের একটী পুষ্করিণীর উপর পশ্চিমে এক স্থানে প্রায় এক শত ঘর বাঙ্গালী তাঁতি বাস করায় সেই পাড়াটীকে লোকে 'বাঙ্গালী সাই' বলিত। এখন সেই পাড়াতে ৪।৫টী তাঁতি জাতীয় পরিবার বাস করে। কিন্তু তাহাদের আর সেই জাতীয় ব্যবসা নাই। তাহারা কেবল কয়েক বিঘা জমি ও দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে অন্নসংস্থান করিতেছে।"

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ শিল্প—বয়ন-শিল্পের অধঃপতনের কাহিনী পল্লীর ইতিহাস আলোচনায় পাওয়া যায়। এ কাহিনী পড়িলে চোখ ফাটিয়া যেন রক্ত বাহির হয়।

আমরা 'কেশিয়াড়ি' পাঠ করিয়াছি। এই শ্রেণীর পুস্তক প্রত্যেক জেলা হইতে, প্রত্যেক পল্লী হইতে বাহির হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস-সঙ্কলন দুষ্কর হইবে না।

অর্ঘ্য

৭ম বর্ষ } পৌষ, ১৩২৩। { ৯ম সংখ্যা

নানা-কথা।

দেখিয়া সুখী হইলাম, আমাদের ঔষধ কতকটা ধরিয়াছে। 'ভারতী' এবার একটু ভদ্র হইয়াছে। তবে এখনও ভদ্রসমাজে বাহির হইবার উপযোগী হয় নাই। লেখায় গালাগালির মাত্রা কমিয়াছে বটে, কিন্তু 'আর্টে'র দোহাই দিয়া যে 'চ্যুত কমল'* বাহির হইয়াছে, তাহাতে উহাকে ঘরে রাখা দায়। জিজ্ঞাসা করি,—"কলমে যাহা প্রকাশ পায়, সেই অশ্লীলই কি অশ্লীল? তুলিতে যাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, এবং সাক্ষর ও নিরক্ষর সকলেরই চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া সর্ব্বনাশ করে, তাহা কি? অশ্লীল না সুশ্লীল? এমন ছবির খেউড় সুরুচি না কুরুচি? সচল না অচল? ইহা ঠাকুর বাড়ীর গায়ে আঁকা হইলেও ভদ্রসমাজের দর্শনযোগ্য কি না? নারীসমাজকে তাহা দেখাইয়া মনুষ্যসমাজে থাকা চলে কি না? এমন সাংঘাতিক কলা-কৌশলের ফেরি—পয়সা আনিতে পারে।—কিন্তু তাহা সাবাস-যোগ্য, না চাবুকের যোগ্য"? †

* * *

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে 'অশ্লীলতা-নিবারিণী-সভা'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সভার উদ্যোগী ছিলেন, তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় মুরুব্বিরা; কাগজে, কলমে ও বক্তৃতায় তাঁহারা সুরুচি ও শ্লীলতার প্রচার করিতেন। তাঁহাদেরই বংশধরেরা আজ তাঁহাদেরই কাগজে তাঁহাদের সেই মহৎ উদ্দেশ্যের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন। 'প্রবাসী' থিয়েটারের নাম শুনিলে এখনও মূর্চ্ছা যান; গিরিশ ঘোষের নাম মুখে আনিতে 'প্রবাসী' সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু 'ভারতী'র এই বেয়াদবি, নির্লজ্জতা নির্ব্বিবাদে

---

* অগ্রহায়ণের ভারতী—৮৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

† নায়ক।

হজম করিতেছেন। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ইঁহারা সাহিত্য গড়িবেন, গুরুগিরি করিবেন,—বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে! এদেশের পাঠকেরা যদি এ বিষয়ে একটু অবহিত হন, তাহা হইলেই আমাদের এই চীৎকার সার্থক হইবে। সেই আশায় বারম্বার একই কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে।

* * *

ব্রাহ্মণ-কবি মুকুন্দরাম কেবল যে ব্রাহ্মণের ষট্ কর্ম্ম—অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ করিতেন, তাহা নহে; মনুর নির্দ্দেশমত কৃষিকর্ম্মও করিতেন। সেকালে ব্রাহ্মণ এই ষট্ কর্ম্ম ব্যতীত কৃষিকর্ম্মও করিতেন; কিন্তু শ্ববৃত্তি বা চাকুরী দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন না। গত শ্রাবণ সংখ্যার 'কৃষি-সম্পদে' শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ লিখিয়াছেন:—"অধুনা আমরা শ্ববৃত্তি বা কুক্কুরবৃত্তিরই দাস হইয়াছি। প্রাচীন সময়ে প্রমৃত অর্থাৎ কৃষিবৃত্তিই যে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাহা কৃষি-প্রিয় প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম তৎপ্রণীত 'চণ্ডীকাব্যে' মহানন্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন:—

"ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস,
বিফল জনম তার নাহি যার চাষ।"

ইহা হইতেই উপলব্ধি হইতেছে যে, মুকুন্দরামের সময়েও কৃষিকার্য্যের আশ্রয় ব্যতীত কোনও গৃহস্থেরই সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না। ব্রাহ্মণ-কবি মুকুন্দরাম, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতে বসিয়াও, আপন বংশের মর্য্যাদা-বৃদ্ধির জন্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন:—

'সহর সেলিমাবাদ, তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাষ-চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।"

মুকুন্দরামের সময়ও যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ স্বহস্তে হাল চাষ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন, কৃষক কবি মুকুন্দরামের উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। এ যুগে যাঁহারা সাহিত্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-কবির এই স্বাধীন বৃত্তির কথা মনে রাখিলে ভাল হয়। সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া কথায় কথায় বড় লোকের মোসাহেবী বা উদরান্নের জন্য তাঁহাদের উমেদ্দারী করা আজকাল এক শ্রেণীর

সাহিত্যসেবীর পেশা বা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রোগে যাহা-দিগকে ধরিয়াছে, সাহিত্য-সম্বন্ধে কোনও নির্ভীক অভিমত প্রদান করিতে তাহারা পারে না। এই শ্রেণীর সাহিত্য-সেবীদিগের নিজস্ব মত নাই ; কেবল শানাইয়ের পোঁ ধরিয়া বেড়াইতেছে ; কখনও জোয়ারের উচ্ছ্বাসে, কখনও ভাঁটার টানে ভাসিতেছে। ইহাদের জন্যই সাহিত্যের হাটে আজকাল এত মেকী চলিতেছে।

* * *

"প্রবাসী" তাহার 'পুস্তক-পরিচয়ে' প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। স্যর রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' নামক গল্পের বহির সমালোচনা-প্রসঙ্গে সে লিখিয়াছে,—"রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন বৎসরে বৎসরে আপনার নূতন রূপকে অতিক্রম করিয়া নূতনতর হইয়া আসিয়াছে, গল্পও সেইরূপ। সাধনা ও ভারতীর যুগের গল্প একরূপ, প্রবাসীর যুগে অন্যরূপ, আবার ভারতীর যুগে আরেকরূপ, সবুজপত্রের যুগে অপরূপ!"—সাবাস্! বাঙ্গালা সাহিত্যে যে এতগুলা যুগ আছে, তাহা আমাদিগের জানা ছিল না। 'প্রবাসী' চারিযুগের কথা বলিয়াছে ; কিন্তু কোন্ যুগে রবীন্দ্রনাথ কেমন ভাবে লীলা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলে নাই। আমাদের দেশে এক এক যুগে এক এক অবতার তাঁহাদের লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন ; কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথ চারি যুগ ব্যাপিয়া একই ক্ষেত্রে নানা খেলা খেলিয়াছেন ; সাবধান! আর কেহ রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিতে পারিবেন না। তিনি ঋষি নহেন, যোগী নহেন, পরমহংস নহেন ; এমন কি রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধও তাঁহার 'নাগাল' পান না। তিনি যুগে যুগে অবতারের 'নূতন রূপকে অতিক্রম করিয়া নূতনতর হইয়াছেন!' কিন্তু এ অবতারের লীলামাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে কে? 'প্রবাসী'র কোন্ ব্যাস-বাল্মিকী, 'ভারতী'র কোন্ পুরাণকার এ অবতারের কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করিবেন?

* * *

হিন্দু-বিধবাদিগের সংখ্যার দিকে 'প্রবাসী'র এত দৃষ্টি কেন? মাঝে মাঝে দেখিতে পাই, 'প্রবাসী' হিন্দু-বিধবার তালিকা লইয়া ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত কেন বলি, সেই সঙ্গে 'প্রবাসী'র চক্ষে 'সাঁতার-পানি' বহিতেও দেখা যায়। কিন্তু পরের কথা লইয়া ব্যস্ত হইবার আগে, ঘরের তালিকাটা একবার দিলে ভাল হয় না কি? পরের জন্য রোদন ভাল ; কিন্তু রোদনের যে কারণ, সে কারণের

অস্তিত্ব কি তাঁহাদের সমাজে নাই? তাঁহাদের ঘরে পনের হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বয়সের কত কুমারী আছে, তাহাদের সংখ্যা জানাইলে আমরাও একবার রোদন করি। তোমাদের সহানুভূতি চিরদিন সহিয়াই আসিব, প্রতিদান করিতে কি ইচ্ছা হয় না?

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।

[স্বর্গীয় ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়।]

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন বড়ই সুন্দর, বড়ই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন তাঁহার সাহিত্য-জীবনমূলক; অপিচ সাহিত্য-জীবন তদীয় ছাত্র-জীবন হইতেই আরম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্রের "ললিতা" এবং "মানস" নাম্নী কবিতাদ্বয় তাঁহার ছাত্রজীবনে লিখিত ও প্রকাশিত হয়; তখন তাঁহার বয়ক্রম পঞ্চদশ বর্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এ কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব "ললিতা" ও "মানস" তাঁহার "ত্রয়োদশ" বা "চতুর্দ্দশ" বর্ষে লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের ভ্রম।

পঞ্চদশ হইতে দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের মধ্যে "ললিতা" ও "মানস" ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ও অনতিক্ষুদ্র গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহাদের কতক প্রকাশিত হয়, কতক প্রকাশিত হয় না; যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার একখানি ইংরাজী উপন্যাস (Rajmohan's wife) "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। "দুর্গেশনন্দিনী"ও লিখিত হয় এই সময়ে;—প্রকাশিত হয় দুই বৎসর পরে। "কপালকুণ্ডলা" লিখিত ও প্রকাশিত হয় "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হওয়ায় দুই বৎসর অতীত হইলে। "মৃণালিনী" লিখিত হয় কপালকুণ্ডলার তিন বৎসর পরে; প্রকাশিত হয় আরও দুই বৎসর পরে।

"দুর্গেশনন্দিনী" "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী"—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ গদ্যকাব্যত্রয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পা-

দিত সুবিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের পূর্ব্ব ব্যাপার ; বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যযুগ আবির্ভাবের অগ্রগামী সূচনা। "বঙ্গদর্শন"-প্রবর্ত্তন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে, বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যযুগের আরম্ভ। পরন্তু 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রকাশ হইতেই এক দিকে সাহিত্যানুশীলন-মূলক ধর্ম্মের ও অপর দিকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-সূচক আন্দোলনের আরম্ভ হয়। 'নবজীবন' ও 'প্রচার', উভয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম্ম বক্ষে করিয়া বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালাভাষায় সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে সনাতন ধর্ম্ম আকৃষ্ট বা আনয়ন করিয়াছিলেন ; ইহা বঙ্কিম চন্দ্রের শত্রু মিত্র (যদি কেহ শত্রু থাকেন) সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য ; কেন না ইহা চাক্ষুষ-দৃষ্ট ঐতিহাসিক কথা ; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিগত ১০।১২ বৎসরের লিখিত বা অলিখিত ইতিহাসের অক্ষরে অক্ষরে ইহা অঙ্কিত। যৎকালে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে সনাতন ধর্ম্ম আকৃষ্ট হয়, আমরা ঠিক সেই সময়েই এ সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিয়াছিলাম ;—"কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের বেল, মল্লিকা, গোলাপ, চামেলিতেও নাস্তিকতা সন্দেহবাদের দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ সেই সব সুন্দর ফুল হইতে হরিনামের সুমিষ্ট সৌরভ ছুটিতেছে। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিতমাত্রেই সংঘটিত হইয়াছে" ইত্যাদি।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য স্বতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সাল হইতে। "বঙ্গদর্শনে"র ইতিবৃত্ত এবং "বঙ্গদর্শনে"র সহিত বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা সবিস্তারে বলিতে গেলে স্বতন্ত্র সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। অতএব সে কথা আমরা এখানে কিছুই উল্লেখ করিব না। উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাই পুনঃরুক্ত করিয়া বলিতেছি যে, "বঙ্গদর্শন" দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহার পূর্ব্বে আমাদের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন সাহিত্য ছিলই না ; সমালোচনা, সাহিত্যমূলক সমালোচনা এবং সমালোচনা-মূলক সাহিত্য আদৌ ছিল না। পক্ষান্তরে, আজ আমরা অলি-গলিতে এবং অজ পাড়াগাঁয়ের অত্যন্ত অজ্ঞাত পল্লীতে এত এত উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট, উত্তম ও মধ্যম, অধম এবং অধমাধম সাহিত্য-সন্দর্ভবাহী মাসিক পত্র দেখিতেছি ; 'বঙ্গদর্শন' হইতেই এই সাহিত্য-রক্তবীজ-বংশের উৎপত্তি।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হওয়ার পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত বঙ্কিম বাবুর যে সকল ঔপন্যাসিক কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ, তাহাদের মধ্যে (বোধ হয়) কেবল

"দেবী চৌধুরাণী" ব্যতীত আর সমস্তই "বঙ্গদর্শনে", "নবজীবনে" ও "প্রচারে" প্রথম বাহির হয়।

উপরোক্ত গ্রন্থনিচয়ের পর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর নাম ও রচনা-কাল-সম্বলিত একটী স্থূল সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থ-রচনা বা প্রকাশ-কাল।—বিষবৃক্ষ—১২৭৯ সাল। ইন্দিরা—১২৭৯ সাল। চন্দ্রশেখর—১২৮০ সাল। যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ সাল। রজনী—১২৮১ সাল। কমলাকান্ত—১২৮১।৮২ সাল। কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮৪ সাল। রাজসিংহ—১২৮৫ সাল। মুচিরাম গুড়—১২৮৭ সাল। আনন্দমঠ—১২৮৭।৮৮ সাল। দেবী চৌধুরাণী—১২৮৯ সাল। 'প্রচার' প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে।

'সীতারাম' 'প্রচারে' প্রথম বাহির হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' আরম্ভ হয় "নবজীবনে" ও 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আরম্ভ 'প্রচারে'; পরে এই দুই গ্রন্থই পুস্তকাকারে পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণচরিত্র' দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বাহির হইয়াছে। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'রও শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু আমূল সংস্কার ও সংশোধন করিয়া নূতন পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনঃ মুদ্রিত আরও কয়েকখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থের নাম করা উচিত; যথা "বিজ্ঞানরহস্য" "লোকরহস্য" "কবিতা পুস্তক" "প্রবন্ধ পুস্তক" এবং "বিবিধ সমালোচনা।" "সাম্য" 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাহার প্রচার নাই। গ্রন্থকারের মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচার একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। 'প্রচার' পত্রে গীতার অতি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পাণ্ডুলিপিও বোধ হয় লেখক সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সংক্ষেপতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—এই ১৮ খানা গ্রন্থের কোন একখানিরও অতি অল্পমাত্র সমালোচনাও এ স্থলে সম্ভবে না। তাহার প্রয়োজনও নাই। এতাবৎ কাল শত্রু মিত্র অনেকেই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়াছে;—যত কাল সাহিত্য থাকিবে তত কালই করিবে। অতএব এ স্থলে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, এই গ্রন্থাবলীর কোনও একখানি লিখিলেও গ্রন্থকার প্রশংসাভাজন ও চিরস্মরণীয় হইতে

পারিতেন, কোনও একখানি পূর্ণ গ্রন্থই বা কেন? কোনও একখানি গ্রন্থের কোনও একটি প্রবন্ধেই তাঁহার প্রশংসা চিরস্থায়ী হইতে পারিত। 'বিবিধ সমালোচনে'র এক 'উত্তর রামচরিতের সমালোচনা'টী যে কোনও লেখকের সাহিত্য-সম্ভ্রম সৃষ্টি ও সংরক্ষা করিতে সমর্থ।

'কবিতা পুস্তকে'র কোনও একটী কবিতা যে কোনও কবির কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে। এক "বন্দে মাতরং" সঙ্গীত সংসারে সম্মান-প্রতিপত্তিপ্রদান পক্ষে প্রচুর। কাব্য-বিজ্ঞান-দর্শনময়, রসরসিকতা-মৌলিকতাময় অপূর্ব্ব কমলাকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' দশ জন লেখকের সুনাম সংগঠন করিতে পারে। অতএব উপরোক্ত এতগুলি অত্যুচ্চ শ্রেণীর উপাদেয় গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কি অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল অনুভবনীয়। এই গ্রন্থাবলী হইতে সর্ব্বথা সংযতচিত্তে জ্ঞান শিক্ষণীয়; উহা অসংযত উদ্দামভাবে সমালোচনীয় নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আবশ্যকতার অনুরোধে সময়ে সময়ে তাঁহাকে ইংরেজীও লিখিতে হইত। ইংরেজীতেও তাঁহার অসাধারণ লিপি-শক্তি ছিল। উপরে আমরা তাঁহার ইংরেজী নবেলের নামোল্লেখ করিয়াছি। পরন্তু তল্লিখিত বিস্তর ইংরেজী প্রবন্ধও আছে। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে,—প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যাধার প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় পাদ্রী রেবারেণ্ড হেষ্টীর হিন্দুধর্ম্ম-আক্রমণের উত্তরে, 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রে 'রামচন্দ্র'-স্বাক্ষরিত প্রবন্ধাবলী বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী লিপিনৈপুণ্য ও রচনাতৎপরতার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতবর স্বয়ং হেষ্টী এই প্রবন্ধাবলী দৃষ্টে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। লিপি-সংগ্রাম-শেষে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তা' বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ইহা বড় কিছু বেশী কথা নয়।

সরকারী কার্য্যে সারাদিন খাটিতে হইত। সেই অপরিমিত শ্রমের মধ্যেও সামান্য মাত্র সময়ে এতগুলি মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, তাঁহার রচনাশক্তি কি অসাধারণ ক্ষিপ্র ছিল! এক এক বৎসরে দুই দুইখানি গদ্যকাব্য; তাহা ভিন্ন অগণিত প্রবন্ধ! "রাসালাস" লিখিতে জনসনের তবুও কয়েক দিন সময় লাগিয়াছিল, বঙ্কিম বাবু কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে 'ইন্দিরা' লিখিয়াছিলেন।

সাহিত্য-জীবন ; ধর্ম্ম-নীতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন এবং তাঁহার সাহিত্যমূলক জীবন সম্বন্ধে আমরা

পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন যাহা বলিয়াছিলাম, এখনও ঠিক তাই বিদ্যমান। অতএব আমাদের তখনকার কথা এখন পুনরুক্ত করা যাইতে পারে।

উপরেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের বিকাশ অতি পরিপাটী। স্তরে স্তরে উহার বিকাশ; বিকাশ সর্ব্বথা একই অনুশীলোন্নতির দিকে অগ্রসর এবং অনুশীলোন্নতির যাহা চরম লক্ষ্য অবশেষে তথায় যাইয়া উপস্থিত। প্রতাপ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র "An apostle of culture. বহুদিন পূর্ব্বেই আমরা একখানি পুস্তকে এ কথা সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-জীবন এতদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবন ইহা হইতে উদ্ভূত এবং ইহারই দ্বারা পালিত, বর্দ্ধিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্ম্ম সর্ব্বথা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচার করেন substance of religion is culture. তৎপ্রচারিত এই অত্যুচ্চ উক্তি তাঁহার নিজের সাহিত্য-জীবনে অতি সুন্দররূপেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে সাহিত্যের অবিমিশ্র ক্ষেত্র হইতে গৌণকল্পে যেমন ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি সাহিত্যালোচনার দ্বিতীয় স্তর হইতে প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রচারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ দেখুন বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা। এই রচনা সাহিত্যাংশে খুব অস্ফুট। রচয়িতা নিজেই বলেন উহা অপাঠ্য, উহা হেঁয়ালি। কিন্তু উহা অপাঠ্য বা হেঁয়ালী হউক, আর উহা "পুস্তকবিক্রেতার আলমারি"ই হউক, উহাতে এমন এক আধ কণিকা দ্রব্য আছে, যাহা প্রতিভার পূর্ব্ব-পরিচায়ক। পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক বঙ্কিমের 'ললিত' নামে গল্পটীতে বেশ একটু নাটকীয় শক্তির আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অস্পষ্ট অমিষ্ট বাল্য-রচনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা রচয়িতার মানসিক অবস্থা। বাল্যকালের রচনায় নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সমন্বিত করা গ্রন্থকার মাত্রের স্বাভাবিক। বালক বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম রচনা 'ট্রাজিডি'! রসিকচূড়ামণি তরুণ বয়সে তরল রসের ছড়াছড়ি না করিয়া 'শেষের সে দিন' ভাবিতে বসিয়াছিলেন, ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। বাল্যা-বস্থাতেই বঙ্কিমের মন সংসারের অসারতা অনুভব করিয়া "ললিতা-মন্মথে"র প্রণয় ও তাহার পরিণাম-বর্ণনা-স্থলে বলিল;—

মানবের কি কপাল সংসার কি চায়।
বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর।

পরন্তু—এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ,
জানিবে না শুনিবে না, কাঁদিবে না কেহ।

এ গভীর মত তখন সম্পূর্ণ রূপে স্থির হইয়াছিল কি না নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু মত স্থির না হইলেও মনের গতি যে দিকে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

পরন্তু জীবনে, গুরুশিষ্যের কথোপকথনে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন ;—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন উহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। অনেক পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।" ইত্যাদি।

এই পরিশ্রমের মুখ্য ও গৌণ ফল কি, তাহা বঙ্কিমের বঙ্গীয় পাঠক জ্ঞাত আছেন; পরন্তু ইউরোপীয় সমাজেও তাহা অল্পাধিক বিবৃতি লাভ করিয়াছে।

জীবন লইয়া কি করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে জীবন ঢালিলেন। সাহিত্যের সমগ্র ভূমি বেড়িয়া প্রাণপণ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। জীবনে অনেক পরীক্ষা, অনেক শিক্ষা হইল। অনেক পথ, অনেক মত দেখিলেন। স্বভাবদত্ত সৌন্দর্য্যস্পৃহা সুকুমার সাহিত্যের দিকে তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। স্বভাবোপযোগী ক্ষেত্র পাইয়া প্রতিভা প্রস্ফুট হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্য প্রচার করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হউক সৌন্দর্য্যের পর পৃষ্ঠা ধর্ম্মও প্রচারিত হইল। দুর্গেশ নন্দিনী হইতে রজনী পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি কাব্য, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

বড় একটা ধর্ম্মকথা না থাকিলেও, তদ্দ্বারা গৌণকল্পে ধর্ম্মনীতিই প্রচারিত হইয়াছে। তবে এ কথা অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বটে; কিন্তু কোন কথাই বা অনেকে বুঝিয়া থাকে? ফলতঃ বঙ্কিমের যে কিছু সৃষ্টি—নগেন্দ্র দেবেন্দ্র হইতে প্রতাপ চন্দ্রশেখর এবং রোহিণী শৈবলিনী হইতে সূর্য্যমুখী প্রফুল্লমুখী পর্য্যন্ত 'কু' 'সু' যাহা কিছু, সমস্তেরই উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি রসের ঢল ঢল ঢেউ হইতে গাম্ভীর্য্যের অতলস্পর্শী দৃশ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু, তাহার একই মাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোন্নতি। এখন স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে কি যে, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তোন্নতিই ধর্ম্ম?

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গসাহিত্যের নবীন সংস্কার ও নবযুগোৎপাদন করার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুকাল বিশ্রাম। কিন্তু এই বিশ্রাম পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা বলিয়াই বোধ হয়। এই বিশ্রাম বা পরিশ্রমের ফল অনেক। আর সে ফল বঙ্কিমের শেষ জীবনে বঙ্গসাহিত্যে নানা আকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যের খাস অধিকার হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যাগমনের প্রথমাভাস 'আনন্দমঠে'। 'আনন্দমঠ' অনেকটা আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমবাবুর রাজনীতির ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তিস্থল কোথায় তাহা 'আনন্দমঠে' বেশ দেখিতে পাই। জননী জন্মভূমির জন্য কবি-হৃদয় যে কিরূপ কাতর, কিরূপ উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত তাহা "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতে পাঠ করি। 'আনন্দমঠে' যাহার আভাস, 'দেবী-চৌধুরাণী'তে তাহার প্রকাশ। যে নিষ্কাম কর্ম্ম চন্দ্রশেখরে অঙ্কুরিত, প্রফুল্লমুখীতে তাহা বিস্ফারিত; পরিণাম তাহার ধর্ম্মে,—সে ধর্ম্মও কিন্তু সাহিত্য। সাহিত্যের ধর্ম্মপরিণামের প্রথম সোপান 'আনন্দমঠ', দ্বিতীয় 'দেবী-চৌধুরাণী', তাহার পর 'প্রচারে' সে পরিণাম সম্পূর্ণ পূর্ণ। 'প্রচারে' ধর্ম্ম-প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল অতি উপাদেয় সাহিত্য। বেদব্যাখ্যা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। 'কৃষ্ণচরিত্রে' মহাভারত-সমালোচন সুকুমার সাহিত্যেরই অন্তর্গত।

বঙ্কিমবাবু ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়া কোন পথে গিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি কি? দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ধর্ম্ম সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত কি না? এই কথা বুঝান প্রথম কল্পে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম্মের বিবিধ ভাগ বিভাগ শাস্ত্রের স্তরে স্তরে সমালোচনা করিয়াছিলেন। সে সমালোচনা শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক, তাহার ফল ভবিষ্যতে যাহাই দাঁড়াক,

উহা যে আমাদের সাহিত্যের যৎপরোনাস্তি উপকার ও পুষ্টিসাধন করিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বঙ্কিমে আমরা সাহিত্য-মূলক ধর্ম্ম দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন খুব একটা প্রকাণ্ড নয়। উহা দিগ্‌গজ পাণ্ডিত্যের ও অগাধ গবেষণার আধারও নয়; উহা হইতে অন্ধকারময় স্তূপাকার গ্রন্থাবলীও উৎপন্ন হয় নাই;—কিন্তু উহা বড় স্বাভাবিক। বঙ্কিম অপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত বঙ্গসাহিত্যে থাকিতে পারেন, তাঁহার অপেক্ষা জেয়াদা জ্ঞানবান গ্রন্থকার ও লম্বা চওড়া কবিও বঙ্গসাহিত্যে থাকিতে পারেন। বঙ্কিমবাবু হয় ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়েই কম। কিন্তু তা' যাহাই হউন, তিনি একটা সাহিত্যের স্রষ্টা, সংস্কারক, এবং পরিচালক; এ তিনই। প্রমাণ অগ্যকার বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ও উহাদের উপর বঙ্কিমের নামাঙ্কিত বঙ্কিমের হাতের স্পষ্ট পরিষ্কার ছাপ। এ ছাপ যে দিন হইতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উপর পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই উহার মূর্ত্তি ফিরিয়াছিল। সেই দিন হইতেই উহাতে শ্রী, সৌন্দর্য্য, শক্তি ও স্ফূর্ত্তি স্বতঃপ্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে;—আর সেই দিন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে উহার কিঞ্চিৎ আদরও হইয়াছে!

উপর উপর যাহারা দেখে, তাহারা বলে, "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অধিক আর কি করিয়্যছেন, কয়েকখানি নবেল উপন্যাসের 'বই' লিখিয়াছেন বৈ ত নয়? সেই উপন্যাস গল্প কয়টা না হয় খুব ভালই হইয়াছে, পড়িতে বেশ মিষ্ট লাগে, ইহার অধিক আর কি? বড় জোর বঙ্কিমবাবু এক জন দক্ষ উপন্যাসলেখক-নবেলিষ্ট।"

হাঁ তা বটে! নবেলিষ্টই বটে। কিন্তু এই নবেলিষ্টের লেখনীতে যে একটা জিনিস ছিল আর যে জিনিসটার দ্বারা আমাদের সাহিত্যটা শাসিত ও প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ; তাহা দেখিবার দৃষ্টিশক্তি কি তোমাদের আছে? যদি না থাকে, তবে দশ সহস্রবার দেখাইয়া দিলেও ত দেখিতে পাইবে না। অতএব অন্ধের জন্য পণ্ডশ্রম আমরা কেন করিব?

সুন্দর-দর্শনে।

[শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।]

গিয়াছিনু আলিপুরে পশু দেখিবার তরে,—
এই কথা জানে সব জনে।
তা'রা ত জানে না আমি দেখেছি আমার স্বামী
কত রূপে বিচিত্র বরণে।
চিকণ বরণচ্ছটা স্ফীত কেশরজটা
দীপ্ত আঁখে মরকত-মণি!
মরি কিবা ক্ষীণ মাঝা, বনে সে পশুর রাজা,
কিবা গুরু চলন বলনি।
জলভরা মেঘসম গরজন মনোরম
(শুনে) চমকিত হৃদয়-শিখিনী—
শৃঙ্গে শৃঙ্গে জাগে প্রতিধ্বনি।

(কোথা)

সজল তরল আঁখি সচকিত থাকি থাকি
কা'র ভয়ে চৌদিকে নেহালে,
শৃঙ্গ-মুকুটধর তনু তার তনু-বর!
দীর্ঘাপাঙ্গে মাধুরী উছলে!
সে মাধুরী প্রিয় অতি বিমুক্ত-বিশিখ-গতি,
রূপে তার মুনি-মন টলে!

(কোথা)

কমল-কোরক-নিভ অমল-ধবল-গ্রীব,
বাঁকাইয়া চলে শির তুলে,
কিবা সে চলন-ভঙ্গী চারু-সন্তরণ-রঙ্গী!
(যেন) গৌরব ঝরিয়া পড়ে খুলে!

(কোথা)

মরকত মণিগুচ্ছ বিস্তারি' সুচারু পুচ্ছ
নেচে ফিরে ঈষৎ কম্পিত !
নীল গ্রীবা, শিখা শিরে, যন কা'রে চেয়ে ফিরে,
নিজ রূপে নিজেই মোহিত !

(কোথা)

জলভরা মেঘদ্যুতি খণ্ড জলদাকৃতি
সুমধুর বৃংহিত গম্ভীর !
(যেন) শিকল পরিয়া সাধে খেলা করে শিশু-সাথে
নির্ব্বিবাদে বৃকোদর বীর।

(কোথা)

শাণিত খড়্গ-ধর, দৃঢ় বর্ম্ম বপু'পর,
অরাতি-মথন সে মূরতি !

(কোথা)

আকাশ-বিহারী পিয়া যুগ্ম পক্ষ প্রসারিয়া
উড্ডীন প্রডীন ডীন গাত !

(কোথা)

কুণ্ডল-আকৃতিখানি যেন সুকেশিনী বেণী
পাকাইয়া রয়েছে কবরী !
কি জানি কি ভাবি দুঃখী, কখনো বিবরে লুকি,
(কভু) শির তুলি' দুলিয়া গরজে।

(কোথা)

চারু দুটী ক্ষুদ্র পাখা কুসুম-পরাগ-মাখা
উড়ে উড়ে ভ্রমে মন-সুখে !
সুকোমল নিরমাণ !— পুষ্প যেন ধরে প্রাণ,
ইতি-উতি বিচরে সম্মুখে।
কোথা সে বিহঙ্গবর, সুচারু বরণধর,
নীলালোক জ্বলে কণ্ঠতলে!
কখনো লুকায় শিখা, যেন বিজলীর রেখা
মাঝে মাঝে মেঘ-মাঝে ঝলে !

কিবা বর্ণসমাবেশ, সুকোমল পক্ষকেশ,
মনোহর সঙ্গীতকাকলী !
কত সুরে, কত ভাবে ডাকে সে মধুর রবে,
পিয়া মোর আকুলি ব্যাকুলি !

(কোথা)
শোভিত শৈবালজাল ক্ষুদ্র সফরী লাল !
ভ্রমে ফিরে সলিল-মুকুরে !
যেন আপনা ধরিতে হায় আপনারি পিছে ধায়,
মোহ-ধন্ধে বঁধুয়া বিচরে !
কোথা—দীর্ঘচঞ্চু বক্ শ্বেতবর্ণ ধব্ ধব্
ধীরে ধীরে উত্তোলি' চরণ
গুরুচিন্তা সুগম্ভীর ধ্যানমগ্ন স্থির-ধীর—
(শেষে) আপনায় আপনি ভক্ষণ।

নূতন বৌ।

[শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল।]

১

সদ্য প্রস্ফুরিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর বালক রমেনের বয়স পূর্ণ দুই বৎসর হইবার পূর্ব্বে যখন তাহার মাতা কোনও অজানা দেশাভিমুখে সহসা প্রস্থান করিল, আর তাহার ঠিক তিন মাস গত হইবার পূর্ব্বেই যখন পুলিনচন্দ্রের মাতা তাহার পুত্রের জন্য বয়স্কা পাত্রীর সন্ধানে ঘটকী নিযুক্ত করিলেন, তখন কেহ কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করে নাই। ষড়বিংশতি-বর্ষীয় যুবক যে শুধু অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া একমাত্র পুত্রের মুখ চাহিয়া নিতান্ত একঘেয়ে রকমে নিজ বিপত্নীক জীবনটা কাটাইতে চাহিবে তাহা প্রতি-বাসিবর্গ তো দূরের কথা, পুলিনের মাতার মনেও ক্ষণেকের জন্য জাগরূক হয় নাই। কিন্তু পুলিন যখন নিজে এক দিন স্পষ্টাক্ষরে জানাইল যে, সে বিবাহ করিতে মোটেই ব্যস্ত বা ইচ্ছুক নহে, তখন তাহার মাতা বড়ই ভাবিতা হইলেন।

নিজের কষ্ট হইবে, সংসার অচল হইবে, ইত্যাদি নানা প্রকার যুক্তিতর্ক ও অশ্রুপাত পর্য্যন্ত যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন তিনি পুত্রের মন বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেন এই অল্পবয়সে সংসারে থাকিয়াও পুত্র সন্ন্যাসী হইতে চাহে, তিনি এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রতিবাসিবর্গ বলিল, যুবতী পত্নীর শোকটা কিছু বেশী লাগিয়াছে। কেহ বলিল, ও আজকালকার একটা ঢং! প্রথমটা সকলেই অমন করে,—দিনকয়েক কাটিলেই আপনি বিবাহ করিতে চাহিবে। এই বলিয়া তিনি নিজ মত সমর্থনার্থ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। পুত্রগতপ্রাণা মাতা কিন্তু ও সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তার পর শীঘ্রই তিনি বুঝিলেন যে, বিবাহ সম্বন্ধে পুত্রের দুর্ব্বলতা কোথায়। এক দিন আহারকালে পুত্রকে তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি নিজের সুখের জন্য বা তোর সুখের জন্য আবার বধূ আনিতে চাহি নাই, ঐ অভাগা রমেনের জন্যই আমার ভয়! আজ আমি চক্ষু মুদিলে উহাকে কে দেখিবে! বাছা আমার ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছে! দাসীতে কি আর ছেলে মানুষ করিতে পারে? তুই কিছু ভাবিস্ না, নূতন বৌ কে আমি ঠিক মানুষ করিতে পারিব। সে কখনও তোর ছেলেকে অনাদর করিবে না।"

পুত্র কোনও উত্তর দিতেছে না দেখিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,— "সেদিন চোরবাগানের নরেশ মিত্তিরদের বাড়ী একটী মেয়ে দেখেছি। মেয়েটি বেশ ডাগর আর লেখাপড়াও জানে। সে অবুঝ হ'বে ব'লে বোধ হয় না। তার স্বভাবটিও বেশ ঠাণ্ডা ব'লে বোধ হ'ল। বলিস্ ত' আমি এই ফাল্গুন মাসে বিয়েটা ঠিক করি।

পুত্র জলের গ্রাস মুখ হইতে নামাইয়া বলিল, তাড়াতাড়ি ক'রো না, আমি ভেবে বলব।"

২

এক মাস পরে শ্রীমতী নির্ম্মলাবালার সহিত পুলিনচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

তার পর পঞ্চদশবর্ষীয়া কিশোরী বধূ প্রথম যৌবনের কামনারাশি লইয়া মানসনেত্রে কত ভবিষ্যৎ সুখের মোহন চিত্র প্রতিফলিত করিতে করিতে স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিল। প্রথমে শাশুড়ীর পদপ্রান্তে অবনত হইবামাত্র সে শুনিল, "মা আমি জিদের বশে শুধু এই রমেনের জন্য তোমাকে আমার সংসারে এনেছি। দেখো, এর যেন কখনও অনাদর না হয়।" সঙ্গে সঙ্গে

তিনি হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যময় শিশু রমেনকে বধূর সম্মুখে ধরিলেন। নির্ম্মলা কিন্তু অত সহজে অকুণ্ঠিতচিত্তে শিশুকে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার সপত্নীপুত্র! তাহাকে সাদরে বক্ষমধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে! কি করিবে স্থির করিতে না পারিলেও সে বালককে ফেলিয়া দিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। তাহাকে বাধ্য হইয়া বালককে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতে হইল! আর রমেন নির্ভীকচিত্তে নির্ম্মলার ক্রোড়ে গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল; নির্ম্মলার দোদুল্যমান কর্ণভূষণটী ধরিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টার পর পিতামহীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কে?"

পৌত্র গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া তাহার সস্মিত মুখের পানে চাহিয়া তিনি উত্তর দিলেন, 'নতুন-মা'। রমেন তখন নির্ম্মলার নাসার বেশরটী দুলাইতে দুলাইতে প্রতিধ্বনি করিল, 'নতুন-মা'। রাত্রে স্পন্দিত-হৃদয়ে-ধীরে ধীরে গিয়া নির্ম্মলা তাহার স্বামীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিবার মুহূর্ত্তেক পরে বুঝিল, তাহার যৌবনরাগরঞ্জিত কল্পনাপ্রসূত দাম্পত্য-জীবনের চিত্রপট এই সংসারের বাস্তব ঘটনারাজির নিকট হইতে কত দূরে অবস্থিত! প্রথমেই পুলিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেন ভাল ক'রে খেয়েছে ত'? ওর মাথাটা বালিসের উপর দিয়া দাও!"

নির্ম্মলার হৃদয়ে কে যেন সবলে ধাক্কা দিয়া তাহার সুখ-প্রাসাদ ধূলিসাৎ করিয়া দিল! এই কি তাহার স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ? রমেনই কি স্বামীর সর্ব্বস্ব! রমেনের মাতা সংসারত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কি তাহার সমস্ত অধিকার এই ক্ষুদ্র বালকের উপর কেন্দ্রীভূত ক'রিয়া গিয়াছে? এখানে নির্ম্মলার কি কিছু দাবী নাই? তা' যদি না থাকে, তবে তাহাকে কেন বলপূর্ব্বক অন্যের অধিকৃত স্থানে বসান হইয়াছে? ইহা কাহার উপহাস—বিধাতার না মানুষের?

ক্রমে যুবতী বুঝিল যে, সপত্নী-কণ্টক রমেনকে আদর না করিলে এ সংসারে সেও আদৃতা হইবে না। শ্বাশুড়ীর নিকট পুত্রবধূরূপে কোনও দাবী নাই। স্বামীর নিকট অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে কোনও অধিকার নাই। কারণ সে যে রমেনের ধাত্রীমাত্র! রমেনের সেবার জন্যই তাহাকে যে আনা হইয়াছে! অবোধ শিশু ধূলা মাখিয়াছে, পরিষ্কৃত করিয়া দাও; খাইতেছে না, খাওয়াইয়া দাও; দুষ্টামী করিতেছে, ঘুম পাড়াও ইত্যাদি আদেশ পালন করিতে করিতে আর সঙ্গে সঙ্গে রমেনের মত অনুযায়ী চলিতে চলিতে সে ক্রমাগত নিজ

অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষে অভিমানের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু রুদ্ধমুখ বর্ষার নির্ঝরিণীর ন্যায় তাহার অভিমানরাশি নির্গমনের কোনও পন্থা না পাইয়া তাহার হৃদয়কে ক্রমাগত উদ্বেলিত করিতে লাগিল।

সে এত পরিশ্রম, এত অনাদর সমস্ত মাথায় বহিতে প্রস্তুত ছিল,—যদি স্বামী সোহাগভরে তাহার সহিত আলাপ করিত। কিন্তু কৈ? বিবাহের দিন হইতে সে তো কখনও স্বামীর প্রেম লাভ করে নাই; কখনও ত' স্বামী প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত আলাপে অগ্রসর হয় নাই! তাহার সুখ-দুঃখের, তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস কখনও শুনিতে চাহে নাই! অবশ্য স্বামী তাহাকে কখনও ঘৃণা করে নাই, অযত্ন করে নাই। কিন্তু অযত্ন না করা আর যত্ন করা কি একই কথা? তাহার অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয় এ কথা জানিতে চাহিত না। আর এ প্রাণহীন মিলনে তাহার বুভুক্ষিত হৃদয় তো তৃপ্তি লাভ করে না!

৩

প্রথম প্রথম নির্ম্মলা তাহার বিদ্রোহোন্মুখ হৃদয়কে পূর্ণবলে দমিত করিয়া প্রাণপণে মাতৃহীন পুত্রের যত্ন করিত। কিন্তু বৎসরেক কাল পরেও এই ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াও সে যখন তাহার বাঞ্ছিত স্বামি-সোহাগ লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তখন সে ইচ্ছা করিয়াই বিদ্রোহের বাঁধ অপসৃত করিয়া দিল। সে তখনও মুখে অসন্তোষের চিহ্ন না দেখাইয়া, অন্তরে গুমরিয়া বালকের প্রতি অবহেলার ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিনা দোষে, অল্প দোষে সে রমেনকে তিরস্কার করিতে লাগিল, সকলের অসাক্ষাতে দুই এক ঘা চড়-চাপড়ও দিতে ছাড়িল না। কিন্তু তখন তাহার বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক দিক হইতে তাহার শ্বাশুড়ী বধূর এবম্বিধ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে তিরস্কার গঞ্জনা ইত্যাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। আর ওদিকে বালক রমেন তাহার নূতন মার অনাদরগুলা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতি গাঢ় আসক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহাকে ছাড়িয়া রমেন একদণ্ড থাকিতে চাহিত না। এমন কি নূতন মার গলদেশ বেষ্টন করিয়া না শয়ন করিলে তাহার নিদ্রা পর্য্যন্ত হইত না।

এক দিন আদরের রমেন অতি মাত্র দুষ্টামি করাতে নির্ম্মলা তাহাকে

ক্রোড়ে লইয়া শান্ত করিতে করিতে বলিতেছিল, "কি আপদই আমার ঘরাতে জুটেছে! আমার হাড়মাস কালি করে দিলে! এ পাপের হাত থেকে কি মুক্তি পাব না?" শাশুড়ী সে সময় নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সুতরাং তিনি সমস্ত শুনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিন নির্ম্মলার নির্য্যাতনের সীমা ছিল না। সে রাত্রে পুলিনচন্দ্র পর্য্যন্ত তাহার সহিত বাক্যালাপ করে নাই।

আর এক দিন নির্ম্মলা রমেনকে খাওয়াইয়া দিবার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাহার আহারকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল। দুষ্ট বালক কিন্তু তখন জিদ ধরিয়াছে নূতন মার হাতে খাইবে—ঠাকুরমা খাওয়াইয়া দিলে চলিবে না। অগত্যা শাশুড়ীর তিরস্কারের ভয়ে নির্ম্মলা রমেনকে খাওয়াইতে বসিল। খাইতে খাইতে সে সহসা "কাঁটা" বলিয়া চীৎকার করিয়া মুখ হইতে ভাত ফেলিয়া দিল ও কাসিতে লাগিল। নির্ম্মলা বিপদ গণিল। বুঝিল, তাহার অসাবধানতায় 'কৈ' মাছের কাঁটা কোনও প্রকারে ভাতের সহিত গিয়া বালকের গলায় বিঁধিয়াছে। পৌত্রের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া পুলিনের মাতা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিলেন ও পুত্রবধূকে গাল দিতে দিতে পৌত্রের মস্তকে তিনি চাপড় মারিয়া ফুঁ দিলেন। কিন্তু কাঁটা কিছুতেই সরিল না। তখন বালকের ক্রমাগত চীৎকারে ভীত হইয়া পুলিনচন্দ্র অফিস কামাই করিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া সাঁড়াশী দিয়া কাঁটা বাহির করিয়া দিলেন।

সেই রাত্রে পুলিন তীব্র ভাষায় নির্ম্মলাকে তিরস্কার করিয়া শেষে স্পষ্টভাবে বলিল, "আমার পুত্রের যত্ন হইবে এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, নিজের সুখের জন্য নহে।"

৪

বর্ষাকাল। সমস্ত দিন ধরিয়া আকাশে মেঘরাশি ক্রমশঃ স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া ঘনতমসায় ধরিত্রীকে আবৃত করিয়াছে। সহসা সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সেই দুর্য্যোগে রমেন সহসা বায়না ধরিল, বাহিরে যাইবে। রুদ্ধকক্ষে সে আর বদ্ধ থাকিতে চাহিল না। সুতরাং পুলিনের মাতা বাধ্য হইয়া বধূকে আদেশ করিলেন, "বৌমা! তুমি রমেনকে নিয়ে ঘরে বস; বাকী

কাজ আমি একেলা শেষ করিতেছি। দেখো যেন ছেলেটা জামা খুলে ফেলে না; নইলে ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে।”

এই কথায় নির্ম্মলা অন্তরে মোটে খুসী না হইলেও বাহ্যিক সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক রমেনকে লইয়া নিজ কক্ষে আসিল ও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজ বসনাঞ্চল বিস্তারিত করিয়া তদুপরি শয়ন করিল।

বোধ হয় তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা রমেনের কাতর আর্ত্তনাদে সে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে নিজ নিদ্রালস চক্ষুকে মোটে বিশ্বাস করিতে পারিল না। চক্ষু অঞ্চলাগ্রে মুছিয়া সে স্থিরনেত্রে দেখিল, তাহার স্বামীর সর্ব্বস্ব, তাহার শাশুড়ীর নয়নের নিধি, প্রাণপ্রিয় বালকের পরিহিত জামায় সহসা অগ্নি-সংযুক্ত হইয়াছে। বালকের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে আর সে যন্ত্রণায় উন্মাদের ন্যায় উদ্দাম নৃত্য করিয়া চীৎকার করিতেছে। উপস্থিত বুদ্ধি হারাইয়া নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত বস্ত্রসহ রমেনকে নিজবক্ষে টানিয়া লইল। এদিকে বালকের কাতর চীৎকারে কক্ষান্তর হইতে পুলিনের মাতা দৌড়াইয়া আসিলেন। তিনি এই মারাত্মক দৃশ্য দর্শনমাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওরে পুলিন দেখে যা’রে! রাক্ষসী আমার দুধের বাছাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মার্‌লে!”

তখন নির্ম্মলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে; কিন্তু সে বালককে ছাড়ে নাই! বহির্বাটী হইতে আসিয়া পুলিন সর্ব্বাগ্রে রমেনকে নির্ম্মলার ক্রোড় হইতে টানিয়া লইল। নির্ম্মলা তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছে। যন্ত্রণায় সে ধরিত্রীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন সকলে বালককে লইয়া ব্যস্ত! শাশুড়ী চীৎকার করিতেছিলেন, “এমন নিষ্ঠুরের ঘরের মেয়ে এনেছি যে নিজে সাম্‌নে থেকে ছেলেটাকে পুড়িয়ে মার্‌লে। হলেই বা সতীন পো! তাকেও কি কেহ এমন করে দগ্ধে মার্‌তে পারে?”

নির্ম্মলা ক্রমে জ্ঞান হারাইতেছিল। সহসা বিষাক্ত তীরের মত কয়েকটা কথা তাহার মর্ম্মে বিদ্ধ হইল। পুলিন বলিতেছে, “যার নিজের ছেলে নাই সে কি প্রকারে বুঝিবে যে সন্তান কি জিনিস!”

দুই দণ্ড পরে নির্ম্মলার জ্ঞান হইতেই সে শুনিল, পার্শ্বের কক্ষ হইতে বেদনাতুর স্বরে রমেন চীৎকার করিতেছে, “আমি নূতন মায়ের কাছে যাব! মা আমার গায়ে হাত বুলা’লে আমি ভাল হ’য়ে যাব! ওঃ মাকে ডেকে দাও!”

এই কথাগুলি নির্ম্মলার হৃদয়ে এক বিষম বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। নিজ শারীরদাহ নিজ বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া সে ভাবিল, ওই কি তাহার সপত্নী-পুত্র। যাহাকে শুধু অগ্রাহ্য করিয়া সে জীবন্তে দগ্ধ করিয়াছে, সে কি না আজ মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াও এই পিশাচীর বক্ষে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল! এত প্রাণঢালা ভালবাসা, হৃদয়-সাগর মন্থন করিয়া অমৃতোপম এ স্বর্গীয় আনুরক্তি,—ঐ ক্ষুদ্র বালক কোথা হইতে সংগ্রহ করিল? কে তাহাকে ইহা শিখাইল? আর এই ভালবাসার কণামাত্র প্রতিদান না পাইয়াও অবোধ শিশু জীবনমরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া তাহাকে মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চাহে কেন? এ সমস্ত কথা বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় তাহার হৃদয়াকাশে ভাসিয়া গেল। তাহার চক্ষু অশ্রুরুদ্ধ হইল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ব হইতে পুলিন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "উঠো না—শুয়ে থাক।"

এদিকে স্বীয় অঙ্গে দাহজনিত অসহ্য জ্বালা আর ওদিকে রমেনের কাতর আর্ত্তনাদে তাহার হৃদয়ে অনুতাপ-বৃশ্চিকের তীব্র দংশন! অসহ্য যন্ত্রণায় সে স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই তোমার! রমেনকে আমায় একবার দেখ্‌তে দাও!"

তাহার মুখপানে চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে পুলিন উত্তর দিল, "জীবিত নহে, তাহার মৃতদেহ তোমায় দেখাইব।"

পরমুহূর্ত্তে পতনোন্মুখ এক বিন্দু অশ্রু পুলিন ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিল।

ব্যথিত-কণ্ঠে নির্ম্মলা বলিল, "ভগবান জানেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বাছার এ দশা করি নাই!" ঠিক সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে রমেন চীৎকার করিয়া উঠিল "ওঃ মাগো! জ্বলে গেল! মরে গেলুম!"

নির্ম্মলা আর কোনও বাধা মানিল না। নিজের শেষ শক্তিটুকু সংগ্রহ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় রমেনের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোর মা কে ফেলে,—তাকে চির-কলঙ্কের ভাগিনী করে তুই কোথা যাবি!—আমি যেতে দিব না!"

পুলিন কম্পিতহস্তে নির্ম্মলাকে ধরিয়া তাহাকে রমেনের শয্যা-পার্শ্বে শয়ন করাইতে উদ্যত হইল। তখন নির্ম্মলা তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "একবার বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ, নইলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না।"

নিজ পদদ্বয় মুক্ত করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে ধীরে ধীরে পুলিন বলিল, না, নির্ম্মলা। দোষ আমারই। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার বুঝা উচিত ছিল যে, আমার মত তুমিও সংসারে শোক সহ্য কর নাই। আমার আমার উচিত ছিল, তোমাকে তোমার সমস্ত অধিকার অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করা। কঠোর শাসন দ্বারা তোমায় রমেনকে ভালবাসিতে শিখাইতে গিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে, শাস্তি ভয় আনিতে পারে, ভালবাসা আনিতে পারে না। মাতৃস্নেহ মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে না—উহা ঈশ্বরের দান!"

তার পর মূর্চ্ছিতাপ্রায়—পত্নীকে রমেনের শয্যাপার্শ্বেই শয়ন করাইয়া বালকের ক্ষুদ্র হস্ত পত্নীর হস্তের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "ঈশ্বর সাক্ষী! আমি কর্ত্তব্য করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু নারী-হৃদয় বুঝি নাই; শোন নির্ম্মলা! আজ থেকে তুমিই রমেনের মা!"

নির্ম্মলা কি স্বপ্ন দেখিতেছে! বিস্ময়ে পুলকে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল! শুধু কপোলবাহী দুই বিন্দু অশ্রু জানাইয়া দিল যে, তাহার এত দিনের সঞ্চিত অন্তরের বেদনারাশি, বিরাট অভিমান সমস্তই ঐ দুই বিন্দু অশ্রুপ্রবাহে ধৌত হইয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয় এখন ভাগীরথীর মৃত্তিকার ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ! এমন কি স্বামীর বাক্যে আজ তাহার অঙ্গের সমস্ত জ্বালা কে যেন অমিয়ধারা-সিঞ্চনে দূর করিয়া দিল। আবেশ-কম্পিত করে সে স্বামীর পদরেণু মস্তকে ধরিয়া একান্তমনে সন্তানের সেবায় বসিল। রমেন আর ত' তাহার সপত্নীপুত্র নহে! স্বামী যে তাহাকে তাহার সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন! সে যে এখন রমেনের মা!

পর দিন ডাক্তার আসিয়া নির্ম্মলাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য!"

পুলিন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি আশ্চর্য্য মশাই?'

নির্ম্মলাকে দেখাইয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন, "এত শীঘ্র ইনি উঠিয়া বসিবেন তাহা আমি ধারণা করিতে পারি নাই।" তার পর রমেনকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "রোগী নিরাপদ; তবে কিছুদিন শয্যাগত থাকিতে পারে।"

ভব-ঘুরের চিঠি।

—•:•—

সম্পাদক ভায়া!

মার্কিণ মুলুকের কোনও কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয় শুর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য পাগল হইয়াছিল, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে সারি গানের 'পুরাতত্ত্ব' অন্বেষণ করিবার সময়ে এই খবরটা আমি পাইয়াছিলাম। ইহাতে আমার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, আমি সাহারার তপ্ত বালিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলাম। গড়াগড়ি না দিয়া পারি কি?—গড়াগড়ি দেওয়াটাই যে ভারতের চিরন্তন সত্য! এই সেদিন চৈতন্যদেবও তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন।

ভায়া হে! তোমরা জান না—তোমাদের রবীন্দ্রনাথের দূর-দৃষ্টি কেমন? অদূর ভবিষ্যতের কুয়াসা ভেদ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতের রাজ্যে প্রসারিত হইয়া থাকে। প্রমাণ,—

"আমি চিনেছি, চিনেছি তোমারে
ওগো বিদেশিনী—
তুমি থাক সিন্ধু-পারে।"

এই গানটীর অর্থ। তোমরা এই গানটীর অর্থ লইয়া নানা জনে নান কথা বলিতে; কিন্তু আমি বরাবরই বলিয়া আসিয়াছি, এ গানটীর অতি গভীর অর্থ আছে; এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই অর্থ অস্পষ্টতার কুহেলিকা ভেদ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। এখন আমার কথাই সত্য হইল!

দেখিলে ত—সে 'সিন্ধু পারে'র 'বিদেশিনী' কবির 'মানসী' নহেন; কবির প্রণয়িনী নহেন; কবির 'কাঞ্চন-মালা।' দূর ছাই! কাঞ্চন-মালাও বুঝিলে না,—নিমন্ত্রণকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত নোটের তাড়া!

সুদূর প্রতীচ্য এই কাঞ্চন-মালার দেশ। সিন্ধু-পারে ইঁহার নিবাস। ইনি বিদেশিনী। সেই জন্যই কবি বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

চিনেছি—চিনেছি তোমারে
ওগো বিদেশিনী।

সুতরাং নোবেল প্রাইজ প্রভৃতি যে কবি পাইবেন, তাহা অনেক দিন হইতেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এই গানের নিগূঢ় তত্ত্বটুকু যাহারা

বুঝেন, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি', 'মন্ত্রদ্রষ্টা' প্রভৃতি বলিয়া থাকেন; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

ভায়া! তোমাদের রবীন্দ্রনাথ মার্কিণ যাইবার পথে জাপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার খুব অভ্যর্থনা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যর্থনার উত্তরে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 'সঞ্জীবনী'তে সেই বক্তৃতা ছাপা হইয়াছিল; এখনও উহা আমার নিকট আছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিরন্তন সত্য,' 'ভূমা' 'বিশ্ববাণী' প্রভৃতির অর্থ যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এই সংখ্যার 'সঞ্জীবনী' এক এক খণ্ড কাছে রাখিয়া দিবেন।

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় জাপানকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—

"বাল্যে যখন কল্পনার বলে আমি জাপানের কথা চিন্তা করিতাম, তখন আমার মনে পড়িত, আমাদের দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, উচ্চ অধিত্যকা এবং চীন দেশের বিস্তৃত নদীসমূহ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরে উপনীত হইতেন। ঐ সকল ভিক্ষু নৈসর্গিক বাধা, ভাষার ও আচারের বৈষম্য গ্রাহ্য করেন নাই। মানবের ভ্রাতৃত্বে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহাদের সেই জীবন্ত বিশ্বাস কার্য্যে অভিব্যক্ত হইত। তাঁহারা যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকলের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস এমন অটল ছিল যে, সেই বিশ্বাসবলেই বাহিরের সকল বিপত্তি উড়িয়া যাইত। এই সকল বিশ্বাসী ভিক্ষুদের মুখে যাঁহারা নবধর্ম্মের বাণী শুনিতেন, তাঁহারাই জাপানে আগমন করিয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেন।"

ভায়া হে! তোমরা বলিবে, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাঁহারা তাহারই প্রচার করিতেন। এ কথা আমি খুব মানি। কিন্তু ইহার উপর আরও একটী কথা আছে; ইঁহারা কেবল যাহা সত্য বলিয়া মানিতেন, বাহিরে তাহাই প্রচার করিতে যাইতেন না। প্রচারের আরও উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের বাহিরে একটী বৃহত্তর ভারত গড়িবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আচার-পদ্ধতি, ভারতের শিল্প, ভারতের সংস্কার যাহাতে ভারতের বহির্দ্দেশেও ব্যাপ্ত হয়, সে চেষ্টা তাঁহারা করিতেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহাদের অনন্তমমতা ছিল বলিয়াই তাঁহারা বিনা আহ্বানে, বিনা 'কাকনে' আপনাদের ধর্ম্ম বিদেশে প্রচার করিবার জন্ম ছুটিতেন।— ছুটিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহারা দূর-দূরান্তরে ছুটিতেন। তাঁহারা যখন

প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয় নাই, স্বাধীনতার পূর্ণ গৌরব তখন সে উপভোগ করিতেছিল। কাজেই তাঁহাদের কথা—স্বাধীন দেশের লোকের কথা বলিয়া পৃথিবীর লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিত। তাঁহাদের কণ্ঠে বজ্র ছিল, বাহুতে শক্তি ছিল, মস্তিষ্কে সে যুগের স্বাধীন-ভারতের মহতী চিন্তা ছিল। "মানবের ভ্রাতৃত্বে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল" কি না বলিতে পারি না; তবে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর উপর তাঁহাদের দৃঢ়তম আস্থা ছিল এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তা করিতেন।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বোধ হয় এমন অল্পবুদ্ধি আছেন, যাঁহারা হয় ত বলিলেন,—রবীন্দ্রনাথ বিদেশে ভারতের 'চিরন্তন সত্য,' ভারতের 'বাণী' প্রচার করিতে গেলেন, অথচ ভারত-সভ্যতার প্রাণস্বরূপ 'ত্যাগে'র দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তোমাদের বিশ্বাস, এখনও ভারতের উপর জগতের লোকের যে একটু শ্রদ্ধাবুদ্ধি আছে, তাহা ভারতের এই ত্যাগধর্ম্মেরই জন্য!

আরে ছি ছি—ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে। ত্যাগ ভারতের বিশেষত্ব বটে; কিন্তু এখন ত আর ত্যাগের যুগ নাই। ত্যাগের যুগ অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে, এখন গ্রহণের যুগ চলিতেছে। এখন ভারতের সত্যই প্রচার করিতে যাও, আর ইউরোপের সত্যই প্রচার করিতে যাও, কাঞ্চন ভিন্ন একপদও অগ্রসর হইবার যো নাই। হইলেই যুগধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইবে; কালের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ কাঞ্চনের বিনিময়ে ভারতের 'চিরন্তন সত্য' নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত করিতে গিয়াছেন। যুগধর্ম্মে এক কপর্দ্দকও না লইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যে কার্য্য করিয়াছিলেন, আজ রবীন্দ্রনাথও কাঞ্চন-খণ্ড লইয়া সেই কার্য্য করিতে গিয়াছেন! তোমাদের কেহ কেহ বলিবে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে! আমি ভবঘুরে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা 'নূতন কিছু' দেখিবার জন্য আমাকে বিচরণ করিতে হয়। পৃথিবীর অপর কোথাও এমন স্পর্দ্ধা দেখি নাই বটে! কিন্তু রবীন্দ্রনাথে স্পর্দ্ধার এই নূতন বিকাশ দেখিয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা! নূতন বটে!

ভায়া হে! রবীন্দ্রনাথ জাপানে বিশ্ব-প্রেমের চাষ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর বলিয়া আসিয়াছেন,—'সর্ব্বম খল্বিদং ব্রহ্মং'—অর্থাৎ সকল পদার্থে, সর্ব্বভূতে ভগবান বিরাজ করিতেছেন। অতএব নিখিল বিশ্বের বিরাট মানব-গোষ্ঠী ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হউক। তিনি জাপানকে যাহা উপদেশ

দিয়াছেন, তাহার মোটামুটী ভাব এই,—জাপানী জাতি তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিশাল জগতের দিকে চাহিয়া দেখুক এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে ভ্রাতৃত্বের প্রীতি-সূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করুক।

কিন্তু জাপান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছে,—আমার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণই থাকুক, ক্ষুদ্রই থাকুক, সীমাবদ্ধই থাকুক। কবির মত আমার দৃষ্টি আপাততঃ বিশাল বিশ্বে যেন ব্যাপ্ত না হয়। আমার ক্ষুদ্র চক্ষুর সীমাবদ্ধ দৃষ্টি যেন সমগ্র জাপানেই নিবদ্ধ হয়। আমার সমগ্র জাতির মমতা ও প্রেম যেন আমার স্বদেশের উপরই থাকে। আগে আমার দেশ, আমার জাতি; তার পর 'নিখিল বিশ্ব'। স্বদেশ ব্যতীত আমার অন্য ধর্ম্ম নাই, স্বদেশ ও স্বজাতিই আমার সর্ব্বস্ব। আমি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-প্রেমের উপদেশ চাই না; তিনি উহা অনুগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিনি আমার অতিথি; শ্রদ্ধার পাত্র, সম্মানের পাত্র। তাঁহার নিকট ইহা ব্যতীত আমাদের অপর কোনও অনুরোধ নাই।

মিঃ ইয়ানো জাপানের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি সেদিন সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন,—ঠাকুর-কবির আদর্শ যেমন, তেমন আদর্শ যদি ভারতের পনের আনা লোকের হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। লোকটা দেখিতেছি, স্বদেশ-প্রেমের কূপমণ্ডূক!

যাহা হউক, কিন্তু এত বড় সার্টিফিকেট ইতিপূর্ব্বে আর কেহ রবীন্দ্রনাথকে দেন নাই। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-যুগের রচনায় ঝাঁজ আছে বলিয়া অভিযোগ করেন, তাঁহাদিগকে এইবার চুপ করিতে হইবে। কারণ, স্বাধীন দেশ হইতে ঠাকুর-কবির রাজভক্তির তকমা আসিয়াছে। আমি ত আনন্দে নৃত্য করিতেছি। ইহার ফল ফলিবে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যখন ছাত্রেরা বাঙ্গালাভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবে, তখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-প্রেম-মূলক কবিতাগুলি তাহাদের অবশ্য-পাঠ্য হইবে!

জাপানের আর এক কথা—আমরা একের মঙ্গল চাই না, জাতির মঙ্গল চাই; ব্যষ্টির স্বার্থের দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই; সমষ্টির স্বার্থেই আমাদের লক্ষ্য। ঠাকুর-কবি ইহার উল্টা গাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কবিতার মূলসূত্র আমাদের ভাল লাগে না; বরং উহা আমাদের জাপানের আধুনিক উন্নতির পরিপন্থী। দেখিতেছি, জাপান বিশ্ব-প্রেমে একেবারে বঞ্চিত। যাঁহারা

জাপানের এই বিশ্ব-প্রেম-বঞ্চিত পাগলদের কথা পড়িতে চান, তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত পাদটীকাটী লক্ষ্য করুন। *

জাপান তোমাদের রবীন্দ্রনাথের কথার সাফ জবাব দিয়াছে। পাগল কি না, তাই সোজাসুজি স্পষ্ট কথাই বলিয়া ফেলিয়াছে! এত স্পষ্ট যাহারা বলে তাহারা কি বিশ্ব-প্রেমের অর্থ বুঝিতে পারে? অতএব রবি-ভক্তের দল কে কোথায় আছ, গালাগালির তারতী ছুটাইয়া দাও এবং নাচুনী ছন্দে নবকুমারী ভাষায় জাপানকে সায়েস্তা করিবার চেষ্টা কর।

---

* (1) In the pages of the *Yomiuri* Mr. Iwano addresses an open letter to the great Indian port Sir Robindra Nath Tagore, recently visiting Japan, in which he undertakes to express some frank opinions respecting the poet's criticism of Japan's worship of materialism. Quoting the old Japanese proverb, that "Good medicine is bitter to the mouth," Mr. Iwano goes on to assure the poet that the Japanese are in no mood to take such advice as the poet has been offering them. The poet reminds him of one who has spent his life among hermits and the struggling portion of humanity. The poet's condemnation of material civilization seems to Mr. Iwano a misunderstanding of things spiritual. To the poet material civilization appears to have complicated life over-much, an idea that possessed the old-fashioned *samurai* of Japan after the Meiji Restoration. The notion that oriental life should cherish pantheism, and believe everything has life, is too antiquated for a modern people like the Japanese. It is no wonder that India is not an independant nation, if most of the people there hold to ideas like Tagore. Japan can never accept a philosophy which lays more stress on the development of individualism than on the evolution of the state. The impossible idealism of the poems of Tagore is an obstacle to modern progress.

(2) In the *Shinjin* the famous congregational pastor, Dr. Danjo's Ebina, also takes Tagore to task for his misunderstand-

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা!

—ঈশ্বর গুপ্ত।

শুনিলাম, শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ একখানি তাম্রলিপি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাহারাই সাহায্যে নাকি তিনি এবার রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' প্রতিপন্ন করিবেন!

---

ing of Japan. To attempt to classify Japan with India, thinks Dr. Ebina, is a mistake, for Japan is to be classed only with such countries as Britain, Germany and France: that is, with modern nations. These nations imported Greek, Roman and Christian civilization which they modified to suit their national purposes, and thus have continued to flourish while the founders of former civilizations have passed away. Japan imported Indian, Chinese and other religions and civilizations, and she is now importing and assimilating western religions and civilizations, while European countries are, in turn, importing something of good from oriental civilizations. There is now a happy tendency among nations to coalesce. The thought that oriental civilization may revive to supplant all others is but the wildest of the daydreams. No national mind can suppose that the west will ever abandon its civilization for that of the orient. The poet evidently does not understand why such civilization as those of Assyria, Babylon, Greece and Rome have gone to ruin, while the nations that have hit upon a happy blending of the material and spiritual in life, have prospered more and more. While Japan admire and reverence the poet for his great ability and noble character, she can never afford to he led by his attitude to modern science and civilization, lest she find herself in the place of India. Japan has secured her position in the modern world by adopting a very opposite policy suggested by the Indian poet.

—The Japan Magazine.
October, 1916.

খবর পাইয়াছি, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নামে একখানি মহাকাব্যের রচনা করিতেছেন। সম্ভবতঃ ভারতীর পৃষ্ঠায় উহা বাহির হইবে!—ভগ্নিরামের দল নাচিতেছে!

—

থু-থু-ওড়ামো বক্তা-সম্রাট, 'সাহিত্য-সংবাদে'র কবিবর রায় সাহেব বিহারিলাল আজকাল নাকি সাপের মন্ত্র শিখিতেছেন! পথে ঘাটে চলিবার সময় বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে!

—

বাঙ্গালার এখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে?—পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কে?—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প লেখক কে?—সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কে?—অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক কে?—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী!—'অমাবস্যা-সঙ্গতে'র বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে!

—

আমরা 'পলিতকেশ' 'গলিতনখদন্ত' এক বুড়ার সন্ধান পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত সত্বর তাঁহার দিকে ধাবমান হউন;—তাঁহাকে আক্রমণ করুন। মানসীর খোরাক জুটিতে পারে।

—

শুনিলাম, 'চল্‌তি ভাষা'র রথীরা দক্ষিণ বঙ্গে এক সাহিত্য-সম্মিলন বসাইবেন। এই সঙ্গে এক প্রদর্শনীও বসিবে। প্রদর্শনীর নাম হইবে—চাঁদের হাট। সেখানে বসিবেন—শ্রীজলধর সেন, শ্রীবিহারিলাল সরকার, শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

—

ব্যারিষ্টারেরা একে একে সাহিত্যের আসরে নামিতেছেন। চিত্তরঞ্জন কালীঘাটে থাকিয়া 'নারায়ণ'কে অর্ঘ্য দিতেছেন; প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্রে' বিচরণ করিতেছেন; জ্ঞানেন্দ্র রায় 'জাহান্নমে'র রাস্তা খুলিয়া দিতেছেন। তিন জনেরই ভক্ত আছে, সুতরাং তিন জনই 'জিনিয়াস্'!

—•—